শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ

চতুর্থ ভাগ

স্বামী ভূতেশানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "মিছরির রুটি সিধে করেই খাও, অথবা আড় করেই খাও মিষ্টি লাগবেই।" পরমপূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বিভিন্ন সময়ে আলোচনাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথামৃত নানাভাবে পরিবেশন করে বিবিধ রুচি-ও ভাব-সম্পন্ন ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেছেন। উক্ত প্রসঙ্গ নিচয় ইতিপূর্বে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রসঙ্গ" গ্রন্থে তিন ভাগে প্রকাশিত হয়েছে। বহু ভক্ত ও পাঠকদের আগ্রহ ক্রমবর্ধমান হওয়ায় "কথাপ্রসঙ্গের" চতুর্থ-ভাগও প্রকাশিত হল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত আস্বাদন-স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেই এই প্রকাশন সার্থক হবে।

প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

এক— ১—১২

ধ্যানের স্থান—সাকার ধ্যান ও নিরাকার ধ্যান—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু—ভগবতী দাসীকে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা—পাপপূণ্য সমর্পন ও আত্মস্বরূপে অবস্থান।

দুই— ১৩—২৮

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মত্ত অবস্থা ও আচার অনুষ্ঠান—ঈশ্বরই কর্তা—দেহধারণের উদ্দেশ্য—ঈশ্বর লাভ—অবতারের প্রয়োজন—সচ্চিদানন্দ সাগরে আত্মা-রূপ মীন—সাধনা ও সিদ্ধি—শ্রদ্ধা ও সিদ্ধিলাভ—অবতারের নিত্য থেকে লীলায় অবতরণ—সেবা ও সিদ্ধি।

তিন— ২৯—৫০

সংসারাশ্রমে বাস করার কৌশল—নির্জনবাসের প্রয়োজনীয়তা—তীব্র বৈরাগ্য—পাপপুণ্যের সমস্যা—ত্যাগই আদর্শ—গুরুবাক্যে বিশ্বাস—জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা—নিস্তরঙ্গ মন ও শুদ্ধ আত্মা।

চার— ৫১—৬৪

সত্যনিষ্ঠা—পণ্ডিত ও সাধু—আদর্শ ধর্ম—বেদান্তবাদ ও ভক্তিমার্গ—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির প্রয়োজনীয়তা—পরমহংসের অবস্থা—প্রত্যক্ষ ও সত্যজ্ঞান—আত্মার আবরণ ও মুক্তি—কেশব ও ঈশান।

বিষয় পৃষ্ঠা

পাঁচ— ৬৫—৭৭

দেহাত্মবোধ ও আত্মবোধ বা পূর্ণজ্ঞান—কার্যের দ্বারা শক্তির প্রকাশ অনুমেয়—সত্ত্বগুণী ভক্তদের মধ্যে ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশ—যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি—জগন্মাতা বাঞ্ছাকল্পতরু—ঈশ্বর ভক্তির বশ—তীব্র বৈরাগ্য—তীব্র ভাবাবেগের ফল—পূর্ণ সমর্পণ ঠাকুরের আশীর্বাদ—দয়ানন্দ সরস্বতী।

ছয়— ৭৮—৮৫

হঠযোগ, রাজযোগ ও ভক্তিযোগ—ঠাকুরের সান্নিধ্যে মাষ্টারমশায়ের ব্যাকুলতা লাভ—ভক্তের জন্য ভগবানের ব্যাকুলতা—ভক্তের বোঝা ভগবান বয়—ঠাকুরের সাধনস্থলের মাহাত্ম্য—ধর্মগ্রন্থের সারগ্রহণ—মাস্টারমশাইকে পথপ্রদর্শন।

সাত— ৮৫—৯১

স্ত্রীজাতি আদ্যাশক্তির অংশ—সাধনার প্রাথমিক স্তর—প্রতিমাপূজা—পরবর্তী স্তর—বিশ্বাস, অনুরাগ ও তীব্র ব্যাকুলতা।

আট— ৯২—১০৮

অবতারের জীবভাব ও দেবভাব—অনাহত ধ্বনি—পরলোক প্রসঙ্গে—জ্ঞানীর লক্ষণ—ব্রহ্মদর্শন ও দিব্যচক্ষু—গৃহীর ত্যাগ ও সন্ন্যাসীর ত্যাগ—মনে ত্যাগ কঠিন—মাস্টারমশাই-র পরিবর্তন—জাগতিক ব্যবহারে নিষ্ঠা—আচার্যের লক্ষণ—ধর্মভাবে ঠাকুরের উদারতা—গুরুকে বিচার—পিতা-মাতাকে

বিষয় পৃষ্ঠা

ভক্তি—সামাজিক কর্তব্য—যার বন্ধন নেই তার কর্তব্যও নেই।

নয়— ১০৯—১১৭

খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে—সর্বভূতে আত্মদর্শন—সিদ্ধাই ঈশ্বরলাভের পথে বিঘ্ন—ঈশ্বরের জন্য উন্মাদনা—বিবিধ প্রসঙ্গ—আগে ঈশ্বরে ভক্তি পরে সংসার ধর্ম।

দশ— ১১৮—১২৫

অবতার ও তাঁব পার্যদ—অবতার ও অভক্ত—সব ধর্মপথের লক্ষ্য—সেই পরমেশ্বর—সংসার ধর্মেরও লক্ষ্য—সেই ভগবানের পাদপদ্ম লাভ।

এগারো— ১২৬—১৩৪

ঠাকুরের সাধ—মহাকারণের ভাবে মাতাল ঠাকুর—ঈশ্বরকোটি, জীবকোটি ও নিত্যসিদ্ধ—ভাবগ্রাহী ঠাকুর—কারণানন্দ ও সহজানন্দ।

বারো— ১৩৫—১৪৬

ঈশ্বর কোটির বিশ্বাস ও জীবকোটির বিশ্বাস—ঈশ্বর-কোটির সহজ সাধন—মাতৃভাব শ্রেষ্ঠভাব—সোহহং—কামনা থাকতে 'তোমাকে চাই' বলা কঠিন—যোগক্ষেমং বহাম্যহম্—কর্তব্য কর্ম ও সাধনা—পরিবেশ বিশুদ্ধীকরণ—নামগুণগান।

তের— ১৪৭—১৫১

জপধ্যান ও কীর্তন—ভক্তের অন্ন শুদ্ধ অন্ন-ভগবানের স্বরূপের বৈচিত্র্য।

বিষয় পৃষ্ঠা

চৌদ্দ— ১৫২—২০৬

সাধনপথে বিঘ্ন—শঠতা—সাধনপথে সাবধানতা—সাধনার ধাপ—সুষুপ্তি ও সমাধি—ধ্যান সম্পর্কে নির্দেশ—জন্মান্তরের সাধনা ও পরিণতি—ভাব অনুসারে ব্যবহার—ভক্তিই সার—ব্রহ্ম ও শক্তি—সংসার ত্যাগ কি সম্ভব? বিচার ও ভক্তি—সংসার ধর্ম ও ঈশ্বরলাভের পথ—কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ও ভক্তিযোগ—সাধনা ও সিদ্ধাই—ষট্‌চক্র—ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি ঈশ্বরলাভের পথ—কর্মফল সমর্পণ—সবই তাঁর খেলা—ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন—ঈশ্বর-বুদ্ধিতে পরোপকার ও কর্তৃত্ববুদ্ধি ত্যাগ—কর্ম ও ভক্তি—নিষ্কাম কর্ম ও কর্মযোগ—যোগ ও ভোগের সমন্বয়।

পনের— ২০৭—২০৮

৺কালীপূজার রাত্রিতে ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ—অবতারের প্রভাব সুদূর প্রসারী।

ষোল— ২০৯—২১৭

ভাব ভক্তি ও প্রেম—অবতার—যোগমায়া সমাবৃত—অবতারের উপদেশের তাৎপর্য।

সতের— ২১৮—২৩৮

দেবী চৌধুরানীর সম্পর্কে ঠাকুরের মতামত—মানুষকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে পূজা কি সম্ভব—ভাব আশ্রয় করে সাধনা করা—সহ্য করা ও স্থিতধী হওয়া এক কথা নয়।

এক

ধ্যানের স্থান

২. ৬. ৪

মণিলালের সঙ্গে ঠাকুরের কথা হচ্ছে। 'আহ্নিক করবার সময় তাঁকে কোনখানে ধ্যান করব', মণিলালের এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'হৃদয় তো বেশ ডঙ্কামারা জায়গা। সেইখানে ধ্যান করবে'।

জপধ্যান আরম্ভ করতে গিয়ে অনেকের মনে প্রায়শঃ এই প্রশ্ন ওঠে। নানান রকমের বিধান আছে—সহস্রারে, ভ্রূ-মধ্যে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, বিভিন্ন চক্রে ধ্যানের কথা বলা হয়েছে। নীচের চক্রগুলি থেকে মনকে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বচক্রে বা ভূমিতে নিয়ে যেতে হয়।

ঠাকুর হৃদয়কে ডঙ্কামারা জায়গা বললেন। ডঙ্কামারা মানে বিখ্যাত জায়গা। এ জায়গাটি ধ্যানের পক্ষে সকলের জন্য প্রশস্ত। হৃদয়ে তিনি অবস্থান করেন, সেখানে তাঁকে ভাবতে হয়! যেমন গানে আছে, 'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।' সাধারণ সাধকের পক্ষে হৃদয়ের সঙ্গে ধ্যানের সম্বন্ধ খুব বেশী। তবে অসাধারণ সাধকের পক্ষে আরও উঁচুতে ভ্রূ-মধ্যে, সহস্রারে ধ্যানের কথা আছে। সাধারণ সাধকের জন্য বলা আছে যে, গুরুকে সহস্রারে এবং ইষ্টকে হৃদয়ে ধ্যান করতে হয়। মনে রাখতে হবে কোনো নিয়মই সকলের পক্ষে অনুকূল হবে এমন কোন কথা নেই। তবে যা বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে উপযোগী, তাই প্রশস্ত বলে ঠাকুর বলছেন, হৃদয় ডঙ্কামারা জায়গা।

ভ্রূ-মধ্যে ধ্যান খুব কঠিন। অনেক সময় ভ্রূ-মধ্যে দৃষ্টি স্থির করতে গিয়ে চোখের অসুখ হয়।

সাকার ধ্যান ও নিরাকার ধ্যান

নিরাকার উপাসকদের পক্ষে ভ্রূ-মধ্যে ধ্যান প্রশস্ত বলা হয়। কিন্তু এখানে ঠাকুর নিরাকার ধ্যানেরও স্থান নির্দেশ করেছেন হৃদয়। মণিলাল নিরাকারবাদী, ঠাকুর তাকে বলছেন হৃদয়ে ধ্যান করবে।

সাকার ধ্যান বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি মূর্তির ধ্যান বা সেই মূর্তির সঙ্গে যে সব গুণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেইসব গুণের ধ্যান। ধ্যান মানে চিন্তা। সে চিন্তা রূপেরও চিন্তা হতে পারে, গুণেরও। যেমন ভগবানের কোন রূপের চিন্তা যখন করি তখনও তিনি পবিত্র, করুণাময়, সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর এগুলি সব সঙ্গে সঙ্গেই আসে। সুতরাং এই গুণগুলিও চিন্তার বিষয়ীভূত হল। কাজেই আমরা বুঝতে পারি মূর্তির চিন্তা হৃদয়ে করব। নিরাকারের চিন্তা কি করে করব? এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেছেন, হৃদয়ের মধ্যে যে আকাশ রয়েছে সেই অন্তরাকাশের চিন্তা করতে হবে। তবে কেবল নিরাকার বস্তুর চিন্তা করা কঠিন বলে বলছেন, তার সঙ্গে আর একটু যোগ কর। কখনও জ্যোতি, কখনও নীহারিকা, কখনও নক্ষত্র পুঞ্জ, কখনও উজ্জ্বল ব্রহ্মজ্যোতি বা ব্রহ্মসত্তা পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে এইরকম চিন্তা করবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই নিরাকার স্বরূপগুলি একেবারে নিরাকার নয়। কারণ বিশিষ্ট একটা আকৃতি না থাকলেও জ্যোতিও একটা আকার, ধোঁয়া বা কুয়াশাও একটা আকার। আকার মানেই যে, হাত পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকতেই হবে তা নয়, আকার মানে যার দ্বারা এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুকে পৃথক করা যায়। একেবারে নিরাকার চিন্তা করা অর্থাৎ গুণশূন্য, বৈশিষ্ট্যশূন্য চিন্তা সাধারণ সাধকের পক্ষে অসম্ভব। তাই তাদেরও কোন প্রতীক অবলম্বন করে চিন্তা করতে হয়। ঐ ধোঁয়া, নীহারিকা, কুয়াশা বা জ্যোতিঃপুঞ্জ—এইগুলি সব প্রতীক। এই প্রতীকের সাহায্যে সেই নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বকে চিন্তা করা যায়। মানুষের

চিন্তাশক্তি এত সীমিত যে, সে নিরাকারের চিন্তা করতে পারে না। অবয়ববিশিষ্ট সাকাররূপেরই চিন্তা করে। কখনও চার হাত, কখনও দু-হাত, কখনও বা দশহাত, বিশহাত ইত্যাদি কল্পনা করে। তারপর যখন আর ওতেও হয় না তখন বলে অনন্ত বাহু, অনন্ত পদ, অনন্ত মস্তক ইত্যাদি। অর্থাৎ ভগবানকে চিন্তা করবার সময় মানুষ যে রূপগুলির সঙ্গে পরিচিত সেইগুলিকে আরও বিশদ করে হয়তো জ্যোতি বা ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে তাকে ভগবানের স্বরূপ বলে ভাবে। যেমন গীতায় বলেছেন, তাঁকে জ্যোতির্ময় ভাবতে হয়। বলছেন যদি সহস্র সূর্য একসঙ্গে আকাশে ওঠে তাহলে তার যে প্রোজ্জ্বল জ্যোতি হয় সেই জ্যোতির সঙ্গে ভগবানের জ্যোতির কতকটা হয়তো তুলনা হতে পারে অথবা তাও হয় না।

ভাব হচ্ছে এই যে, তাঁকে আমরা যখন কল্পনা করি তখন আমাদের অনুভূত বস্তুগুলিকেই আরও বেশী গুণিত করে, আরও বিশাল করে, তার সীমাকে যেন সরিয়ে দিয়ে তাকে ভগবানের প্রতীক বলে ভাবি। কাজেই একেবারে নিরাকার স্বরূপে তাঁর চিন্তা করা বড় কঠিন। পরে ঠাকুর বলেছেন, তাও করা যায়। জ্ঞানীর পক্ষে হয়তো ভ্রূ-মধ্যে এবং সহস্রারে ধ্যান উপযোগী কিন্তু ভক্তের পক্ষে হৃদয়ই সবচেয়ে উপযোগী। ভাব আবেগ emotion-এর ভিতর দিয়ে যখন ভগবানকে আমরা চিন্তা করি তখন হৃদয়ই প্রশস্ত কারণ ভিতরে যখনই একটি ভাবের উচ্ছ্বাস আসে তখন আমরা সেখানেই একটা চাঞ্চল্য অনুভব করি। উপনিষদে বলেছেন—'হৃদয়েন এব বিজানাতি।' হৃদয় দ্বারাই মানুষ জানে। হৃদয় কোন জানবার যন্ত্র নয়। উপনিষদেই আছে, 'হৃদি অয়ম্ ইতি হৃদয়ম্' —হৃদয়কে বলা হচ্ছে তিনি এইখানে আছেন এইজন্য এর নাম হৃদয়। এটি ব্যাকরণ নির্দ্দিষ্ট অর্থ নয়, রূঢ় অর্থ। এইজন্য হৃদয়ে তাঁকে ধ্যান করার কথা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। তাই ঠাকুর বললেন, হৃদয় তো ডঙ্কা মারা জায়গা।

মণিলাল ব্রহ্মজ্ঞানী নিরাকারবাদী। ঠাকুর তাকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'কবীর বলত সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ, কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।' সাকার আমার মা, নিরাকার বাবা, দুই-ই আপন, দুজনকেই আমরা গ্রহণ করতে পারি। কার নিন্দা করব কারই বা বন্দনা করব, দুই-ই সমভাবে পূজ্য, সমান আকর্ষণীয়. কোন একটা ভাব আশ্রয় করলেই হয়। হলধারী দিনে সাকারে থাকত রাতে নিরাকারে থাকত'। এটা বলার তাৎপর্য এই যে, দুই-এর ভিতরে কোন বিরোধ নেই। সাকার ভাবে যে ভাবে, সে যে নিরাকার ভাবে ভাববে না বা তার সে রূপে ভাবতে বাধা আছে তা নয়। আবার নিরাকারবাদী যদি সাকার ভাবে ভগবানকে ভাবে তাতেও কোন দোষ হয় না। আমাদের মনের স্বভাবই এই যে যখন আমরা মনে করছি নিরাকারভাবে চিন্তা করি তখনও কিন্তু সাক্ষাৎভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আমরা তাঁকে সাকারই করে নিচ্ছি। কোন না কোন আকার তাঁকে দিই তার হাত-পা থাক আর নাই থাক। যেমন খ্রীষ্টানদের ক্রুশ, মুসলিমদের কাবা।

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু

তারপরে বললেন যে, সাকারেই বিশ্বাস কর আর নিরাকারেই বিশ্বাস কর, ঠিক ঠিক কিন্তু হওয়া চাই' অর্থাৎ বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া চাই। বিশ্বাসের ফলে মানুষ বস্তুলাভ করে। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। শম্ভু মল্লিকের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এই সম্বন্ধে। শম্ভু মল্লিক বলতো ভগবানের নাম করে বেরিয়েছি আমার আবার বিপদ কি? ভগবানের নাম করে বেরোলে যেন কোন বিপদ হতেই পারে না। বিশ্বাসেই সব হয়। ঠাকুর অন্যত্রও এই বিশ্বাসের মাহাত্ম্য বলেছেন। একজন সমুদ্রপারে যাবে, বিভীষণ তার কোঁচার খুঁটে কি একটা বেঁধে দিয়ে বললেন, তুমি হেঁটে

সমুদ্র পার হয়ে যেতে পারবে। সে বিশ্বাস করে পার হচ্ছে তারপর মনে হল, কি এমন জিনিস বেঁধে দিলে কাপড়ে যে আমি সমুদ্র পার হয়ে যেতে পারছি! খুলে দেখে রাম নাম লেখা। বলে 'এই'! যেই বলা 'এই' তখনই ডুবে গেল অর্থাৎ বিশ্বাস সেখানে শিথিল হয়ে গেল। সুতরাং সে ডুবে গেল। এই রকম যীশুখ্রীষ্টের জীবনীতে আছে যে তিনি এবং তাঁর শিষ্যেরা একদিন রাত্রে নৌকা করে সমুদ্রে রয়েছেন। তাঁর প্রধান শিষ্য পিটার ঘুম ভেঙে দেখেন যীশু নৌকায় নেই। তারপর দেখেন যে দূরে সমুদ্রের উপর দিয়ে যীশু হেঁটে আসছেন। অবাক হয়ে পিটার বললেন, প্রভু, আপনি কি করে এ সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে আসছেন? যীশু বললেন, তুমিও পার। বিশ্বাসের জোরে হয়। 'আমিও পারি'? 'হাঁ'। পিটার নামলেন। নেমে দেখলেন সত্যিই তো হাঁটা যাচ্ছে। কিন্তু এক সময়ে মনে যেই সন্দেহ এল অমনি ডুবে যাচ্ছেন। তখন বলছেন, প্রভু বাঁচান। যীশু পিটারের হাত ধরে নৌকায় টেনে তুলে বললেন, Ye of little faith। তোমরা অল্প বিশ্বাসী তাই ডুবে যাচ্ছ। ঠাকুরও এখানে বলছেন যে বিশ্বাসের জোর অনেক। তারপর বলছেন, কি জান, সরল উদার না হলে এ বিশ্বাস হয় না। সাধারণ লোকের মনে কখনও বিশ্বাস হয় আবার পরক্ষণেই সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ভগবতী দাসীকে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা

এরপর ভগবতী দাসী এল। ঠাকুর করুণাময়, সকলের কল্যাণের জন্যই দেহধারণ করে এসেছেন। কাজেই পাপী তাপী যাই হোক তাঁর কাছে সকলের অবারিত দ্বার। ভগবতী দাসীর জীবনের প্রথম দিকে চরিত্র-দোষ ছিল। তথাপি ঠাকুর তার সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলছেন। এরকম সহানুভূতি পেয়ে দাসী সাহস করে তাঁর পায়ে হাত

দিয়ে প্রণাম করেছে। বিছে কামড়ালে যেরকম হয় সেইভাবে ঠাকুর হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন। গঙ্গাজল দিয়ে পা ধুলেন। সকলেই দেখে স্তম্ভিত। ভগবতীও মর্মাহত। তারপর ঠাকুর বলছেন, 'দ্যাখ্ তোরা এমনিই প্রণাম করবি। পায়ে হাত দেবার দরকার নেই।' 'ভাব হচ্ছে এই, তিনি সকলের পাপতাপ নেবেন বলে এসেছেন বটে তব দেহ এত পবিত্র যে কোনরকম অপবিত্রতার লেশমাত্রেরও স্পর্শ তিনি সহ্য করতে পারেন না। অবতার পুরুষদের দেহ শুদ্ধ সত্ত্বময় এরকম বলা হয়। সেই দেহে সামান্যমাত্র অশুদ্ধির আঁচ লাগলেও তাদের অসহ্য কষ্ট হয়। এটুকু মনে রাখবার জিনিস। যার জন্য ঠাকুরের ভক্তেরা পর্যন্ত অনেক সময় ঠাকুরকে স্পর্শ করতে সংকোচ বোধ করতেন। এই ভগবতী দাসীর স্পর্শই একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়, এরকম দৃষ্টান্ত সর্বদা তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তারা দেখতেন। কিন্তু এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও ভগবতীর উপরে কোন বিরূপ ভাব নেই। তিনি শুধু বললেন, তোরা এমনিই প্রণাম করবি।

তবে ঠাকুরের জীবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন তখনকার অভিনেত্রীদের স্বভাব ভাল না হলেও তারা ঠাকুরকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত। ঠাকুরও 'মা আনন্দময়ী', 'মা আনন্দময়ী' বলে তাদের প্রণাম গ্রহণ করতেন। তখন তো পায়ে হাত দেবার জন্য যন্ত্রণা বোধ হয়নি! তবে কেন ভগবতীর প্রণাম সহ্য করতে পারছেন না? কেবল ভগবতীর চরিত্র আগে ভাল ছিল না বলেই যে তিনি এইরকম করছেন তা নয়। এর মধ্যে আরও হয়তো কোন ব্যক্তিগত রহস্য আছে যা আমাদের কাছে তিনি প্রকাশ করেন নি।

কাজেই আমরা এইরকম একটা দৃষ্টান্ত দেখেই ঠাকুরের যে করুণাময় রূপ তাকে যেন সংকুচিত করে না ফেলি। তাঁর করুণা সকলের জন্য প্রবাহিত। পতিত, অধম থেকে আরম্ভ করে সাধু সন্ত এমন কি ব্রহ্মজ্ঞ

পর্যন্ত সকলেই তাঁর করুণা লাভ করেছেন। কাজেই ঠাকুরকে এরকম সংকুচিতদৃষ্টি বলে মনে করতে পারি না। কিন্তু তাহলেও তাঁর দেহের যন্ত্রণা হত—এটা স্বাভাবিক।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শেষ অবস্থায় তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা তাঁকে ঘিরে রাখতেন পাছে কেউ অশুদ্ধভাবে তাঁকে স্পর্শ করে কিংবা এমন কোন কথা বলে যাতে তাঁর শুদ্ধভাবের ভিতরে কোন আঘাত লাগে। এই শুদ্ধ দেহ মানে অশেষ যন্ত্রণা, অশুদ্ধির স্পর্শমাত্র সেখানে সহ্য হয় না। এইটি অবতার পুরুষের জীবনে যেরকম পরিস্ফুট হয় এরকম আর অন্যত্র কোথাও নয়। অবশ্য তারও অবস্থাবিশেষ আছে। এমন অবস্থা আছে যখন তিনি শুদ্ধি অশুদ্ধির পারের ভূমিতে অবস্থান করছেন। সেখানে আর কোন স্পর্শদোষ হচ্ছে না। কিন্তু যখন তিনি জীবের প্রতি করুণা করে নীচের স্তরে নেমে আসছেন তখন তাঁর এই দেহে অশুদ্ধির লেশমাত্র ছোঁয়া লাগলেও তিনি অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতেন। ঠাকুরের ক্ষেত্রে আমরা তা এখানে এবং অন্যত্রও পাচ্ছি।

শ্রীশ্রীমার কথায় আছে, কেউ কেউ প্রণাম করলে শরীর জুড়িয়ে যায়। আর কেউ এসে প্রণাম করলে পা জ্বালা করে। সুতরাং যারা করছে তাদের ভাবের উপর সেটা নির্ভর করে। ঠাকুরের জীবনে অন্যত্র আছে, এইরকম কে একজন স্পর্শ করেছিল, তারপরই তাঁর জ্বালাবোধ হয়। তিনি গঙ্গাজল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পা ধুয়ে বলেছিলেন, দেখ, যে যা পাপ তাপ করে আসে, এসে যখন প্রণাম করে, স্পর্শ করে, তখন সেই সমস্ত পাপ তাপ আমাকে নিতে হয়। কি করে নেন তিনি, কিভাবে সম্ভব হয়, সে আমরা বুঝব না। যখন অপরের ভোগটা নিজের উপর তুলে নেন, তখন বলেন, ভোগটা এই দেহের উপর দিয়ে হয়ে গেল। সেই ভোগের তীব্রতা আমরা কল্পনা করতে পারি না। যে পাপ করে এসেছে তার বেদনার লাঘব হবে বলে তিনি সেই তীব্র বেদনা ভোগ করেন।

খ্রীষ্টানদের মতে আছে—Vicarious atonement—যীশু অপরের পাপ নিজের উপর নিয়ে তাব প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য নিজে ক্রুশে বিদ্ধ হলেন। ঠাকুর এসব জানতেন না, পড়েননি, একটু আধটু শুনেছেন। তিনি বলছেন এই কথা যে, যারা আসে তাদের পাপতাপ নিতে হয়। এই শরীরের উপর দিয়ে তার ভোগ হয়ে যায়। একবার বলছেন, আচ্ছা, এই গলার রোগ কেন হল? এই জীবনে এই দেহ তো কোনরকম অন্যায় কিছু করেনি। তাহলে এরকম কেন হল? তারপর বলছেন, যারা আসে তাদের পাপ তাপ নিতে হয়। এই হল Vicarious atonement অর্থাৎ, আর একজনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবতার পুরুষের ভিতর দিয়ে হয়ে যায়, যা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। এই দেখে যেন সকলে না মনে করেন যে, একজনের পাপ অপরে বহন করতে পারে বা প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে। অবতার ছাড়া আর কেউ এভাবে করতে পারেন না। স্বামীজীও বলেছেন, অবতার পুরুষই এটা করতে পারেন, আর কেউ পারেন না।

করুণাময় ঠাকুর ভগবতীর মনের দুঃখ বুঝেছেন। কাজেই ভগবানের নাম শুনিয়ে তার দুঃখ ভোলাবার জন্য বলছেন, একটু গান শোন। পরপর তিনটি গান তাকে শোনালেন।

পাপপুণ্য সমর্পণ ও আত্মস্বরূপে অবস্থান

তাহলে এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখবার জিনিস দুটি। একটি হচ্ছে অবতার পুরুষেরা ইচ্ছা করলে অপরের পাপ তাপ নিজের দেহের ভিতর দিয়ে ভোগ করতে পারেন। আর দ্বিতীয় কথা, তিনি যে পাপভার নিলেন তার ফলে যে কষ্ট তা তাঁকে ভোগ করতে হয়। এইজন্য ভক্তেরা কখনও ঠাকুরকে তাঁদের নিজেদের পাপ তাপ অর্পণ করতেন না। এখন কথা হচ্ছে, ভগবানকে সব পাপ তাপ আমরা

অর্পণ করব কি না? হ্যাঁ করব। এখানে কথা হ'ল যখন ঠাকুর দেহধারণ করে এসেছেন তখন তাঁর দেহের কষ্ট তাঁকে পীড়া দেবে এটা জেনে হয়তো তাঁকে পাপ ভার নাও অর্পণ করতে পারি, কিন্তু যখন তিনি ভগবানরূপে, পরমেশ্বররূপে আছেন, তখন তাঁকে না দিলে আর কাকে দেব? কাজেই সমস্ত পাপপুণ্য সবই তাঁকে অর্পণ করা যায় এবং করা উচিতও। করা উচিত এইজন্য যে, তা ছাড়া মানুষের মুক্তির আর পথ কোথায়? অনন্ত পাপপুণ্যের বোঝা আমাদের জন্ম জন্মান্তর ধরে সঞ্চয় করা রয়েছে, যা ভোগ করে ক্ষয় করা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে পাপের দ্বারা পুণ্য খণ্ডিত হয় এবং পুণ্যের দ্বারা পাপ খণ্ডিত হয় বলে আমাদের যে ধারণা আছে তা সঠিক নয়। এখানে যোগ বিয়োগ হয় না। পুণ্যের ফল ভোগ করতে হবে পাপের ফলও ভোগ করতে হবে। 'অবশ্যমেব ভোক্তব্যম্ কৃতং কর্ম শুভাশুভম্'—শুভ এবং অশুভ দুই কর্মের ফলই ভোগ করতে হয়। এই হল শাস্ত্রের নির্দেশ। ভোগ না করে কারো নিস্তার নেই। তা যদি হয় তাহলে অনন্তকালের এই পাপ এবং পুণ্য যার বোঝা আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে সঞ্চয় করেছি এবং বয়ে বেড়াচ্ছি, এর থেকে মুক্তির পথ কোথায়? মুক্তির একটাই উপায় আছে, তা হ'ল ভগবানকে সমস্ত কিছু সমর্পণ করা। তাঁর চরণে সব সমর্পণ করে দিলে মানুষ এই পাপ এবং পুণ্য উভয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু সব সমর্পণ সত্যি সত্যিই করা দরকার, মুখে করলে হবে না। যখন কেউ সব তাঁর চরণে সমর্পণ করে দেয় তখন সে পাপ পুণ্য উভয়ের হাত থেকেই নিষ্কৃতি পায়। দুই-ই-বোঝা, একটি নিলেই আর একটিকে অবশ্যই নিতে হবে। কারণ প্রত্যেক কর্মের ভিতরেই ভালমন্দ মিশ্রিত রয়েছে। আমরা যাই করি না কেন তার প্রত্যেকটির ভিতরে কিছু ভাল থাকে, কিছু-মন্দ থাকে। এখন এই ভালমন্দের মিশ্রিত কর্মফলগুলিকে যুগ যুগ ধরে সংগ্রহ করে চলেছি এবং আবার কর্ম করার

সঙ্গে সঙ্গে তা আরও বেড়েই চলেছে। সুতরাং এই বোঝার ভার থেকে মুক্তির উপায় কি? এগুলিকে ভোগ করে শেষ করতে হলে অনন্ত জন্মেও সম্ভব হবে না। সুতরাং এর থেকে নিষ্কৃতির উপায় হচ্ছে দুরকম—এক, আমি সমস্ত বোঝা তাঁর চরণে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। নিশ্চিন্ত হওয়া মানে খালি পাপটি দিলাম আর পুণ্যটি রেখে দিলাম এ হবে না। পাপ ও পুণ্য দুই-ই তাঁর চরণে সমর্পণ করে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম—এই এক হতে পারে। আর একটি উপায় হচ্ছে, 'আমি কর্তা নই' এইটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। খুব গভীর বিশ্বাস যদি থাকে তাহলে আর পাপপুণ্য তাকে স্পর্শ করতে পারে না। নিজেকে অকর্তা বলে বোধ করতে হবে। আমি কর্তা নই, ভোক্তা নই, আমি শুদ্ধআত্মা সুতরাং শুদ্ধ আত্মাতে আর কোন কর্মের ফল বর্তায় না। মনে রাখতে হবে মুখে আমি অকর্তা বললেই হবে না। অন্তরের সঙ্গে আমি অকর্তা এই বোধ যদি হয় তাহলে আর ঐ কর্মের ফল তাকে স্পর্শ করে না। যেমন আর একজন যে কর্ম করছে তার ফল আমাতে বর্তায় না, আমাকে সেই কর্মের ফল বইতে হয় না। ঠিক সেইরকম আমি যখন নিজেকে অকর্তা বলে বুঝতে পারি তখন আমার কর্মের ফলও আমাকে বইতে হয় না। 'কুর্বন্নাপি ন লিপ্যতে' গীতায় যেমন বলেছেন কর্ম করেও সে লিপ্ত হয় না কারণ সে জানে আমি কিছু করছি না। 'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যতে তত্ত্ববিৎ' (৫।৮)—তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যখন সব কিছু করছেন তখনও জানবে তিনি কিছু করছেন না কারণ শুদ্ধআত্মা কিছু করে না। এইটি যদি নিশ্চিতভাবে জানা হয়ে যায় তাহলে আর কর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হয় না। এই হল একটি কৌশল।

ভক্তির দ্বারা একটি হল আর একটি জ্ঞানের দ্বারা। সর্বস্ব তাঁকে সমর্পণ হল ভক্তির ভাব থেকে আর দ্বিতীয় হল আত্মজ্ঞান। জ্ঞানের দ্বারা জানা যে, আত্মা অকর্তা, এইভাবে সে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে

যাবে। মীমাংসকদের আর একটি যুক্তি ছিল, সে যুক্তিকে খণ্ডন করা হয়েছে। যুক্তিটি এই যে, আমি অশুভ কর্ম করব না আর শুভ কর্ম করব এবং শুভকর্ম যখন করব তখনও তাতে লিপ্ত হয়ে করব না। কিন্তু তা হল ভবিষ্যতের কথা। বর্তমানের যে বোঝা রয়েছে তার কি গতি হবে? এইজন্য বলা হয় যে, ওভাবে কখনও কর্মক্ষয় হবে না। কর্মের ফলকে কাটাকাটি করেও কখনও ক্ষয় করা যায় না অর্থাৎ একটা ভাল কর্ম করলাম, করে আমাদের মন্দকর্মের ফলটাকে কেটে দিলাম তা হবে না। চুরি করলাম, জাল করলাম, করে কিছু টাকা দান করলাম তাতে কিছু কাজ হবে না। ও দানের ফল যদি কিছু থাকে হয়তো তা হবে, কিন্তু ঐ যে জাল জুয়াচুরি তার ফলও ভোগ করতে হবে। আর এইভাবে যে মতলব করে দান করা সেই দানেরও ফল শুভ হবে না। ঐরকম চিন্তা নিজেকে ফাঁকি দেওয়া মাত্র। এটা বুঝতে হবে যে, কর্মফল ভোগ করতেই হবে। তবে তাঁর শরণাগত হয়ে সবকিছু সমর্পণ করলে অথবা নিজেকে অকর্তা বলে জানলে এই কর্মফলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

'যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।' ৪/৩৭ গীতা।

যেমন যত কাঠই হোক না কেন আগুনে সমস্ত নিঃশেষে ভস্ম হয়ে যায়, তেমনি সমস্ত কর্ম এই জ্ঞানের দ্বারা ভস্ম হয়ে যায়। সুতরাং আত্মাকে কিছু ভোগ করতে হয় না!

'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥' ৪/৩৭ গীতা। জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মফলকে ভস্ম করে দেয়। সুতরাং সে আর বন্ধনের মধ্যে পড়ে না।

কিন্তু জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জলিত করা সহজ নয় এবং তাঁকে সর্বস্ব সমর্পণ করা তাও সহজ নয়। আপাতদৃষ্টিতে যদি আমরা বলি, হে প্রভু, আমি তোমাকে সব দিলাম কিন্তু তখন নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, দিলাম কি?

শুধু মুখে বললে হবে না, নিজেকে ভাবতে হবে। যদি দিই তাহলে মনে আর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া আসবে না। এই কর্মের ফল আমার, এই বুদ্ধি আর আসবে না। সব তাঁকে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হওয়া এটিও যেমন কঠিন আবার নিজেকে অকর্তারূপে জানা সেটিও তেমনি কঠিন।

দুই

২.৭.১—২

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মত্ত অবস্থা ও আচার অনুষ্ঠান

ঠাকুরের প্রথম প্রেমোন্মাদের কথা হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন যে, 'কি অবস্থাই গিয়েছে! এখানে খেতুম না। বরাহনগরে কি দক্ষিণেশ্বরে, কি এঁড়েদয়ে, কোন বামুনের বাড়ী গিয়ে পড়তুম।' ছোট শিশুর যেমন আপন পর ভেদ নেই, প্রেমোন্মাদ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থাও তেমনি। যার লোক বাড়ীতে গিয়ে বলছেন, এখানে খাব। কথাগুলি তাঁর পক্ষে শোভন কারণ তিনি সেইভাব অন্তরে পোষণ করছেন। এগুলি কারো স্বাভাবিক ভাবে হয়, কেউ কেউ আবার বিধি বা প্রথার অনুসরণে করেন, যেমন সন্ন্যাসীর ভিক্ষা করে খেতে হয়। দুটিতে তফাৎ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সন্ন্যাসের অবস্থা হল 'সহজ' —স্বাভাবিক অবস্থা, আনুষ্ঠানিক নয়।

তারপর বলছেন, কোথাও কেউ ভক্ত, কেউ জ্ঞানী, কেউ ঈশ্বর প্রেমিক আছে শুনলে তাঁকে দেখবার জন্য তাঁর ইচ্ছা হোত। ভাবতেন না যার সঙ্গে পরিচয় নেই, তার কাছে গেলে সে কি মনে করবে। মথুরবাবুকে বলতেন নিয়ে যেতে। তিনি মানী ব্যক্তি, অনাহূত হয়ে সর্বত্র যাবেন কেন? কিন্তু ঠাকুর বলছেন বলেই যেতে হত। এইভাবে গিয়ে অপ্রস্তুতও হয়েছেন তাও বললেন। মথুরবাবু তাঁর বড় গাড়ী করে দীনু মুখুজ্জের বাড়ী নিয়ে গিয়েছেন, গরীব দীনু মুখুজ্জে তো অপ্রস্তুত, কোথায় বসাবে ভেবে পাচ্ছে না। ভাব হচ্ছে এই যে, ঠাকুরের মনে যখন যা ইচ্ছা হত তাই করতেন, অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করতেন না।

তারপর আর একটি কথার উল্লেখ করলেন। কুমার সিং সাধুভোজন করাবেন, সাধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন, ঠাকুরকেও করেছেন। খাবার সময় সাধুরা পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। জিজ্ঞাসা করা স্বাভাবিক, কারণ সাধুর পোষাক তো ঠাকুরের ছিল না। সাধারণ মানুষের মতই কাপড় পরতেন, গায়ে জামা, পায়ে চটিজুতা। কাজেই তাঁকে দেখে তাদের মনে হল হয়তো কোনও গৃহস্থ ব্যক্তি তাদের পংক্তিতে বসেছে। তাই জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি কি গিরি না পুরী? ঠাকুর বলছেন, বাবা আমি গিরি পুরী জানি না, আমি আলাদা বসছি। পরিবেশনের পর ঠাকুর খেতে আরম্ভ করে দিলেন। তারা কেউ কেউ বললে, 'আরে এ কেয়া রে!' সাধুরা সাধারণতঃ মন্ত্রপাঠ করেন খাবার আগে। এই শ্লোকটি বলা হয়—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ গীতা ৪।২৪

তারপর 'হরি ওঁ তৎ সৎ' বলে খেতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ঠাকুর ওসব বিধির ধার ধারতেন না, মন্ত্রোচ্চারণ ছাড়াই খেতে আরম্ভ করেছেন। বিধিনিষেধ সাধারণ মানুষের জন্য, লোকোত্তর পুরুষদের জন্য নয়। তার মানে এই নয় যে, তাঁরা সকলে বিধিবহির্ভূত বা নিষিদ্ধ আচরণ করেন। তাঁরা যে বিধিবদ্ধ আচরণ করেন তা বিধি আছে বলে নয়, স্বাভাবিক ভাবেই করেন। অথবা নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান যে তাঁরা করেন না তার কারণ স্বভাবতই তাঁদের ভিতরে সেইরকম কর্মের চিন্তা ওঠে না, এইজন্য তাঁরা বিধিনিষেধকে অনুসরণ করেন না, বিধিনিষেধ তাঁদের অনুসরণ করে চলে। যাঁরা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের পক্ষেই এরূপ আচরণ প্রযোজ্য। তাই ঠাকুরকে নিয়মকানুন মানতে না দেখে সাধুরা অবাক হয়ে ভাবছেন যে, এ সাধুর আচার জানে না।

একবার একটি সাধুকে ঠাকুর নিজেই দর্শন করতে গিয়েছেন।

কথাবার্তা বেশ জমেছে, এমন সময় ঠাকুর সমাধিস্থ। সাধুটি বলল, এ কেয়া? পহলে আসন লাগাও, পিছে সমাধি কর। আগে আসন করে বস, পরে সমাধি করবে। কারণ সাধু জানেন, এই-ই নিয়ম, গতানুগতিক পন্থায় চলতে হয়। ঠাকুরের মন গতানুগতিকতার অনুসরণ করে চলে না। যে সমাধি অন্তের পক্ষে অনেক সাধনার দ্বারা লভ্য, তাঁর পক্ষে যে সেটা স্বাভাবিক অবস্থা, সাধুটি তা কি করে বুঝবেন!

ঈশ্বরই কর্তা

তারপর হাজরাকে বলছেন, 'তিনিই আস্তিক, তিনিই নাস্তিক; তিনিই ভাল, তিনিই মন্দ; তিনিই সৎ তিনিই অসৎ; জাগা, ঘুম এ সব অবস্থা তাঁরই; আবার তিনি এসব অবস্থার পার।' এই তত্ত্বে স্থিতি থাকতে পারলে সব গোল মেটে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই মায়ার রাজ্যে আছি, পার্থক্যের অনুভব করছি, দ্বৈতবুদ্ধি রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সব হিসাব মেলে না। নানান রকমের প্রশ্ন ওঠে। ভগবান কেন এই জগৎটাকে সৃষ্টি করেছেন, কেনই বা কাকেও ভাল, কাকেও মন্দ করলেন? কর্মফল যদি বলি, কর্মফলই বা তিনি করলেন কেন? তিনিই যদি সব কিছু স্রষ্টা তাহলে এরকম নিগূঢ় কর্মের বন্ধনে তিনি মানুষকে বাঁধলেন কেন? এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। যার যেমন বিশ্বাস সে সেই অনুসারে ধারণা করে। কিন্তু পরিষ্কার করে কেউ বলতে পারে না কেন তিনি এইরকম করেন। তাই এককথায় বলে তাঁর লীলা অচিন্ত্য, তা বোঝার সাধ্য আমাদের নেই। সুতরাং গোল রয়েই যায়। ঠাকুর বলতেন, সব গোল মেটে যদি 'তিনিই সব' এই বুদ্ধি হয়। তিনিই যদি সব হয়ে থাকেন তাহলে তিনি কেন ভালমন্দ করলেন এ প্রশ্ন আসে না। কার ভাল, কার মন্দ? তিনি নিজেই সব হয়েছেন।

তারপর ঠাকুর বললেন, ঈশ্বরই কর্তা, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা আমরা বুঝতে পারি না। আমরা যতক্ষণ আমাদের ইচ্ছাকে ভগবৎ ইচ্ছা থেকে পৃথকরূপে বোধ করছি, যতক্ষণ আমরা নিজেদের একটি সীমিত গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ করে রেখেছি, ততক্ষণ ভগবৎ ইচ্ছাকে বোঝা আমাদের সাধ্যে নেই। তাই আমরা ঠাকুরের এই কথাটির তাৎপর্য বুঝতে পারি না। হাজরা তাই বললেন, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সব হচ্ছে, হতে পারে, কিন্তু বোঝা বড় শক্ত। তারপরে হাজরা নিজের কথাটির সমর্থনে একটি ঘটনা বললেন। ভূকৈলাসের সাধুকে কত কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলা হল। সমাধিস্থ সাধু, নানারকম ভাবে তাঁর চৈতন্য আনবার জন্য কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। শেষপর্যন্ত সাধুটি দেহত্যাগ করলেন। এর দুটি কারণই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে— লোকে যন্ত্রণা দেওয়ার ফলে তিনি মারা গেলেন, আবার ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সব কম, সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই মারা গিয়েছেন এও বলতে পারা যায়। কোন্‌টি যে ঠিক তা কেউ জানে না।

দেহধারণের উদ্দেশ্য—ঈশ্বরলাভ

ঠাকুর আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বললেন, 'যার যা কর্ম, তার ফল সে পাবে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে সাধুর দেহ-ত্যাগ হ'ল' কেন? না, দেহটা একটা যন্ত্র। এই যন্ত্রটা আমরা গ্রহণ করি তা দিয়ে কাজ করবার জন্য। আমরা কোদাল তৈরী করি মাটি কাটবার জন্য, মাটি কাটা হয়ে গেলে সেই কোদালের আর কোন উপযোগিতা থাকে না। উপমা দিয়েছেন ঠাকুর, কূয়া খোঁড়বার জন্য ঝুড়ি কোদাল দরকার, খোঁড়া হয়ে গেলে সেই ঝুড়ি কোদাল কেউ ফেলে দিতে পারে আবার কেউ রেখে দেয় যদি অপরের কাজে লাগে। তেমনি দেহও একটা যন্ত্র, আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই দেহের প্রয়োজন। এই কাজ সিদ্ধ

হবার পর দেহটার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। আত্মজ্ঞান লাভ হয়ে গেলে দেহটা থাকল আর গেল তাতে কিছু আসে যায় না। একটা উপমা দিলেন ঠাকুর, বোতলের ভিতরে মালমশলা দিয়ে মকরধ্বজ তৈরী করা হয়, মকরধ্বজ হয়ে গেলে পুরো বোতলটাকে ভেঙে ফেলে, ওর আর কোন দরকার নেই। ঠিক সেইরকম আত্মজ্ঞান লাভের জন্য দেহটার প্রয়োজন আছে তাই তাকে যত্ন করতে হবে। 'তেমনি লোকে ভাবে সাধুকে মেরে ফেললে, কিন্তু হয়ত তার জিনিস তৈয়ার হ'য়ে গিয়েছিল। ভগবান লাভের পর শরীর থাক্‌লেই বা কি, আর গেলেই বা কি?'

অবতারের প্রয়োজন

তারপর বলছেন, 'সমাধি অনেক প্রকার। হৃষীকেশের সাধুর কথার সঙ্গে আমার অবস্থা মিলে গিছলো।' সমাধিতে মনটা যখন যায় বিভিন্ন রকম অনুভূতি হয়। 'কখন দেখি শরীরের ভিতর বায়ু চল্‌ছে যেন পিঁপড়ের মত।' এগুলি যোগীদের কথা—পিপীলিকাবৎ, সর্পবৎ, পক্ষীবৎ, যার হয় সেই জানে। এগুলি বোঝানো আছে শাস্ত্রের কথা দিয়ে কিন্তু কথা দিয়ে তো মানুষের অনুভব হয় না। এইজন্য বললেন, 'যার হয়, সেই জানে। জগৎ ভুল হ'য়ে যায়।' তারপরেই বলছেন, 'মনটা একটু নাম্‌লে বলি, মা! আমায় ভাল কর, আমি কথা কব।' ভাল কর মানে, আমি কথা বলতে পারি এমন অবস্থায় রাখ। লোকের সঙ্গে কথা বলতে চান কেন? না, তিনি তো আত্মসংস্থ হয়ে থাকবার জন্য আসেননি, এসেছেন জগৎকে ভগবৎ কথা শোনাবার জন্য, তত্ত্বজ্ঞানের পথ দেখাবার জন্য। কাজেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে থাকতে চান না, তিনি চান সকলের কাছে সেই পথ উন্মুক্ত করতে। তাই বলছেন, 'মা! আমায় ভাল কর।'

তারপর বলছেন, 'ঈশ্বরকোটী না হ'লে সমাধির পর ফেরে না।' অবশ্য এটা সববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত নয়। কেউ মানে, কেউ মানে না। যারা মানে তাদের মত এই যে, সমাধির পর মানুষ আর ফেরে না। বলছেন, 'তিনি যখন নিজে মানুষ হ'য়ে আসেন, অবতার হন, জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন। লোকের মঙ্গলের জন্য।' মুক্তির চাবি তাঁর হাতে। তিনি সেই চাবি খুলে দিলে মুক্তির পথ সকলে দেখতে পায়, মুক্তির দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়। অবতার নিজে না দেখিয়ে দিলে, সেই পথ কে দেখাবে? শাস্ত্রে লেখা থাকে কিন্তু সেই লেখার মর্ম লোকে বুঝতে পারে না অবতার নিজের জীবনের ভিতর দিয়ে সেই মর্ম সকলকে বুঝিয়ে দেন।

হাজরা এই সময় বলছেন, 'ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে পারলেই হলো। অবতার থাকুন আর না থাকুন।' অর্থাৎ আবার একজন মধ্যবর্তী পুরুষকে আনবার দরকার কি? স্বয়ং ঈশ্বরই যখন রয়েছেন। ঠাকুর বলছেন, 'হাঁ, হাঁ। বিষ্ণুপুরে রেজিষ্টারীর বড় অফিস, সেখানে রেজেষ্টারী করতে পাল্লে, আর গোঘাটে গোল থাকে না।' যদি তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক হয় তখন আর অবতারের প্রয়োজন হয় না। ঠিকই কথা, কিন্তু সেই সম্পর্ক করা তো সোজা কথা নয়। তাই অবতারের প্রয়োজন, জীবের সঙ্গে সেই সম্বন্ধ করিয়ে দেবার জন্য। বিষ্ণুপুর হল মহকুমা, আর গোঘাট হল একটা থানা। কাজেই গোঘাটে ছোট আদালত, তার চেয়ে বড় আদালত হচ্ছে বিষ্ণুপুর। তারও চেয়েও বড় আদালত আছে বাঁকুড়া—জেলার হেড-কোয়ার্টার। তাই ঠাকুর বললেন, বিষ্ণুপুরে রেজেষ্টারী করলে আর গোঘাটে গোল থাকে না।

এরপর কথামৃতকার বলছেন, 'আজ মঙ্গলবার অমাবস্যা। সন্ধ্যা হইল,······ঠাকুর সহজেই ভাবময়।' অমাবস্যার রাত্রিতে ঠাকুরের বিশেষ ভাবের উদয় হচ্ছে। এরই নাম কাল-মাহাত্ম্য। আমরা

সাধারণ দৃষ্টিতে যে জিনিস বুঝতে পারি না ঠাকুরের সূক্ষ্মযন্ত্ররূপ যে মন, শুদ্ধ পবিত্র যে মন, সেই মনে এই মাহাত্ম্যগুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আবার ঠাকুর যে বিশেষ বিশেষ জায়গায় গিয়েছেন সেই সেই জায়গায় যে ভগবৎভাব জমাট বাঁধা থাকে সেই ভাবের স্ফুরণ, তার অনুভূতি, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হয়েছে। এ রকম দৃষ্টান্ত ঠাকুরের জীবনে অনেক আছে। এ মাহাত্ম্য সকলে অনুভব করতে পারে না, কিন্তু যাঁরা এইরকম সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন তাঁদের এইরকম ভাবান্তর হয়।

শোনা যায় বৃন্দাবনে শ্রীভগবানের লীলাস্থানগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ সেখানে এক-একটি জায়গায় যাচ্ছেন এক এক ভাবের উদয় হচ্ছে। বৃন্দাবনধামের লুপ্ত গৌরব, তার সব প্রাচীন কাহিনী যেন তাঁর ভিতরে জেগে উঠছে। তার থেকেই আবার এই লীলাস্থলগুলির পুনরুদ্ধার হয়েছে। এ কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় নয়, সূক্ষ্ম অনুভূতির বিষয়। সে অনুভূতি শুদ্ধমন ছাড়া হয় না।

ঠাকুরের জীবনেও দেখা গিয়েছে যে তিনি জানেনও না, হঠাৎ দুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণ যেই এসেছে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছেন। কথা বলছিলেন, গল্প করছিলেন, নানা প্রসঙ্গ চলছিল, হঠাৎ যেই সন্ধিক্ষণ এসেছে, তিনি সমাধিস্থ। সাধারণ লোকের মনে হয়তো এই সময় কোন রেখাপাত করে না, কিন্তু শুদ্ধ মনে সঙ্গে সঙ্গে সময়োচিত ভাবটি জেগে ওঠে।

ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলছেন, 'দেখ, ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়।' অর্থাৎ ঈশ্বর একটি সিদ্ধান্ত মাত্র নয়, কেবল বুদ্ধির সাহায্যে এই জগৎটাকে দেখে এর একজন স্রষ্টাকে অনুমান করে নেওয়া নয় বা শাস্ত্র পড়ে ঈশ্বরকে জানা নয়। ঠাকুর বলছেন, যেমন আমরা মানুষকে দর্শন করি, তিনি সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরকে তেমনই দর্শন করেছেন। যখন নরেন্দ্রনাথ বলছেন, আপনি যেসব দেখেন ও আপনার মাথার খেয়াল।

ঠাকুর বললেন, সে কি রে ! আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি, কথা কয়েছি ! তখন নরেন বলছে, ওরকম হয়। ঠাকুর নরেনের সঙ্গে তর্ক করলেন না। তিনি জানেন এখন তর্ক নিষ্ফল। শুধু বললেন, মা যখন বুঝিয়ে দেবে তখন বুঝবি। যখন মন সেই অনুভূতির উপযুক্ত হবে, ভিতর থেকে সেই অনুভব আপনি আসবে। তর্ক করে তাঁকে কে বুঝবে ? বড় বড় পণ্ডিতও এখানে দিশেহারা, কেউ বলছেন, তিনি আছেন, কেউ বলছেন নেই।

যোগদর্শন বলে দিলে ঈশ্বর নেই ; কারণ, আছেন তার প্রমাণ নেই। যে জিনিসটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, অনুভব করতে পারছি না, তা যে আছে তা কি করে বলব ? দার্শনিকদের একটি নিয়ম আছে। কোন বস্তু যে আছে তার প্রমাণ হচ্ছে তাকে দেখা। **esse est percipi** বলে একটা কথা আছে ল্যাটিনে। যার অর্থ একটা কিছু যে আছে তার প্রমাণ হল তার অনুভব। ঠাকুর বলছেন, এই অনুভব যদি স্থূল দৃষ্টিতে কারো না হয়, তা বলে কি সেই জিনিসটি নেই ? আমরা মনে করি যেহেতু আমরা দেখছি না অতএব নেই কিন্তু ঠাকুর বলছেন, আমি যে দেখেছি। শুধু যে আভাসে দেখেছি তা নয়, সাক্ষাৎ দেখেছি। ঠাকুরের কাছে এটি সিদ্ধান্ত মাত্র নয়, সাক্ষাৎ অনুভূত বস্তু।

তারপর মাস্টারমশাই-এর বিশ্বাসকে দৃঢ় করবার জন্য বলছেন, 'অমুকের দর্শন হয়েছে।' পাঁচজনের যদি দর্শন হয় তখন মনে হয় তাহলে হয়তো হবে, হয়তো আছে। অন্তত মনের ভিতর একটা সম্ভাবনার ভাব থাকবে।

তারপর প্রশ্ন করছেন, 'আচ্ছা, তোমার রূপ না নিরাকার, ভাল লাগে ?' মাস্টারমশাই ব্রহ্ম সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তবে ঠাকুরের কাছে তাঁর ক্রমশঃ একদেশীভাব কমে যাচ্ছে। তাই বলছেন, 'এখন একটু নিরাকার ভাল লাগে, তবে একটু একটু বুঝছি যে তিনিই এসব সাকার হয়েছেন।' অর্থাৎ যিনি নিরাকার তিনিই সাকার।

সচ্চিদানন্দ সাগরে আত্মারূপ মীন

তারপর ঠাকুর মাস্টারমশাই-এর নিরাকার ভাবের কথা শুনে বলছেন, "আমায় বেলঘরের মতিশীলের ঝিলে গাড়ী ক'রে নিয়ে যাবে? সেখানে মুড়ি ফেলে দাও, মাছ সব এসে মুড়ি খাবে। মাছগুলি ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে, দেখলে খুব আনন্দ হয়। তোমার উদ্দীপন হবে।' কি ভাবের উদ্দীপন হবে? না, যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে আত্মরূপ মীন ক্রীড়া করছে, যেন জীব নিজের সীমিত সত্তা নিয়ে অসীমের ভিতর খেলা করছে। আরও উপমা দিয়েছেন। একটা কলসী জলে ডুবান আছে, কলসীর ভিতরেও জল, বাইরেও জল। যে জল ভিতরে, সেই জলই বাইরে। কেবল মাঝখানে কলসীটা একটা আবরণ মাত্র, যা জলাশয় থেকে ভিতরের জলটাকে পৃথক করে রেখেছে। ঠিক সেইরকম সচ্চিদানন্দ সাগরে মীনরূপী জীব খেলা করে বেড়াচ্ছে তার সীমিত সত্তা নিয়ে। তার ভিতরে যেন নিজেকে একটু আলাদা বলে মনে করছে। আসলে সেই অসীম জলাশয়ের ভিতরে সে একটি বিন্দুমাত্র, ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, আর সেই অংশটি বিরাটের থেকে ভিন্ন নয়। আর একটি কথা বললেন। খুব বড় মাঠে দাঁড়ালে ঈশ্বরীয় ভাব, অনন্তের উদ্দীপন হয়। যদিও সকলেব হয় না। ঠাকুরের মত লোকোত্তর পুরুষদেরই হয়।

সাধনা ও সিদ্ধি

তারপরের কথাটি বললেন, 'তাঁকে দর্শন করতে হ'লে সাধনের দরকার। আমাকে কঠোর সাধন করতে হয়েছে। বেলতলায় কতরকম সাধন করেছি। গাছতলায় পড়ে থাকতুম, মা দেখা দাও বলে; চক্ষের জলে গা ভেসে যেতো।' কেন বলছেন এসব কথা? কারণ মানুষ তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না বলে মনে করে তিনি নেই। কিন্তু তাঁকে দেখতে হলে সাধনের দরকার। এই সাধন হল উপায় যার দ্বারা মনরূপ

যন্ত্রটি তাঁকে অনুভব করবার উপযোগী হবে। না হলে সেই সূক্ষ্ম বস্তুকে বোঝা যায় না। ঈশ্বররূপ বস্তুটি শুধু সূক্ষ্ম নয় যে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে তাঁকে দেখা যাবে। বস্তুটি শুদ্ধ, স্বচ্ছ। তার ভিতরে কোন রূপ নেই, রস নেই, কোন জাতি, গুণ, ক্রিয়া নেই। বস্তুকে বুঝতে হলে এই তিনটির দ্বারা বোঝা যায়—জাতি, গুণ, ক্রিয়া। কোন একটি বস্তুকে বুঝতে গেলে তার সমধর্মী যারা সেগুলির সঙ্গে তুলনা করে বোঝা যায় যে এটি অমুক। যেমন, একটা গাছকে দেখিয়ে বলা হয় এটা একটা গাছ। গাছ বলতে যেখানে যত গাছ আছে তার ভিতরে এটি একটি বলে বোঝা যায়। যিনি এক, অদ্বিতীয় তাঁর তো সমধর্মী কেউ থাকে না সুতরাং তাঁর জাতি নেই। আর একটি উপায় হল গুণের দ্বারা বোঝা। লাল নীল রং ইত্যাদি দিয়ে বস্তুকে বোঝা যায়। কিন্তু তাঁর ভিতরে কোন গুণ নেই। সুতরাং গুণ দিয়ে তাঁকে বোঝা যায় না। আর একটি উপায়ে বস্তুকে বোঝা যায়, সেটা হল ক্রিয়া দিয়ে। যেমন যে পাক করে সে পাচক, যে গান করে সে গায়ক। ভগবানের কোন ক্রিয়া নেই। তবুও আমরা এই জগৎ দেখে বলছি, এই জগৎ তিনি সৃষ্টি করেছেন, আসলে তাঁর উপরে এই সৃষ্টির কর্তৃত্ব আরোপ করে এই কথা বলছি। সৃষ্টি যে কখন করলেন তা তো দেখিনি, আর কে করেছেন তাও জানি না। জানার কোন উপায়ও নেই। জানতে হলে সৃষ্টির আগে দেখার দরকার ছিল যে কে করল। একটা কলসী তৈরী হয়ে আছে দেখলে বোঝা যায় না কলসীটা কে তৈরী করল। যদি একটা কুমোরকে কলসীটা তৈরী করতে দেখি তাহলে বুঝতে পারব এই কলসীটা কুমোর করেছে। এইরকম এই সৃষ্টিটাকে কে করল জানতে হলে সৃষ্টির পূর্ব অবস্থায় যেতে হবে, যা সম্ভব নয়। কারণ আমি হচ্ছি সেই সৃষ্টির অন্তর্গত একটি বস্তু। সুতরাং সৃষ্টির কর্তা যিনি তাঁকে কখনও বুঝতে পারব না। কোন ক্রিয়াই যাতে নেই তাঁকে চিনব কি করে?

এইরকম যে বস্তু, তাঁকে জানতে হলে সাধনের দরকার। কারণ সাধনের দ্বারা মন শুদ্ধ হয়। আর তিনি শুদ্ধ মনের গোচর, একথা শাস্ত্র বলেছেন, ঠাকুর বলেছেন। তবে সেই শুদ্ধ মন লাভ করতে হলে সাধন করতে হবে। অনেক সাধন করেছি একথা তিনি এজন্য বলছেন যে, তোমরাও কর তোমাদেরও সেইরকম মন শুদ্ধ হবে। তারপর ঠাকুর একটি বড় আশ্বাসের কথা বলছেন—'অমৃত বলে, একজন আগুন করলে দশজন পোয়ায়!' অর্থাৎ ঠাকুরের মতো করে সকলকে সাধন করতে হবে না।

কেন হবে না? না, বস্তু প্রমাণ তো তিনিই করে দিচ্ছেন তাঁর সাধন দিয়ে। অপরে যদি তাঁর উপরে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে বিশ্বাস করে যে তাঁর সাধনগুলি সত্য, সাধনের ফলও সত্য, তাহলে সাধন করে যা লাভ হবে ঠাকুরকে দর্শন করে তাঁর উপর শ্রদ্ধা স্থাপন করেও তাই লাভ হবে। এইজন্য বলছেন, একজন আগুন জ্বাললে দশজন পোয়ায়।

শ্রদ্ধা ও সিদ্ধিলাভ

যারা ঠাকুরের উপরে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হবে, তাঁর সাধনালব্ধ সম্পদ তারা পাবে। ঐ পাওয়ার মূল্যটুকু হচ্ছে তাঁর উপরে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে ঠাকুরকে সত্য বলে যেমন বিশ্বাস হবে, তাঁর সাধনা ও সাধনের পরিণামে যে উপলব্ধি তাকেও তেমনি বুঝবে। এই হল বিনা সাধনে বস্তুলাভ। হয়তো মনে হবে তাহলে তো খুব সোজা কথা হয়ে গেল। তিনি সাধন করলে আমাদেরও সাধনা করা হয়ে গেল। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে শ্রদ্ধা, সেটা অনেক বড় জিনিস। ঠাকুরকে ভক্তি করা সহজ কিন্তু সত্যি সত্যি শ্রদ্ধা অত সহজ নয়। গুরু শিষ্যকে বোঝাচ্ছেন নানারকম উপমা দিয়ে আর শিষ্য বলছে, আবার বলুন অর্থাৎ মনে বসছে না উপদেশ। এইরকম একটি দুটি তিনটি উপমা দেওয়ার পর

গুরু বলছেন, বৎস, শ্রদ্ধৎস্ব। বৎস, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও। শ্রদ্ধা না হলে কেবল তর্কের সাহায্যে, বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারবে না, হাজার উপমা দিলেও না। আর যদি শ্রদ্ধা থাকে এক কথায় ধারণা হয়ে যাবে। এই যে বস্তুকে সাক্ষাৎকার করার জন্য ঠাকুরের সাধন, তা তো তাঁর নিজের জন্য নয়, তাঁর নিজের কোন প্রয়োজনই ছিল না। সকলকে সেই সাধনলব্ধ বস্তু লাভ করিয়ে দেবার জন্য তাঁর সাধন। তিনি সাধন করে বস্তুকে প্রমাণিত করে দিলেন, অপরে শ্রদ্ধা সহকারে সেটি গ্রহণ করলে তাদের বস্তুলাভ হয়ে যাবে।

অবতারের নিত্য থেকে লীলায় অবতরণ

আবার ঠাকুর যদি সাধন করে, পরিপূর্ণ ব্রহ্মানুভূতিতে মগ্ন হয়ে থাকতেন তাহলে অসংখ্য মুক্তজীবেরই একজন হয়ে থাকতেন, অবতার বলে গণ্য হতেন না। জগতে বহুব্যক্তি এমনি সাধন প্রভাবে মুক্ত হয়েছেন। ঠাকুরও তেমনি হলে জগতের বদ্ধজীবের কোন কল্যাণ হত না। তাই ঠাকুর বলছেন, 'নিত্যে পৌঁছে লীলায় থাকা ভাল।' অর্থাৎ সাধক ভগবানের নির্গুণ নির্বিশেষ রূপ অনুভবের পর এই সগুণ সবিশেষ রূপটি যদি অনুভব করেন তবেই তিনি অপরের কল্যাণের যন্ত্র হতে পারেন, ঠাকুর তাই কেবল ব্রহ্মানুভূতিতে মগ্ন হয়ে থাকেননি। তিনি সেজন্য আসেননি। তিনি এই জগৎ বৈচিত্র্যের ভিতরে সকলের সঙ্গে থেকে ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করে এবং সকলকে দর্শন করবার উপায় দেখিয়ে তাঁর অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্যকে সার্থক করেছেন। তাই বলছেন, 'নিত্যে পৌঁছে লীলায় থাকা ভাল।' তাতে দশজনের কল্যাণ হয়। শ্রীমা বলছেন, 'লীলা বিলাসের জন্য।' বিলাস মানে নানাভাবে আনন্দকে আস্বাদন করা। কিন্তু ব্রহ্ম যদি সর্বভাবের অতীত হন, তাহলে নানাভাবে আস্বাদন করা মানে সেগুলি কাল্পনিক হবে, মিথ্যা

হবে। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, 'না। লীলাও সত্য।' অর্থাৎ কাল্পনিক বা মিথ্যা নয়। রাজার ছেলে ভিখারীর অভিনয় করছে বিলাসের জন্য, কিন্তু লীলা এরকম বিলাসের জন্য নয়। তিনি স্বরূপতঃ নির্বিশেষ কিন্তু নিজে কাল্পনিক বহুরূপ ধারণ করে যেন বহু হয়েছেন, এই কথা বেদান্তের সিদ্ধান্ত অনুসারে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, 'না, লীলাও সত্য।'

ঈশ্বর যেমন একদিক দিয়ে নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয় আর এক-দিক দিয়ে তিনি বৈচিত্র্যময়ও বটে। ভক্তিবাদীরা বলেন, তাঁর ঐশ্বর্য তর্কের অতীত। মহিম্ন স্তোত্রে বলছেন, তোমার ঐশ্বর্য তর্ক ও যুক্তির অতীত, বুদ্ধির সীমা ছাড়িয়ে। যদি ব্রহ্ম সত্য হন, তাহলে লীলা মিথ্যা হবে, এইরকম যে একটা আমাদের অনুমান আছে তা সঠিক নয়। ঠাকুর বলছেন, দুই-ই সত্য। দুটি বিরুদ্ধ জিনিস কি করে সত্য হতে পারে? ঠাকুরের উত্তর, তোমার এক ছটাক বুদ্ধি দিয়ে কি করে জানবে? তিনি যে কি হতে পারেন আর কি হতে পারেন না তা তুমি কি করে বুঝবে? একটি উপমা দিচ্ছেন যাতে বাইবেলের একটি কথাব একটু আভাষ আছে। একজন বলছেন, আপনি তো ভগবানের কাছ থেকে এলেন, তা তিনি কি করছেন? উত্তর হ'ল তিনি ছুঁচের ভিতর দিয়ে হাতি পার করছেন। শুনে সে হেসে বললে, বাজেকথা, ভগবানের কাছে তুমি যাওই নি। আর একজন বললে, হতেও পারে, তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। এই হ'ল বিশ্বাসের কথা। লীলাকে সত্য বলা যায় যুক্তির সাহায্যে নয়, অনুভবের সাহায্যে। ঠাকুরের অনুভব যুক্তির বাঁধা গতের ভিতর দিয়ে চলে না। বাঁধা গতের ভিতর দিয়ে যুক্তি সার্থক হয় কখন? যখন আমরা জাগতিক বিষয় নিয়ে যুক্তি দেখাই। কিন্তু যখন জগৎ অতীত বস্তু নিয়ে বিচার করতে যাই তখন এই অনুমান সেখানে অচল। যে বস্তু তর্কের অগম্য তাতে তর্ক প্রয়োগ করলে তর্ক প্রতিহত

হয়। কাজেই তর্কের সেখানে স্থান নেই। লীলা আর ব্রহ্ম দুই কি করে সত্য হবে, এর উত্তর হচ্ছে যাঁরা এর পারে গিয়েছেন তাঁরা বলতে পারেন। তাঁরা যদি বলেন দুই-ই হতে পারে, আমাদের মাথা নত করে স্বীকার করতে হবে যে দুই-ই হতে পারে।

ঠাকুর বলছেন, লীলা সত্য। মাস্টারমশাই বললেন, লীলা বিলাসের জন্য। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বললেন, 'না। লীলাও সত্য।' ঠাকুরের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনেক সময় আমরা মনে করি, তিনি আসলে বেদান্তী, অদ্বৈত তত্ত্বকেই মানেন আর দ্বৈতকে মেনেছেন যেন উপায় রূপে, উদ্দেশ্যরূপে নয়। কিন্তু ঠাকুরের কথা তা নয়। নিজমুখে ঠাকুর যা বলছেন তাতে লীলাকে কেবল উপায় রূপে বলছেন না, অনুভব করে বলছেন লীলাও সত্য। কাজেই আমাদের সাধ্য নেই যে, এই অনুভূতিকে যুক্তির দ্বারা প্রতিহত করি। অনুভবকে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা যায় না। যতই দার্শনিক হই, শাস্ত্রজ্ঞ হই বা বুদ্ধিবাদী হই এটা মনে রাখতে হবে যে, যুক্তি অনুভবকে অনুসরণ করে, অনুভব যুক্তিকে অনুসরণ করে না। সুতরাং তিনি যখন অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে উপলব্ধি করে বলছেন যে, লীলা সত্য তখন তাকে মানতেই হবে।

সেবা ও সিদ্ধি

হঠাৎ ঠাকুর আর একটি কথা বলছেন, 'আর দেখ, যখন আসবে, তখন হাতে করে একটু কিছু আনবে।. নিজে বলতে নাই, অভিমান হয়। অধর সেনকেও বলি, এক পয়সার কিছু নিয়ে এসো। ভবনাথকে বলি,. এক পয়সার পান আনিস্।' কেন একথা ঠাকুর বলছেন? ঠাকুরের কি বড় অভাব পড়েছিল, যার জন্য তিনি একটু কিছু প্রত্যাশা করছেন? যিনি সর্ব কামনা বাসনা বর্জিত তাঁর মুখে কেন একথা? মাস্টার মশাইকে শেখাচ্ছেন যে তত্ত্বকে অনুভব করতে হলে কেবল বুদ্ধির

দ্বারা হবে না, সেবা দরকার। এর জন্য যে খুব অর্থ দরকার হয় তা নয় থালি অনুভবের দরকার। এই সেবা যদি থাকে তাহলে যাঁর কাছ থেকে আমি তত্ত্বকে জানতে যাচ্ছি তাঁর সঙ্গে একটা অন্তরের যোগ হয়। সেই সংযোগের ফলে, যে উচ্চভাব ঐ মহৎ ব্যক্তির ভিতরে আছে তা ধীরে ধীরে আমার ভিতরে সংক্রামিত হবে। সেবার ফলে এইরূপ হয়। তিনটি জিনিস গীতায় বলেছে, 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবা। প্রথম কথাটি হচ্ছে বিনীত হতে হবে। দ্বিতীয় কথাটি বলছেন, জিজ্ঞাসু হতে হবে আর তৃতীয় কথাটি বললেন, সেবাপরায়ণ হতে হবে। এই তিনটি যদি না হয় তাহলে তত্ত্ব অনুভূতি হয় না। এ তো আর লৌকিক জ্ঞান নয় যে ফি দিয়ে একটা কোর্স করলাম আর সেটা আমার অধিগত হয়ে গেল। তত্ত্বকে জানতে হলে সেবার ভিতর দিয়ে সম্বন্ধ স্থাপন করে তবে গুরুর কাছ থেকে তা লাভ করতে হয়, তা না হলে হয় না। যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ তাঁরা উপদেশ দেবেন কিন্তু উপদেশ শুধু দিলেই হল না, যে গ্রহণ করবে তার জিজ্ঞাসা থাকা চাই জানবার আকাঙ্খা থাকা চাই, তার ভিতরে নম্রতা এবং সেবাপরায়ণতা থাকা চাই। মাস্টারমশাইকে এখানে বললেন, 'আমার পা'টা একটু কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো গা।' কারণ এর ভিতর দিয়ে তিনি গুরুসেবা শেখাচ্ছেন। মাস্টারমশাই গুরুসেবা জানেন না।

আর একটি বিষয় বললেন, 'জ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই পথ। ভক্তিপথে একটু আচার বেশী করতে হয়। জ্ঞানপথে যদি অনাচার কেউ করে, সে নষ্ট হয়ে যায়। বেশী আগুন জ্বাললে কলা গাছটাও ভিতরে ফেলে দিলে পুড়ে যায়।' আচার বিচার বলতে লৌকিক আচার বিচারকেই মুখ্য করা হচ্ছে। যেমন শুদ্ধ বস্ত্রে ভগবানের চিন্তা করবে বা অশুদ্ধ আহার করবে না। এগুলি সকলের জন্য বাধ্যতামূলক, অবশ্য করণীয়।

ভক্তিপথে বাইরের আচারগুলিও মানতে হয়। জ্ঞানীর পক্ষে, সেগুলির অত প্রয়োজন নেই। জ্ঞানীর পথ বিচার পথ। এই পথে নাস্তিক ভাব হয়তো কখনও কখনও এসে পড়ে। বিচার করতে করতে যখন বুদ্ধি আর কিছুতেই কূল পায় না কোথাও, তখন মনে হয় ওসব কিছু নয়। এতে দোষ নেই, কারণ তার বিচার জাগ্রত আছে। নাস্তিকভাব ভক্তদেরও কখনও কখনও আসে, সন্দেহ আসে,- বিশ্বাস যেন ক্ষীণ হয়ে যায়, কিন্তু অনেকদিন ধরে দৃঢ় অভ্যাস করেছে বলে, এ ভাব এলেও সে ছেড়ে দেয় না, ধরে থাকে। খানদানী চাষা হাজার শুখো হোক, ফসল না হোক, তবু সে চাষ করেই যাবে।

কথামৃতকার উপসংহারে বলছেন 'তিনি সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিতে করিতে শ্রীমুখ হইতে বেদধ্বনি শুনিতেছিলেন।' এরই নাম বেদধ্বনি। বেদ, যা সমস্ত জ্ঞানের আকর। বেদ থেকে আমরা তত্ত্বকে যখন জানতে চেষ্টা করি তখনও কেবল শব্দ মাত্রই শুনি। কিন্তু যখন তত্ত্বকে বিশেষ করে ঈশ্বরাবতারের কাছ থেকে শুনি তখন তাঁর কথাগুলি কেবল আমাদের বুদ্ধিকেই আকৃষ্ট করে না, উপরন্তু আমাদের অন্তরে যেন জ্ঞানের আলোক জ্বেলে দেয়, আমাদের হৃদয়ে অনুভূতিকে জাগ্রত করে। এখানে বেদ মানে পুঁথিমাত্র নয় সাক্ষাৎ বেদ, জ্ঞানের মূর্তরূপ। তাই সেখান থেকে যে আলো আসে সেই আলো আমাদের সমস্ত অন্ধকার নিঃশেষে দূর করে দেয় (একথাই বোঝাচ্ছে)।

তিন

২. ৮. ১-২

সংসারাশ্রমে বাস করার কৌশল

রাখাল মহারাজের মাতামহ এসেছেন। তিনি প্রশ্ন করছেন, 'গৃহস্থাশ্রমে কি ভগবান লাভ হয়?' এ প্রশ্ন চিরন্তন, সর্বদাই অনেকের কাছে শোনা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—'কেন হবে না? পাঁকাল মাছের মতো থাকো। সে পাঁকে থাকে কিন্তু গায়ে পাঁক নাই।' সংসারে থাকবে কিন্তু সংসারের মলিনতা তোমাকে স্পর্শ করবে না। এইভাবে নির্লিপ্ত হয়ে থাকা। প্রথম দৃষ্টান্ত পাঁকাল মাছের, তার চেয়ে আরও নিকট দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, 'ঘুস্‌কির মত থাকো। সে ঘরকন্নার সব কাজ করে, কিন্তু মন উপপতির উপর পড়ে থাকে।' ভাব হচ্ছে এই যার প্রতি মনেুষের প্রবল আকর্ষণ, অন্যরূপ অবস্থার মধ্যে থেকেও মন কিন্তু সেই আকর্ষণের বস্তুরই চিন্তা করে। এমন দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যাতে সকলে বুঝতে পারে। ('ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারে সব কাজ কর।' সংসারে থেকে সংসারের যা কিছু কর্তব্য সব করে যেতে হবে কিন্তু মন থাকবে ঈশ্বরে। ভাগবতের গোপীরা সংসারে নিজের নিজের কর্তব্য করতেন, কিন্তু মন শ্রীকৃষ্ণের উপর অর্পিত। কাজেই সংসারের সব কাজ যেন মনের একটা হাল্কা উপরের ভাগ দিয়ে হচ্ছে। অন্তরে সেই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বয়ে চলেছে। এটি হল সংসারে থেকেও ভগবানলাভের উপায়)

ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন দাঁতের ব্যথা—ব্যথা নিয়েও লোকে সব কাজ করে কিন্তু মনটা পড়ে থাকে দাঁতের উপর। সব সময় সেই বেদনাটির

বোধ থাকে। এইরকম ভগবানের জন্যে কারো মনে যদি বেদনাবোধ জেগে থাকে যে তাঁকে পাওয়া হল না, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক হল না, এই ভাবনা যদি মনের মধ্যে থাকে তাহলে আর সংসারের চিন্তা তাকে লিপ্ত করতে পারে না।

অন্যত্র একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। রাজার কাছে যোগী এসেছেন। তিনি অত্যন্ত বিলাসী যোগী, নানা ভোগবিলাসের মধ্যে থাকেন। রাজার তাই যোগীটিকে তেমন ভাল মনে হল না। রাজা বললেন, এত বিলাসে লিপ্ত থেকে আপনি কি করে ভগবানে মন রাখেন? যোগী বললেন, এখন নয়, পরে এর উত্তর দেব। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলছি মনে রেখ, এক বছর পরে তোমার মৃত্যু হবে। রাজা সাধুর কথায় খুব বিশ্বাস করলেন, ভাবলেন সত্যিই হয়ত হবে। তারপর মৃত্যুচিন্তা তাঁকে এমন বিব্রত করে তুলল যে ভোগে আর তাঁর মন নেই। এইভাবে একবছর যখন অবসান-প্রায় তখন সাধুটি বলছেন, কি মহারাজ, এখন তোমার মনে কাম ক্রোধাদির বিকার কিরকম হচ্ছে? রাজা বললেন, আর বলেন কেন, এখন মৃত্যুচিন্তা আমাকে একেবারে গ্রাস করে রেখেছে, আর অন্য চিন্তা করার সময় নেই। সাধুটি বললেন, মহারাজ, আমিও সর্বদা ঐ রকম ঈশ্বরচিন্তা করি, যার জন্য অন্য চিন্তা আমার মনে স্থান পায় না। মানুষের বাইরের আচার ব্যবহার দেখে এইজন্য বোঝা যায় না। সে মনকে যেদিকে নিবিষ্ট করে রাখে সেইদিকেই মন থাকে। শরীর অন্যভাবে থাকলেও বা পরিবেশ অন্য হলেও তা মনকে স্পর্শ করে না। এটি বিশেষরূপে শিক্ষণীয়।

তারপরেই ঠাকুর বলছেন, 'কিন্তু বড় কঠিন।' মুখে উপদেশ দেওয়া সহজ কিন্তু সেই উপদেশকে পালন করা অত সহজ নয়। 'আমি ব্রহ্মজ্ঞানীদের বলেছিলুম যে ঘরে আচার তেতুল আর জলের জালা সেই ঘরেই বিকারের রোগী! কেমন করে রোগ সারবে?' এইজন্য

প্রলোভনের বস্তু থেকে সকলেরই যথাসম্ভব দূরে থাকতে হয়। তা না হলে প্রলোভনের বস্তু কোন না কোন সময় মনকে স্পর্শ করবে এবং ব্যাকুল করে তুলবে।

নির্জনবাসের প্রয়োজনীয়তা

'সংসারে নানা গোল। এদিকে যাবি, কোঁস্তা ফেলে মারব; ওদিকে যাবি, ঝাঁটা ফেলে মারব; এদিকে যাবি জুতো ফেলে মারব।' অর্থাৎ মানুষের পালাবার যেন পথ নেই। যে পথে যাচ্ছে সে পথেই বিঘ্ন; প্রতিকূলতা। এটি একটি অত্যন্ত অসহায় অবস্থার কথা ঠাকুর বলছেন, কিন্তু তা বলে তিনি কাকেও নিরাশ করেননি। বলেছেন, সকলেরই এ অবস্থা থেকে ঊর্ধ্বে উঠবার পথ আছে। (সংসারের ভিতর যারা আছে ঠাকুর তাদের বলতেন, মাঝে মাঝে নির্জনে ঈশ্বরের চিন্তা করতে হয়। নাহলে নিজের মনকে কখনও বশে আনা যায় না। এমনিই মন চঞ্চল, তার উপর যদি চারিদিকে চাঞ্চল্যের কারণ থাকে তাহলে সে মনকে বশ করা অসম্ভব) এইজন্য মাঝে মাঝে নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করা দরকার। সর্বদা তো সম্ভব নয়, সেইজন্য বলছেন, মাঝে মাঝে। কতদিন ঈশ্বর চিন্তা নির্জনে করতে হবে? নিজেই তা বলে দিচ্ছেন, যতদিন পার। দীর্ঘকাল পারলে খুব ভাল, তা যদি না পারা যায় একমাস বা তিনদিন, একদিনও যদি হয় তাও ভাল। কারণ এইসময় মানুষের মনের পরিচয় ঠিক ঠিক মেলে। (যতক্ষণ না নির্জনে গিয়ে মানুষ মনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে চেষ্টা করে ততক্ষণ পর্যন্ত মনের স্বরূপ, মন যে কিভাবে তাকে বিপথগামী করছে সে বুঝতেই পারে না। অনেকে মনে করে আমি ভগবানের নাম বেশ করতে পারি। করতে পারি বলে মনে করে কিন্তু তার মনের খবর যদি রাখে তাহলে সে বুঝতে পারে যে, এরকম মনে করায় কোন কাজ হবে না। মন যখন

বিপথগামী হচ্ছে তাকে টেনে রাখবার সময় বোঝা যায় মনের শক্তি কত। মন যে কতখানি প্রতিকূল তা সংগ্রাম না করলে মানুষ বুঝতেই পারে না। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, 'যখন কেল্লায় যাচ্ছি, একটুও বুঝ্‌তে পারি নাই যে গড়ানে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কেল্লার ভিতরে গাড়ী পৌছলে দেখতে পেলুম কত নীচে এসেছি।' এইরকম সংসারের পরিবেশের ভিতর থেকে মন আমাদের অজ্ঞাতসারে কত নীচে নেমে যায় সে কথা বুঝতে পারা যায় যদি আমরা উপরের দিকে চেয়ে দেখি। সেই উপরের দিকে চেয়ে দেখবার অবকাশ হয় না যদি না আমরা নির্জনে গিয়ে ভিন্ন পরিবেশে মনকে দেখতে চেষ্টা করি। এজন্য নির্জনে সাধনের কথা ঠাকুর বার বার বলছেন। বলছেন, 'আর নির্জন না হলে ভগবান্ চিন্তা হয় না। সোনা গলিয়ে গয়না গোড়বো, তা যদি গলাবার সময় পাঁচবার ডাকে, তাহ'লে সোনা গলান কেমন ক'রে হয়?' খুব একাগ্র না হলে মনকে একদিকে নিবিষ্ট করবার কোন আশা নেই, করতে পারবও না। 'চাল কাঁড়ছো একলা বসে কাঁড়তে হয়। এক একবার চাল হাতে করে তুলে দেখতে হয়, কেমন সাফ হলো। কাঁড়তে কাঁড়তে যদি পাঁচবার ডাকবে, ভাল কাঁড়া কেমন করে হয়?' সাধন করতে করতে মাঝে মাঝে মনকে পরীক্ষা করে দেখতে হয় যে কতখানি মনটা ভগবানের দিকে গেল।

বেশ হয়তো জপধ্যান হচ্ছে। মনে করছি বেশ হচ্ছে, কিন্তু মনকে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে না। মনকে ছেড়ে দিয়েছি. তার দিকে সজাগ দৃষ্টি নেই। থাকলে বুঝতে পারব মন কোথায়, ঈশ্বরচিন্তার নাম করে সে কি করছে। অনেকসময় হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভগবানের নামে কাটল কিছু তারপর যদি আমরা খতিয়ে দেখি যে এই এতক্ষণ সময়ের ভিতর কতক্ষণ ঠিক ঠিক নাম হল, আর কতক্ষণ আজে বাজে চিন্তা হল তখন বোঝা যাবে এই সময়টার অধিকাংশই মন অন্যচিন্তায় ভরা

ছিল, তাদের সরাতে পারিনি। মনকে এভাবে খতিয়ে দেখলে সাধনের অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যায়।

অনেক সময় একটু জপধ্যান করে অহঙ্কার আসে, আমি খুব জপ-ধ্যান করছি। আমাদের অনেক সময় অনেকে বলে, আমি এক হাজার-বার জপ করি, কেউ বলে পাঁচ হাজার, কেউ বলে দশ হাজার জপ করি। কিন্তু দশ হাজারবার ভগবানের নাম জপ করার সময় ঠিক ঠিক জপ কবার হয় একথা যদি ভেবে দেখে তাহলে দশ হাজারবার জপ করি বলতে লজ্জা হবে। ভগবানের নাম সত্যিই কি দশ হাজারবার হয়? এটি বিশেষ করে ভাববার। কাঁড়া চালের মত মাঝে মাঝে মনকে তুলে দেখতে হয়, পরীক্ষা করতে হয় যে মনের অবস্থা কি হল। এভাবে বিচার করলে মনের প্রকৃত অবস্থা ধরা পড়ে। আর এই বিচার তখনই ভাল করে সম্ভব হয় যখন আমরা নির্জনে শান্ত পরিবেশের মধ্যে গিয়ে তাঁকে চিন্তা করে দেখি)

তীব্র বৈরাগ্য

এইরকম অবস্থা শুনে একজনের মনে উঠল, মহাশয়, এখন উপায় কি? অর্থাৎ এই প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে আমরা রয়েছি, সরে দাঁড়াতে বললেই তো পারি না। সংসারে নানানরকম কর্তব্যের যে জাল রয়েছে তার ভিতরে আমরা বদ্ধ। ছেড়ে যাব বললেই কি যাওয়া যায়? আর ঠাকুর এরকম করে ছেড়ে যেতে কখনও বলেনও না। সুতরাং মনকে প্রশ্ন করতে হয়, কোনো উপায় আছে কি? ঠাকুর বলছেন, 'আছে। যদি তীব্র বৈরাগ্য হয়, তাহলে হয়। যা মিথ্যা বলে জান্‌ছি, তাকে রোক্ করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর।' এখন রোক্ বললেই তো মনে সেই রোক্ আসে না। মন গতানুগতিক অবস্থার মধ্যে পড়ে থাকে আর মাঝে মাঝে খালি বলে, এ অবস্থা

অসহ্য। অসহ্য কথাটা মুখেই বলা হয়, আসলে অসহ্য মনে হয় না, বেশ সহ্য হয়। বরং সংসারের বাইরে গেলে চিন্তা হয়, তাই তো ঘরে কি হচ্ছে কে জানে। ভগবানের নাম করবার জন্য হয়তো কাশী গিয়েছে, কাশী গিয়ে চিঠি লিখলে, বাবা, তোমরা সব কেমন আছ জানতে পারিনি এইজন্য মনটা বড় চঞ্চল। কাশী গিয়ে বিশ্বনাথে মন রয়েছে কি? না, এই সংসারে কি হচ্ছে না হচ্ছে জানা যাচ্ছে না সেইজন্য মন চঞ্চল রয়েছে। এটা যে বিশেষ কাকেও কটাক্ষ করে বলা তা নয়। সাধারণ মানুষের মনের এইটি হল স্বাভাবিক অবস্থা।

তবে বলছেন, রোক্ থাকলে এর ভিতরেও হয়। খুব তীব্র অনুরাগ যদি মনে থাকে, মনে দৃঢ়তা থাকে তাহলে হয়। যেমন ঠাকুরকে কবিরাজ বলেছেন, এই ওষুধ খেলে আর জল খেতে পাবে না। ঠাকুর বলছেন, 'আমি রোক্ কল্লুম, আর জল খাব না। পরমহংস! আমি ত পাতিহাঁস নই—রাজহাঁস!' একটি জনশ্রুতি আছে জল মিশানো দুধ থাকলে হাঁস জলটা বাদ দিয়ে দুধটা খায়। তাই বলছেন, আমি দুধ খাব, জল খাব না। অর্থাৎ ভগবান ছাড়া অন্য জিনিস মনে স্থান পাবে না। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলতেন, জপধ্যানের সময় মনের দরজায় লিখে দাও, 'No Admission' অর্থাৎ ভগবান ছাড়া অন্য চিন্তার প্রবেশ নিষেধ। এ স্বামী তুরীয়ানন্দের পক্ষেই সম্ভব, তিনি বলতে পারতেন। সাধারণ মানুষ এইভাবে প্রবেশ নিষেধ বললেই অন্য চিন্তার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় না। কাজেই এ একটা অনন্ত সংগ্রাম। কবে যে এর শেষ হবে তার স্থিরতা নেই। এই সংগ্রাম প্রত্যেককে করতেই হবে। আর এই সংগ্রামে মনকে শক্ত করবার জন্য মাঝে মাঝে একটু সরে যেতেই হয়।

শুধু তীর্থে যাওয়া বললেই হবে না। সংসারের পরিবেশ থেকে দূরে তীর্থে গিয়ে মনকে যাচাই করে দেখতে হবে, ভাবতে হবে এবং

যদি কিছু উপায় থাকে তা করতে হবে। যেমন চণ্ডীতে আছে যে সুরথ রাজা এবং বৈশ্য সমাধি রাজ্য ও সংসার থেকে বিতাড়িত। কিন্তু মুনির আশ্রমে গিয়েও সেই সংসারের চিন্তা, রাজ্যের চিন্তা মনকে অধিকার করে রয়েছে। বিচার করে তাঁরা বুঝতে পারেন যে এ চিন্তার প্রয়োজন নেই। যারা আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করেছে, যারা তাড়িয়ে দিয়েছে তাদের জন্যই ভাবছি! সংসারে এই এক যন্ত্রণা। ঘরে ঘরে এইরকম। ছেলে বাপমায়ের উপর অত্যাচার করছে, কথা শোনে না। সেই ছেলের জন্য ভেবে ভেবে বাপ মা অত্যন্ত কাতর। বিচার করে দেখে না। যেহেতু সন্তান সেই হেতু তার আকর্ষণ, মায়ামোহ এমন প্রবল যে তাদের কথা না ভেবে থাকতে পারে না। এ থেকে উদ্ধারের উপায় মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তা করা। ঠাকুর বলছেন, 'বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্‌লে আর ভয় নাই। সোনা হলে তারপরে যেখানেই থাক।' নির্জনে থেকে যখন মনটা তৈরী হল, তৈরী হওয়া মানে ভক্তি লাভ বা ভগবানলাভ হল বা মনে বৈরাগ্যটা পাকা হল, তারপর সে যেখানেই থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না। তখন সংসারেও থাকা যায়। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, দুধ জলের সঙ্গে মিশে যায় কিন্তু দুধকে দই পেতে মাখন তুলে সেই মাখনকে জলে রাখলে তা জলের সঙ্গে মেশে না। ঠিক সেইরকম মনকে যদি সাধন করে তৈরী করা যায়, তারপর সেই মন সংসারের ভিতরে থাকলেও আর তাতে মিশে যায় না।

বলছেন, 'তাইত ছোকরাদের থাকতে বলি। কেন না, এখানে দিনকতক থাকলে ভগবানে ভক্তি হবে। তখন বেশ সংসারে গিয়ে থাকতে পারবে।' এখানে ঠাকুরের কথার মধ্যে একটু কৌশল আছে। সংসারী যারা এসেছেন তাদের ভয় যে তাদের ছেলেদের ঠাকুর বুঝি চিরকালের জন্য বিগড়ে দেবেন। তাই ঠাকুর তাদের আশ্বস্ত করবার জন্য একথা বলছেন, আমি এদের যে সংসার ছাড়তে বলছি তা নয়।

বাস্তবিকই ঠাকুর কখনও সবাইকে সংসার ছাড়তে বলেননি, বলেছেন, ভগবানের চিন্তা করতে। তাঁর চিহ্নিত সন্তানদের একরকম উপদেশ দিতেন আর অপরকে বলতেন, খেয়ে লে, পরে লে অর্থাৎ খেয়ে নাও পরে নাও। যেমন মনের প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা তেমন ভোগ করে নাও। কিন্তু জেনো ওসব কিছুই নয়, অর্থাৎ স্থায়ী শান্তি ওর থেকে লাভ হবে না। এ বিচার যখন মনে আসবে তখন জীবনে একটা পরিবর্তন আসবে। তখন সাধনের প্রয়োজন হবে, প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামের প্রয়োজন হবে। তার আগে পর্যন্ত জীবনে সংগ্রামের আরম্ভই হবে না। ঠাকুর ত্যাগের উপদেশ কাকেও গোড়া থেকে দিতেন না। বরং বলতেন, পেটের দায় যেখানে, মনে অন্নচিন্তা, সেখানে ভগবানের চিন্তা স্থান পায় না। বার বার বলেছেন, খালিপেটে ধম হয় না। অদ্ভুত অবাস্তব কোনো আদর্শের কথা বলেননি। বাস্তবকে সবসময় সামনে রেখেই তিনি যেটা গ্রহণযোগ্য সেটাই বলেছেন। সকলের পক্ষেই এক পথ নয়। কাজেই কাউকে বলেছেন, সংসার কর। হাজরাকে বলছেন, সংসারে গিয়ে থাক, বাপমায়ের সেবা কর। স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ কর। আবার কাকেও বলেছেন, সংসারে পা বাড়াসনি। এ-দুটি আপাতবিরোধী কথা কিন্তু বাস্তবিক বিরোধী নয়, বিচার করলে বিরোধ থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর পক্ষে উপদেশ ভিন্ন ভিন্ন, সকলের পক্ষে এক পথ্য নয়।

পাপপুণ্যের সমস্যা

তারপর একজন বলছেন যে, ঈশ্বর যদি সবই করেছেন তবে ভাল-মন্দ পাপ পুণ্য এসব বলে কেন? পাপও তাহলে তাঁর ইচ্ছা? এই প্রশ্ন চিরকাল মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তাঁর ইচ্ছা, এ অনুভব যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কেউ বুঝতে পারে না এবং অনুভব তখনই হয় যখন মানুষ

নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেয়। প্রত্যেকটি কাজ আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে করি, অথচ বলি তাঁর ইচ্ছায় সব হচ্ছে। ও কেবল মুখের কথা। ঠাকুর বলছেন, 'পাপপুণ্য আছে, কিন্তু তিনি নিজে নির্লিপ্ত।' পাপপুণ্য কোনটাই তাঁর নেই। যেমন আমাদের কাছে অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—তিনটি কাল আছে। কিন্তু যদি কারো দৃষ্টিতে এই তিনটি কাল একসঙ্গে প্রতিভাত হয় তাহলে তার কাছে আর তিনটি কাল নেই, একটিই কাল। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যে, একটি হাঁড়ির উপর দিয়ে পিঁপড়ে চলছে। একজায়গা থেকে আরম্ভ করেছে চলতে, মাঝখানে এসেছে, অপরদিকে এগিয়ে যাবে। এটা যে একসঙ্গে দেখছে তার কাছে সবটাই বর্তমান। অতীত, বর্তমান আলাদা নয়, ভবিষ্যৎ বলেও কিছু নেই। কিন্তু পিঁপড়ের দৃষ্টি সংকীর্ণ, যেমন যেমন এগোচ্ছে, তার খানিকটা দৃষ্টি সেদিক থেকে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, তাকে আমরা বলছি অতীত। আর সেই দৃষ্টি যখন বর্তমান ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের দিকে একটুখানি যাচ্ছে তাকে বলি ভবিষ্যৎ। এটা যদি সমস্তটা সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে কেউ দেখে তাহলে তার কাছে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে আর কোন বস্তু নেই। তাই স্বামীজী গানে বলেছেন, 'কাল বদ্ধ বর্তমানে'।

এই যে সংবিত অর্থাৎ নিত্যজ্ঞান সেই জ্ঞানের উদয়ও নেই অস্তও নেই। যাদের সংকীর্ণ বুদ্ধি তাদের জ্ঞানের উদয় হচ্ছে অস্ত হচ্ছে। জ্ঞান বলতে আমরা যে ব্যবহারিক জ্ঞানের কথা বলছি তার উদয় আছে, অস্ত আছে। কিন্তু নিত্যজ্ঞানের উদয়-অস্ত কিছুই নেই। ঠিক সেইরকম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনুভূতি যেখানে একযোগে হচ্ছে সেখানে অতীতও নেই, ভবিষ্যৎও নেই, সবই নিত্যবর্তমান।

ঠাকুর বলছেন, 'পাপপুণ্য আছে, কিন্তু তিনি নিজে নির্লিপ্ত। বায়ুতে সুগন্ধ-দুর্গন্ধ সবরকমই থাকে, কিন্তু বায়ু নিজে নির্লিপ্ত। তাঁর

সৃষ্টিই এইরকম; ভালমন্দ, সৎঅসৎ। যেমন গাছের মধ্যে কোনওটা আমগাছ, কোনওটা কাঁঠালগাছ, কোনওটা আমড়া গাছ।' এই বৈচিত্র্য নিয়েই সৃষ্টি। যদি সব একইরকম হোত তাহলে সৃষ্টি হোত না, তাঁর লীলা চলত না। বিভিন্ন রকমের রঙ দিয়ে একটা চিত্র আঁকতে হয়, যে রঙটা বেশী ভাল লাগছে সেটি যদি সব জায়গায় বুলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আর চিত্র হয় না। ভগবানের সৃষ্টি মানেই বৈচিত্র্য। তবে এই বৈচিত্র্যের যিনি স্রষ্টা তিনি এর থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

ত্যাগই আদর্শ

আবার গৃহস্থাশ্রমের কথা উঠল। ভক্তদের বলছেন, 'কি জান, সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে পড়ে। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুণ মনের যা ক্ষতি হয়,—সে ক্ষতি আবার পূরণ হয়, যদি কেউ সন্ন্যাস করে। বাপ প্রথম জন্ম দেন; তারপরে দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়। আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়।' এই সন্ন্যাস কথাটির মানে সর্বত্যাগ। সর্বত্যাগ মানে এ নয় যে, সকলকে সন্ন্যাসী হতে হবে। কিন্তু ত্যাগ সকলকেই করতে হবে, ঠাকুর এবিষয়ে কখনও আপোস করেন নি। তবে পাত্র হিসাবে ত্যাগের পার্থক্য আছে। কেউ অন্তরে বাইরে ত্যাগ করবে, আর যারা তা পারবে না তারা অন্তরে ত্যাগ করবে। বাইরে ত্যাগ তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে ঠাকুর বলেন নি। সুতরাং ত্যাগের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। সম্-ন্যাস্ সম্পূর্ণ ত্যাগ—এটি যখন হবে তখন তাকে বলি সন্ন্যাস। যেভাবেই হোক এই সর্বত্যাগের আদর্শ না নিতে পারলে কেউ ভগবানের পথে পৌঁছতে পারবে না।

সংসারে থেকেও ভগবানের জন্য সর্বত্যাগী হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ। যাঁরা বাহ্যত ত্যাগ করেছেন তাঁদের ভিতরেও অন্তরে বাইরে

পরিপূর্ণ ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত এরকম কজন আছেন? বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হলে, শুদ্ধি না এলে মানুষ কখনও সম্পূর্ণভাবে সব ত্যাগ করতে পারে না। গৃহস্থও না, সন্ন্যাসীও না। কি গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী সকলেই চেষ্টা করছে মাত্র সে অবস্থায় পৌছতে। পার্থক্য এই, সংসারী সংসারের ভিতরে থেকে আর সন্ন্যাসী বাইরে গিয়ে চেষ্টা করছে কিন্তু সাধক তাঁরা উভয়েই। সিদ্ধ উভয়ের মধ্যেই কম। যেখানে সিদ্ধের অবস্থা সেখানে কি সংসারী, কি সন্ন্যাসী তাঁরা উভয়েই সেই এক তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত. সেখানে কোন পার্থক্য নেই। স্বামীজী কর্মযোগে বলেছেন, আদর্শ সংসারী এবং আদর্শ যোগী উভয়ে এক। তবে সাধনের সময় দুই-এর পথ হয়ত একটু ভিন্ন, এইমাত্র।

গুরুবাক্যে বিশ্বাস

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দশহরা দিবসে ভক্ত পরিবৃত শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস যদি হয় তাহলে আর বেশী খাটতে হবে না। ব্যাসদেবের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, গোপীদের কাছ থেকে তিনি সব খেলেন কিন্তু বলছেন, আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি তাহলে যমুনার জল দুভাগ হয়ে যাবে, আমরা পার হয়ে যাব। আর যমুনার জল দু ভাগ হয়েও গেল অর্থাৎ বিশ্বাসে অসম্ভব যা তা-ও সম্ভব হয়। 'এই দৃঢ় বিশ্বাস। আমি না, হৃদয়মধ্যে নারায়ণ; তিনি খেয়েছেন' অর্থাৎ আমি কর্তা নই, কর্তা ভোক্তা সব সেই ভগবান স্বয়ং। জীব অল্পবুদ্ধির জন্য নিজেদের কর্তা ভোক্তা বলে মনে করে। জ্ঞানী দেখেন, ঈশ্বরই নিজে কর্ম করেন, আবার নিজেই তার ফল ভোগ করছেন। উপনিষদ বলছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ শ্রোতা নেই, আর কেউ মন্তা নেই ইত্যাদি। যা কিছু কর্ম ঘটছে, যা কিছু ভোগাদি হচ্ছে সমস্ত তাঁরই হচ্ছে আর কারো নয়। তাঁরই চৈতন্যে জগৎ চৈতন্যময়। সেই চৈতন্য

অন্যত্র প্রতিফলিত হয়ে সেই বস্তুকে চেতন করছে। বেদান্তে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, একটি লোহা আগুনে গরম হয়েছে, গায়ে লাগলে মনে হয় লোহাটা পোড়াচ্ছে। আসলে লোহা তো পোড়ায় না, পোড়ায় লোহার ভিতরে যে আগুন আছে, যা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। খালি লোহাটাকে দেখছি আর মনে করছি, সেই লোহাটাই পোড়াচ্ছে। সেই রকম কর্তৃত্বাদি যা কিছু হচ্ছে, জীবের দেহ মন দিয়ে যা কিছু ঘটছে, আমরা মনে করছি সেগুলি আমরা করছি কিন্তু আমাদের ভিতরে চৈতন্য শক্তি রয়েছে তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে সেগুলি ঘটছে। আমরা নিজেদের আর সেই চেতন্য শক্তি থেকে পৃথক করতে পারছি না। অথবা এই দেহাদি থেকে আমি নিজেকে পৃথক করে সেই চৈতন্য স্বরূপ বলে নিজেকে ভাবতে পারছি না। সুতরাং আমাদের 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা' এই ভ্রম হচ্ছে। (মনে রাখতে হবে, শাস্ত্রের বাক্য শুধু পড়লে. মুখস্থ করলে, হবে না, তাতে বিশ্বাস থাকা চাই। অনেক সময় মুখে বলি বা মনে করি, আমাদের ভগবানে বিশ্বাস আছে কিন্তু সত্যি সত্যি বিশ্বাস নেই, থাকলে আমাদের ব্যবহার সেই বিশ্বাসের অনুরূপ হোত। আমরা দুঃখে হাহাকার করি কেন বা সুখে নিজেকে হারিয়ে ফেলি কেন? তার কারণ আমি নিজেকে কর্তা, ভোক্তা বলে মনে করছি, তাই সুখ-দুঃখাদির দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়ি। এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আমরা মুখে বলি বটে 'বিশ্বাস করি' কিন্তু সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ' (৫।৮)—তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এই-রকমই জানবেন যে তিনি কিছুই করেন না। তিনি কর্মও করেন না, কর্মফল ভোগও করেন না। তিনি শুদ্ধ আত্মা, এই কথাগুলি কেবল আবৃত্তি করলেই হবে না, এতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে) এটি ধারণা করতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঠাকুর চণ্ডাল-শঙ্করাচার্য এবং জড় ভরতের

প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন। সেখানে আছে, যিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তিনি নিজেকে কখনও দেহ প্রভৃতি বলে মনে করেন না। শাস্ত্রে বলে, এই যে দেহ, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আমরা 'আমি' বলে মনে করি, এগুলি যদি সেই চৈতন্যের দ্বারা পরিচালিত না হয় তাহলে কাজ করে না। চৈতন্যের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়ে এইসব জড়বস্তু ক্রিয়াশীল। সুতরাং যখন আমরা নিজেদের এই জড়বস্তুর সঙ্গে এক বলে মনে করি তখন আমরা সেই চৈতন্যকে হারিয়ে ফেলি।

জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা

তারপর বলছেন, "'আমিই সেই', 'আমি শুদ্ধ আত্মা', এটি জ্ঞানীদের মত। ভক্তেরা বলে, এসব ভগবানের ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য না থাকলে ধনীকে কে জানতে পারতো?" 'ভগ' শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য। ষড়ৈশ্বর্যবিশিষ্ট যিনি তাঁকে বলে ভগবান। শাস্ত্রে আছে—

'ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্॥'

—(বিষ্ণুপুরাণ ৪.৫.৩৪)

—ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ছয়টির সমষ্টিকে বলে ভগ। এই ভগ যাঁর আছে, তিনি হলেন ভগবান।

শঙ্করের নামে প্রচলিত শ্লোকে আছে—

'সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ নৈব কদাচিৎ সমুদ্রস্তারঙ্গঃ।'

বলছেন, হে প্রভু, এই ভেদ দূর হয়ে গেলেও আমি তোমার, তুমি আমার নও। এখানে আমার বলতে আমি ক্ষুদ্র আর তুমি বিশাল। তোমার ভিতরে আমি আছি, আমার ভিতর তুমি আছ বলা চলে না। কারণ যে বিশাল সে ক্ষুদ্রের দ্বারা সীমিত হচ্ছে না। সমুদ্রের তরঙ্গ হয়

কিন্তু তরঙ্গের সমুদ্র হয় না। আমরা যখন বলি, 'আমিই সেই', তখন মনে রাখতে হবে এই ক্ষুদ্র যে জীবটি সেটি ঐ বিশাল সমুদ্রের মতো, আকাশের মতো পরমেশ্বর স্বরূপ নয়, ব্রহ্ম স্বরূপ নয়। আমি আর সেই পরমেশ্বর তাদের ভিতরে যদি কোন বিরুদ্ধ ধর্ম থাকে তাহলে একটি আর একটির সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না। এজন্য এই দুটি শব্দের তাৎপর্য বুঝে তারপর তাদের অভেদ স্বীকার করতে হবে। আগেই অভেদ স্বীকার করলে চলবে না। কেন চলবে না? না, দৃষ্ট যে ভেদ তার দ্বারা অদৃষ্ট যে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত—অভিন্নতা—তাকে মেনে নেওয়া যায় না। দৃষ্টি বিরোধ হয়। কেউ যদি বলে, এই দেওয়ালটা এখানে নেই অথচ আমরা দেওয়ালটাকে প্রত্যক্ষ করছি। তখন সেই দেওয়ালটা যে নেই এটা যুক্তির সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়া তর্কের বিরুদ্ধ কথা। কারণ দেওয়ালটা প্রত্যক্ষ করছি। এইজন্য বলে প্রত্যক্ষ হচ্ছে বলবান, অনুমান তার চেয়ে দুর্বল। প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুমান ব্যাহত হতে পারে; অনুমানের দ্বারা প্রত্যক্ষ ব্যাহত হতে পারে না। এই হল সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বিচার করে দেখতে হবে।

শ্রুতিতে হয়তো একজায়গায় বললেন, জলে পাথর ভাসছে। এখন পাথর জলে ভাসে কিনা এটা আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা বুঝতে পারি সুতরাং যদি প্রত্যক্ষ দেখি যে, পাথর জলে ভাসে তাহলে বলব একথা ঠিক। তা না হলে শ্রুতিবাক্য মিথ্যা। অবশ্য একথা আমরা বলতে পারি না। তাহলে মনে করতে হবে এই কথার ভিতর হয়তো অন্য তাৎপর্য আছে। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, ছেলে মিষ্টি খেতে যাচ্ছে, মা বলছেন, খা, বিষ খা। এখানে মানুষের মন বিচার করবে যে, সন্তানের প্রতি স্নেহপরায়ণ হয়ে মা কি করে সন্তানকে বিষ খেতে বলবেন? কথাটির তাহলে অন্য কোন অর্থ আছে। ছেলেও বোঝে যে, মা যে কথাটি বললেন তার অর্থ এই নয় যে, ঐগুলি বিষ এবং

সেই বিষ মা আমাকে খেতে বলছে। দুটোর কোনটাই নয়। তাহলে অর্থ কি? না, জিনিসগুলো তোমার পক্ষে বিষের মতো অপকারী সুতরাং তুমি ওটা খেও না। আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে এইরূপ অর্থই করি।

শাস্ত্র যখন বলছেন, তুমিই ব্রহ্ম। আর প্রত্যক্ষ আমি দেখছি আমি অল্প-জ্ঞান, আমি সীমিত, আমি এতটুকু সাড়ে তিনহাত মানুষ, আমি কি করে সেই সর্বব্যাপী, পরম ব্রহ্ম হতে পারি? কাজেই এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রত্যক্ষের সঙ্গে বিরোধ হচ্ছে। সাক্ষাৎভাবে অর্থ হয় না বলেই, আমাদের অর্থ বুঝতে হয় ঘুরিয়ে। কি বুঝতে হবে? না দেখতে হবে আমাকে যখন বললেন, 'তুমি ব্রহ্ম', 'সেই আমি'-র মানে কি? আর 'ব্রহ্ম' মানেই বা কি? 'তৎ ত্বম্ অসি'—তুমিই সেই ব্রহ্ম অর্থাৎ তোমার সঙ্গে ব্রহ্মের অভেদ—এই প্রত্যেকটি কথা বোঝার জন্য প্রয়োজন বিচার করে দেখা। এই বিচারকে বলা হয়েছে 'তৎ-ত্বম্'-পদার্থ বিচার। তাই এই বিচার করতে করতে 'তৎ-ত্বম্' পদার্থের শোধন। 'তৎ' পদার্থের শোধন করে তার বিরোধী অংশকে আলাদা করতে হবে। 'ত্বম্' পদার্থের শোধন করে তার বিরোধী অংশকে আলাদা করতে হবে। তবে দুই-এর অবিরুদ্ধ ভাবকে অভেদ বলে বুঝতে হবে। এই দুটি পদার্থের অভেদ হতে পারে এটা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কিরকম? যেমন বলছে, এটা সাপ নয়, দড়ি। এটি দড়ি—মানে যে বস্তুটির প্রত্যক্ষ হচ্ছে সেটি হচ্ছে দড়ির মতো আকার বিশিষ্ট একটি বস্তু, যেটিকে আমি সাপ বলে অনুভব করছি। 'এটি' শব্দের অর্থ হল প্রত্যক্ষ যে বস্তুটি। আর সেটিকে যখন দড়ি বলছি, দড়ি হল আমার অনুভূত বস্তু, যার দ্বারা বন্ধনাদি কার্য হয় সেই বস্তুটি। এই দুটি বস্তুকে যখন অভিন্ন বলছি তখন দড়িটি এক জিনিস আর সাপটি আর এক জিনিস। তারা অভিন্ন কি করে হবে? তাদের বিরুদ্ধ অংশকে বাদ দিতে হবে।

বিরুদ্ধ অংশ কি? না, বিরুদ্ধ অংশ হল সাপের বিষধরত্ব। সাপ কামড়ালে মানুষ মরে। আর সামনে যেটি সেটি কামড়ায় না, কামড়ালেও মানুষ মরে না। সুতরাং ওটির যে বিরুদ্ধ অংশ সেটি বাদ দিলে দড়ি অবশিষ্ট থাকে। দড়ি লম্বা এবং একটু আঁকাবাঁকা, দড়িব এই ধর্ম দুটি আর সাপের ধর্ম একরকম—এই অংশেতে মিল হল।

এখন 'আমি ব্রহ্ম' এই দুটি শব্দ বিচার করে করে আমরা দেখব যে, দুটি অবিরুদ্ধ অংশের ঐক্য কোথায়। অবিরুদ্ধ অংশ হল শুদ্ধ চৈতন্য। 'আমাকে' বিচার করতে করতে শুদ্ধ চৈতন্যে পৌছই। আব জগতের স্রষ্টা, প্রলয়কর্তা যে 'ব্রহ্ম' তাঁকে বিচার করতে করতে বিরুদ্ধ অংশ বাদ দিয়ে দেখা যায় সেখানেও দাঁড়াচ্ছে শুদ্ধ চৈতন্য। কারণ জগৎ কর্তৃত্বাদি গুণ ব্রহ্মকে একটা বিশিষ্ট রূপ দিচ্ছে। সে বিশিষ্ট রূপে তিনি কখনও আমার সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন না। আমি ক্ষুদ্র শক্তি, তিনি সর্বশক্তিমান আমাদের অভেদ কখনও হতে পারে না। কাজেই বিচার করে করে বিরুদ্ধ অংশকে বাদ দেওয়া এর নাম 'তৎ-ত্বম' পদার্থ শোধন। বিচার করে করে শব্দ দুটির শোধন করা, বিরুদ্ধ অংশগুলিকে তার থেকে পৃথক করা—তা করার পর যা অবশিষ্ট থাকে সেটি হচ্ছে শুদ্ধ চৈতন্য। এই আমার ভিতরেও যে শুদ্ধ চৈতন্য থাকে, ব্রহ্মের ভিতরও সেই শুদ্ধ চৈতন্যই থাকে। আর বাকি অংশগুলি সবই বিরোধী। এই বিরোধী অংশগুলিকে পরিত্যাগ করে শুদ্ধ চৈতন্য অংশে তাদের অভেদ। 'আমি ব্রহ্ম' এই শব্দের দ্বারা এটিই বোঝাচ্ছে। তা না করে যদি কেউ বলে 'আমি ব্রহ্ম' তাহলে সে নিজেকে প্রবঞ্চনা করছে বা জগৎকে প্রবঞ্চনা করছে। সে ব্রহ্ম কিছুতেই নয়।

যখন আমরা বলি, 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর। গুরুরেব পরম ব্রহ্ম', তখন সেই গুরু কে? গুরু মানে অমুক দেবশর্মা যিনি আমাকে দীক্ষা দিয়েছেন। তিনি কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পরম ব্রহ্ম?

তিনি কি নিত্য? তিনি কি পঞ্চাশ একশ বছর পরে থাকবেন? তিনি কি তাঁর জন্মের আগে ছিলেন? এই বিচারগুলি মনে আসবে। তাহলে দেখা যাবে, গুরু বলতে অমুক শর্মাজীকে বোঝাচ্ছে না। তাঁর ভিতর যে ভগবৎ সত্তা আছে তাঁকে বোঝাচ্ছে। এর নাম হল বস্তুর শোধন। জিনিসটাকে আপাতদৃষ্টিতে আমরা যে অর্থে গ্রহণ করি, সে অর্থে না করে, শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রহণ করতে হলে বিরুদ্ধ অংশগুলিকে বাদ দিয়ে বাকি অংশকে নিতে হয়। রোগ, শোক, জরা-মৃত্যুগ্রস্ত যে মানব, যার উৎপত্তি আছে, লয় আছে—সেই মানবের সঙ্গে পরমব্রহ্মের অভিন্নতা হয় না সুতরাং গুরুকে যখন পরমেশ্বর বলা হচ্ছে তখন তাঁর মানব ধর্মগুলিকে পৃথক করে তাঁর ভিতরে যে চৈতন্য সত্তা সেই সত্তাকে লক্ষ্য করেই সেখানে বলা হচ্ছে তিনিই গুরু। তাই ঠাকুর বলছেন, সচ্চিদানন্দই গুরু। এই জিনিসটি অনেকসময় আমাদের বুঝতে ভুল হয়। আমরা মনে করি গুরু মানুষটিই বুঝি সব, তাঁকেই বুঝি পরমেশ্বর, পরমব্রহ্ম বলা হল। এতবড় মিথ্যা কথা শাস্ত্র কেন বলবেন? সুতরাং বুঝতে হবে তার অর্থ হল এই। তবে কেন গুরুকে ঐরকম দৃষ্টি করতে বলছেন? তার কারণ হচ্ছে (মানুষের মনকে একটা কোন অবলম্বনের সাহায্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কোন মানবকে আশ্রয় করে তাকে এগোতে হয়। সেই মানব হলেন পরমেশ্বরের প্রতীক, symbol, যাঁর ভিতর দিয়ে সে সেই পরমেশ্বরকে ধারণা করতে চেষ্টা করছে। ধারণা করবার সময় তার গুরু ও পরমেশ্বর থেকে বিরুদ্ধ অংশগুলিকে মনের থেকে সরিয়ে দিতে হবে, দিয়ে অবিরুদ্ধ যে অংশটি আছে মাত্র সেটিকে গ্রহণ করতে হবে এবং তাকেই গুরু বলা হয়েছে। সেইজন্য বলেছেন, গুরুতে মনুষ্যদৃষ্টি করতে নেই। কেন করতে নেই?) যে বস্তু যা তাকে তাই বলতে নেই, একথা বলা তো বাতুলতা মাত্র। তার উত্তর হচ্ছে, আমরা এই

মানবরূপ প্রতীককে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে সেই পরম সত্যতে পৌছতে পারি। এইজন্য পরম সত্যে পৌছবার আশ্রয় রূপ বা প্রতীক রূপে এই মানবকে অবলম্বন করতে হচ্ছে। শাস্ত্র এটা বোঝাবার জন্য বলছেন, 'গুরু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পরমব্রহ্ম। আমরা ওসব তলিয়ে না দেখে ভাবি মানুষই সব, মানুষই তিনি। না, মানুষ তিনি নন। কিন্তু তাহলেও মানুষের উপরে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে তিনি যে বস্তুর প্রতীক, ধীরে ধীরে সেই বস্তুতে মনকে নিযুক্ত করতে হয়। এজন্য এইসব সিদ্ধান্ত এভাবে বলা হয়।

ঠিক এই কথাটি ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদের মধ্যে আছে। প্রজাপতির উপদেশ দুজন দুই অর্থে গ্রহণ করলেন। ইন্দ্র আত্মজ্ঞান লাভ করলেন কিন্তু বিরোচন করলেন না। এই তুমিই ব্রহ্ম বা আমিই ব্রহ্ম বলার বিপদ হচ্ছে এইখানে যে, আমরা ভুল বুঝে অনেকসময় আমাদেরই ভিতর সেই সত্তা আছে বলে নিশ্চিন্ত হই। নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের ভিতরে সেই সত্তাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে তবেই আমরা সেকথা বলতে পারব। চব্বিশ ঘণ্টা মনে হচ্ছে এই শরীবটাই আমি, আর মুখে বলব আমিই সেই ব্রহ্ম—একথার কোন সার্থকতা নেই, তাই ঠাকুর এই কথাটি বিশেষ করে বললেন। সুতরাং এইভাবে বুঝতে হবে যে, আমি তোমার, তুমি আমার নও। যেমন দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, 'সমুদ্রো হি তরঙ্গঃ নৈব কদাচিৎ সমুদ্রস্তারঙ্গঃ' তরঙ্গটা সমুদ্রের অঙ্গ। সমুদ্র একটা বিশাল জিনিস, তারই ক্ষুদ্র অংশকে বলি তরঙ্গ কিন্তু তরঙ্গের সমুদ্র হয় না। সেই দৃষ্টিতে বলছেন, আমি তোমার, তুমি আমার নও। সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।

ভক্তি এবং জ্ঞানের ভিতরে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য শঙ্করাচার্যের উক্ত স্তোত্রের ভিতর রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ঐ স্তোত্র প্রক্ষিপ্ত, কট্টরজ্ঞানী শঙ্করাচার্য এমন ভক্তির কথা বলেছেন! তা মানুষের স্বভাব

এই যে, যে স্তরে সে থাকে সেই স্তরের সমর্থন সে সব জায়গায় দেখতে চায় কাজেই শঙ্করের কাছেও সেইরকম সমর্থন দেখতে চায় বলে হয়তো কেউ এইরকম স্তোত্র রচনা করে শঙ্করের নাম দিয়েছেন। আর যদি সত্য সত্যই শঙ্করের হয় তাহলে তো কথাই নেই। রচনা যাঁরই হোক, তার তাৎপর্য আমরা বেশ বুঝতে পারি যে, তিনি অসীম আর আমি সীমিত, অসীমের ভিতরে সীমিত থাকতে পারে সীমিতের ভিতর অসীম কখনো ধরে না।

নিস্তরঙ্গ মন ও শুদ্ধ আত্মা

'মন স্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও।'

তারপর ঠাকুর বললেন জ্ঞান, ভক্তি অথবা কর্ম যে পথেই যাও, লক্ষ্য হচ্ছে মনকে স্থির করা, তারপর সেই স্থির মনে তত্ত্ব যা তা আপনিই ফুটে উঠবে। স্থির মন হলেই সে সঙ্কল্প বিকল্প রহিত হবে এবং সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত হলেই তার সমস্ত অশুদ্ধি দূর হয়ে যাবে। শুদ্ধ জলের ভিতর দিয়ে যেমন বস্তু দেখা যায় অথবা শুদ্ধ জলে যেমন প্রতিফলন শুদ্ধ হয়, সেইরকম মন যখন স্থির, শুদ্ধ হয় তখন তার যোগ হয় অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের সেখানে প্রতিফলন হয়, সত্যের স্বরূপ তখন সে অনুভব করতে পারে। সে কথাই বললেন, এখানে 'মন যোগীর বশ। যোগী মনের বশ নয়।' সাধারণ মানুষ আমরা মনের বশীভূত হয়ে চঞ্চল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি মন আমাদের ক্রমাগত ঘোরাচ্ছে, সেই মনকে শান্ত করে সংযত করে তার ভিতরে সমস্ত তরঙ্গকে স্তব্ধ করে দিয়ে যদি কেউ মনকে স্থির করতে পারে, সেই স্থির মনকে আমরা বলব শুদ্ধ মন বা শুদ্ধ বুদ্ধি। তখন তার সঙ্গে শুদ্ধ আত্মা অভিন্ন হয়ে যাবে। শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক। কিন্তু সাধারণ মনের অবস্থা সেরকম নয় কাজেই সেখানে শুদ্ধ আত্মা কখনো প্রতিফলিত হচ্ছে না।

তারপর যোগের কথা বললেন, 'মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয়—কুম্ভক হয়।' বায়ু স্থির হওয়া বা শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া—এ বিষয়টি আমরা আর একটু বিচার করে বুঝতে চেষ্টা করি। আধুনিক দেহবিজ্ঞানে বলছে যে, আমাদের শরীরে কতকগুলি যন্ত্র আছে যেগুলিকে আমরা ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করি না, যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস। এটি আপনি হয়ে যাচ্ছে এ বিষয়ে আমাদের কোন চেষ্টার দরকার হয় না। কিন্তু যখন আমাদের মন স্থির হয় তখন এই শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। তার দ্বারা বোঝাচ্ছে কি? না, একটুখানি মনের সাহায্য ছাড়া শ্বাস-প্রশ্বাসও চলে না। যদিও বলে এগুলি involuntary বা অনৈচ্ছিক অর্থাৎ এগুলিতে আমাদের বুদ্ধি বা মন আর ক্রিয়া করছে না, কিন্তু আমাদের অজ্ঞাতসারে একটুখানি তার ভিতরে লেশ থেকে যায় যার দ্বারা এই শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য চলছে। যখন সেটি স্তব্ধ হয়ে যায় তখন শ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ হয়ে যায়। এই শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়াকে কুম্ভক বলে। কুম্ভক দুরকমে হওয়ার কথা বলেছেন। কোনো লৌকিক কারণে মন যদি স্থির হয়ে যায় তো কুম্ভক হয়। আর এক হচ্ছে মনকে স্থির করবার জন্য কুম্ভক অভ্যাস করা। দুটো বিপরীত দিক, প্রক্রিয়া দুটোও বিপরীত। একটি হচ্ছে মনকে অবলম্বন করে বায়ু স্থির (করছে, আর একটি বায়ুকে স্থির) করে মনকে স্থির করছে। দুটো ভিন্ন পথ কিন্তু লক্ষ্য এক। তবে ঠাকুর বলেছেন, কেবল যে কুম্ভক তার ফলে হয়তো সেইসময়ের জন্য মন নিস্তরঙ্গ হল কিন্তু তারপর সেই কুম্ভকের অবস্থা থেকে নেমে এলে তখন আবার মন যেমন ছিল তেমনি হল। যেমন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, বাজী দেখাতে দেখাতে বাজীকরের জিভটা তালুর মধ্যে চলে গিয়ে কুম্ভক হয়ে গেল। সে তখন অজ্ঞান হয়ে রইল বাইরে থেকে তার আর দেহে প্রাণের চিহ্ন দেখা গেল না। এরকম করে বহুকাল কেটে গিয়েছে তাকে সবাই মৃত বলেই ধরে নিয়েছে। অনেকদিন পর

সে জায়গায় জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল। তারপর একসময়ে জঙ্গল সাফ করতে করতে দেখা যায় যে একটি দেহ মৃতদেহের মতো। নাড়াচাড়া করতে করতে তার জিভটা খুলে গিয়েছে, তখন উঠেই বলছে, রাজা, দে টাকা, দে কাপড়া। রাজার কাছে সেই বাজীকর বাজী দেখাচ্ছিল, তার মনে ছিল রাজা ওসব দেবে। কাজেই কুম্ভক থেকে মুক্ত হয়েই সে বলছে, রাজা দে টাকা, দে কাপড়া। অর্থাৎ তার মনের কোনো উন্নতি এর দ্বারা হল না। (কাজেই মন স্থির করাটাই লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে স্থির মনে তাঁর চিন্তা করা। যখন কুম্ভক হয়ে মন স্থির হয় তখন সেই মন ভগবৎ চিন্তাও করতে পারে না, করবার শক্তি থাকে না। এইজন্য মনকে স্তব্ধ করে দেওয়াই লক্ষ্য নয়, যদিও যোগীরা বলেন, চিত্ত বৃত্তির নিরোধই যোগ। কিন্তু সেই নিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তির পরিণামটা কি হবে? যোগশাস্ত্র বলবে, এই চিত্তবৃত্তি যখন স্থির হয়ে যায় তখন আর তার করণীয় কিছু নেই, সমস্ত কর্মের বন্ধন থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়। জ্ঞানীরা বলেন, চিত্ত স্থির হলেই হবে না, সেই স্থির চিত্তকে ব্রহ্মানুভূতির জন্য নিযুক্ত করতে হবে।) এ সম্পর্কে নানা মত আছে তবে সেজন্য আমাদের ভাববার কিছু নেই। কারণ মনকে স্থির করা আর ব্রহ্ম-জ্ঞানে নিযুক্ত করা দুটোই আমাদের পক্ষে অনেক দূরের কথা। কিন্তু চেষ্টা করে যেতে হবে। এইজন্য বলছেন যে, মনকে স্থির করতে হবে।

তারপর বলছেন, "এই কুম্ভক ভক্তিযোগেতেও হয়, ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়ে যায়। 'নিতাই আমার মাতা হাতী' এই কথা বলতে বলতে যখন ভাব হয়ে যায়, সব কথাগুলো বলতে পারে না, কেবল 'হাতী, হাতী!" তারপর আরও একটু যখন ভাব বাড়ে তখন 'হা' বলেই সমাধিস্থ। ভাবের আতিশয্যে বায়ু স্থির হয়ে যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিলেন, 'যদি কেউ অবাক হয়ে একটা জিনিস দেখে বা একটা কথা শোনে তখন অন্য মেয়েরা বলে, তোর ভাব লেগেছে নাকি লো!'

তারপর বলছেন, জীব চারপ্রকার বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত ও নিত্য জীব। কেউ অনেক সাধন করে ঈশ্বরকে পায় আবার কেউ জন্ম অবধি সিদ্ধ যেমন প্রহ্লাদ। ভগবদ্ভক্তি নিয়েই তার জন্ম। সাধনের আগেই ঈশ্বরলাভ। 'যেমন লাউকুমড়ার আগে ফল তারপর ফুল। নীচবংশেও যদি নিত্যসিদ্ধ জন্মায়, সে নিত্যসিদ্ধই হয়, আর কিছু হয় না। ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়লে ছোলাগাছই হয়।' সিদ্ধির পথে জন্ম জন্মান্তর ধরে এগিয়ে চলা এবং এগিয়ে চলতে চলতে যখন সিদ্ধির চরম অবস্থায় এসে পৌছয় তারপরেও যদি জন্ম হয় সিদ্ধি নিয়েই জন্মায়। তখন, সেই সিদ্ধি পূর্ণ সিদ্ধি কি না? ঠাকুর বলছেন, পূর্ণ সিদ্ধি। এইজন্য তাঁদের নিত্যসিদ্ধ বলা হয়।

তাহলে কি ভগবান পক্ষপাতী? কাউকে বেশী শক্তি দিয়েছেন, কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন? ঠাকুর বলছেন, 'তা দিয়েছেন বইকি।' তা নাহলে পার্থক্য দেখি কেন? সকলে এক বললেই তো হবে না, পার্থক্য আছে। তবে যদি প্রশ্ন হয় যে, সকলের ভিতরে সেই ব্রহ্মত্বে পৌছবার সম্ভাবনা আছে কিনা, তার উত্তরে ঠাকুর অনেকবার বলেছেন, তা আছে। সকলেরই হবে এই কথা বলেছেন। বলছেন, কাশীতে কেউ অভুক্ত থাকে না, সকলেই খেতে পায়, তবে কেউ সকালে পায়, কেউ দুপুরে, কেউ বিকেলে পায়, আবার কারো সন্ধ্যা হয়ে যায়। ভাব হচ্ছে এই যে, সকলেরই সমান শক্তি তা নয়, সকলের সমান সম্ভাবনা আছে, সেই সম্ভাবনাটাকে ক্রমশ বাস্তবে পরিণত করতে তাকে খাটতে হয়। সেই খাটবার যে শক্তি সেটাও ভিন্ন ভিন্ন—এক একজায়গায় এক একরকম। সেই শক্তির বেশী বিকাশ হয়েছে এমন অবস্থায় কেউ জন্ম নিয়েছে, কেউ কম বিকাশ হয়েছে এই অবস্থায় জন্ম নিয়েছে। কাজেই পার্থক্য থাকে। তা পার্থক্য থাকলে ভগবানের বৈষম্য দোষ হচ্ছে না? না, এইজন্য হচ্ছে না যে, যাদের তিনি বিভিন্ন শক্তি দিয়েছেন বলছি আমরা, তারা তো তিনিই। যেহেতু তারা তিনি নিজে, কাজেই পক্ষপাতিত্বের কথা আসে না।

চার

২. ৯. ১-২

॥ সত্যনিষ্ঠা ॥

বিদ্যাসাগরের কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারমশায়কে বলছেন, 'সত্যেতে থাক্‌লে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়।' সত্যের প্রতি দৃঢ়তা না থাকলে মানুষ কখনও ভগবানের দিকে যেতে পারে না। কথাটি খুব ভাল করে মনে রাখতে হবে। তুলসীদাস বলেছেন, 'সৎবচন, অধীন্‌তা, পরস্ত্রী মাতৃসমান। ইসি ন হরি মিলেত তুলসী ঝুট্‌জবান্‌।' সত্য কথন অধীনতা মানে বিনীত হয়ে ভগবানের সেবক হয়ে থাকা, আর পরস্ত্রী মাতৃসমান—এই তিনটিতে যদি হরি না মেলে তবে তুলসীর বচন মিথ্যা। অর্থাৎ এ তিনটি উপায়ে অবশ্যই ভগবানের দর্শন লাভ হবে।

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের শাস্ত্রে এই সত্যকথার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বেদ বলছেন, 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং'—সত্যই জয়লাভ করে, মিথ্যার জয় হয় না। 'সত্যেন পন্থা বিততো দেবযান'—সত্যের দ্বারা দেবযান মার্গ বিস্তৃত। দেবযান মানে যা দিয়ে ব্রহ্মলোকাদিতে গতি হয়। সেই পথ সত্যের দ্বারা বিস্তৃত। কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সত্যকে পালন করা নয়, সত্যেরই জন্য সত্যকে পালন করতে হবে কারণ ভগবান সত্যস্বরূপ। সত্যপালন করলে মনের শক্তি এত বাড়ে যে সত্যবাদীর মুখ দিয়ে যা উচ্চারিত হয় তাই সত্য হয়। ঠাকুরের এই সত্যনিষ্ঠা এত প্রবল ছিল যে ভুলেও কখনও মিথ্যা আচরণ করতে পারতেন না। সত্যনিষ্ঠার ফলে সর্ববিষয়ে একটা অনমনীয় দৃঢ়তা আসে। ঠাকুর অন্যত্র বলেছেন, যে সত্যকে ধরে থাকে, সে সত্যের ভগবানকে পায়। ভগবান হলেন সত্যস্বরূপ।

বিদ্যাসাগর ঠাকুরের কাছে আসবেন বলেছিলেন কিন্তু আসেননি। ভদ্রতার খাতিরেই হয়তো কথাটা বলেছিলেন, মনের কথা ছিল না। কিন্তু ঠাকুর এই মন মুখ এক না করাটাকে অত্যন্ত নিন্দা করতেন। বলতেন, মন মুখ এক করবে। কিন্তু আমাদের মুসকিল হচ্ছে, মন এত মলিন যে সে যা ভাবে তাই যদি প্রকাশ করে তাহলে সমাজে একেবারে অপাংক্তেয় হয়ে যাবে। তার মানে কি? লোকসমাজে নিজেকে ভাল দেখবার জন্য আমি যা নই লোকের কাছে সেইভাবে প্রতিপন্ন করতে মিথ্যা বলি, নয়তো কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য বলেছিলেন, যুধিষ্ঠির সত্যবাদী, সে যদি বলে অশ্বত্থামা মারা গিয়েছে তবেই বিশ্বাস করব। যুধিষ্ঠিরকে একথা বলার জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি বললেন, মিথ্যা কি করে বলব? সমস্যাটা এইখানে। একদিকে একটি মিথ্যা কথা আর একদিকে সবংশে বিনাশ। পুরাণে বলছে, অত বড় সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির, তিনিও সংশয়গ্রস্ত হয়েছিলেন। তিনি একটু বাঁচিয়ে বলবার জন্য উচ্চস্বরে বললেন, 'অশ্বত্থামা হত' আর মৃদুস্বরে বললেন, 'ইতি গজ'। অর্থাৎ অশ্বত্থামা নামে একটি হাতি মারা গিয়েছে। এখন শেষের দিকে জোরে বাজনা বাজিয়ে দেওয়ায় দ্রোণ 'অশ্বত্থামা হত' এইটুকু শুনে পুত্রশোকে কাতর হয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য সফল হল।

আমরা মনে করব যুধিষ্ঠিরের মতো এরকম সত্যনিষ্ঠ লোকও আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হলেন! এইরকম সমস্যা যদি আমাদের সামনে উপস্থিত হয় সেক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠা বজায় রেখে সর্বনাশকে স্বীকার করে নিতে আমরা কজন পারি? এইটি দেখে বুঝতে হবে সত্যকে পালন করতে হলে তার কত দাম দিতে হয়। অবশ্য পুরাণে বলে নিষ্পাপ যুধিষ্ঠিরকে এইটুকু ত্রুটির জন্য নরক দর্শন করতে হয়েছে। কিন্তু নরকদর্শনটাই বড় কথা নয়। যুধিষ্ঠিরের দয়া, সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞান, ভক্তি; এগুলো দেখতে

হবে। নরক দর্শন করিয়ে যুধিষ্ঠিরকে খর্ব করা হয়নি, দেখান হয়েছে সত্যের মূল্য কত।

পণ্ডিত ও সাধু

এরপর ঠাকুর পণ্ডিত আর সাধুর পার্থক্য বলছেন। 'শুধু পণ্ডিত যে, তার কামিনী কাঞ্চনে মন আছে। সাধুর মন হরিপাদপদ্মে। পণ্ডিত বলে এক, আর করে এক। যাদের হরিপাদপদ্মে মন তাদের কাজ, কথা সব আলাদা।' কাশীর নানকপন্থী এক সাধুর কথায় বলছেন, এরা একদিকে বেদান্তী আবার অন্যদিকে ভক্ত, দুই ভাবেরই সমন্বয় তাঁদের ভিতর দেখা যায়। যাঁরা বেদান্তবাদী তাঁরা অনেকে ভক্তি মানেন না। ভক্তিযোগীদের বেদান্তধর্মে নিম্ন অধিকারী বলে মনে করা হয়। আমরা তোতাপুরীর ব্যবহারে এর দৃষ্টান্ত দেখেছি। ঠাকুর হাততালি দিয়ে হরিনাম করছেন, তোতাপুরী বলছেন, 'কেঁও রোটি ঠোক্‌তে হো?' অর্থাৎ হাত চাপড়ে রুটি তৈরী করছ কেন? কট্টর বেদান্তীদের দৃষ্টিভঙ্গি এমনি। দোষ দেওয়ার কিছু নেই কারণ তাঁদের সংস্কারই এইরকম। তাঁরাও কম নন, তাঁরা জ্ঞানী, তীব্র বৈরাগ্য নিয়ে সাধনপথে চলেছেন কিন্তু ভক্তিযোগ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা নেই। আর ভগবানের বিভিন্ন রূপকে তাঁরা মায়ার কার্য বলে বলেন। তাঁরা শুধু দুটি জিনিস বোঝেন, ব্রহ্ম আর মায়া। বলেন, জীব আর ঈশ্বর, দুই-ই মায়ার সন্তান। অর্থাৎ মায়ার দ্বারা জীবত্ব, মায়ার দৃষ্টিতে ঈশ্বরত্ব। এইরকম বেদান্তী হয়েও নানকপন্থীরা ভক্তিযোগকে উচ্চ স্থান দিয়েছেন। আমরা এই সম্প্রদায়ের অনেক সাধুদের দেখেছি, খুব ভক্তিমান। এইটিই ওঁদের বৈশিষ্ট্য।

ঠাকুরের কথা আলাদা। কোন বাদই তাঁর দৃষ্টি থেকে বাদ পড়েনি। তিনি একাধারে যোগী, ভক্ত, জ্ঞানী, কর্মী সব। তাঁর তুলনা হয়তো মিলবে না। সাধারণত সাধকেরা একে অন্যের পথকে বুঝতে পারেন

না বা বুঝতে চেষ্টা করেন না, ফলে একে অন্যের প্রতি দ্বেষভাব পোষণ করেন। (ঠাকুর একেবারে বিপরীত কথা বলছেন, তুমি তোমার মতে নিষ্ঠা রাখ কিন্তু অন্য মতের সমালোচনা করার অধিকার তোমার নেই। তুমি কি সেইসব মতের অনুশীলন করে তাদের নিষ্ফলতা বুঝেছ? তোমার নিজের মতের সম্বন্ধেই বা তোমার কতদূর দৃঢ়তা আছে? নিজের মতবাদ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট না থাকলে অপরের সঙ্গে নিজের তুলনা করবে কি করে?) এইটি বিশেষ করে ভাববার জিনিস। আমরা কোনো বিষয়ে অজ্ঞ হলে সেই বিষয়কে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখি। যদি সত্যি সত্যি নিজেদের বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে বুঝতে পারব কত ক্ষুদ্র আমরা, কত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। এই একছটাক জ্ঞান নিয়ে আমরা অপরের সঙ্গে তুলনা করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে যাই যখন তখন তা আমাদের কত যে উপহাসাস্পদ করে তোলে একথা আমরা ভাবতেই পারি না।

আদর্শ ধর্ম

পূর্বোক্ত সেই নানকপন্থী সাধুর কথা বলতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, সাধুটি গীতাপাঠকালে বিষয়ী লোকের দিকে না চেয়ে আমার দিকে চেয়ে পড়তে লাগল। এই যে নিজের মতে আঁট, এই কঠোর বৈরাগ্য এর পরিণামে সংসারীদের প্রতি একটা উপেক্ষার দৃষ্টি এসে পড়ে। বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা রাখতে গিয়ে বিষয়ীর প্রতি বিতৃষ্ণা এসে পড়ে। শাস্ত্র বলছেন, যদি কেউ পড়ে যায় তাকে ঘৃণা করবে, না হাত ধরে তাকে টেনে তুলবার চেষ্টা করবে? ঠাকুর সতর্ক করে দিচ্ছেন নিজের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যেন অপরের আদর্শের প্রতিও উদার দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। এ সম্বন্ধে ভক্তদের ব্যবহার কেমন হবে শাস্ত্র তার উত্তরে বলছেন, 'মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা' থাকবে। মৈত্রী

বলতে বোঝায় সকলের প্রতি মিত্রতা, সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে সকলের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করা। মৈত্রীর পরিণামে এটি হবে। করুণা হোল কারো দুঃখদারিদ্র্য, অধঃপতন দেখলে তাদের জন্য বেদনাবোধ করা এবং তাদের সেই অবস্থা থেকে উন্নত করবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করা। এ না হলে আমাদের ধর্মজীবন ব্যাহত হবে। মুদিতা—মানুষের সুখে সুখী হওয়া, সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া। উপেক্ষা—অর্থাৎ যদি কেউ ভগবৎ বিদ্বেষী হয় তার সেই দ্বেষভাবের প্রতি উপেক্ষার দৃষ্টি আনতে হবে। ধর্ম পথে চলার জন্য এই প্রণালী গুলি বলা হয়েছে।

বেদান্তবাদ ও ভক্তিমার্গ

মাস্টারমশাই প্রশ্ন করলেন, ও সাধুরা কি বেদান্তবাদী নয়? ঠাকুর বলছেন, 'হাঁ, ওরা বেদান্তবাদী কিন্তু ভক্তিমার্গও মানে।' আসলে বেদান্তবাদী মুখে বললেই তো হয় না। বেদান্তের তত্ত্ব ধারণা করবার জন্য মনের যে শুদ্ধির প্রয়োজন সেই শুদ্ধি কলিযুগে নেই। তাই বলছেন, কলিযুগে নারদীয় ভক্তি, যে ভক্তি অহৈতুকী, যা প্রতিদানে কিছু চায় না। নারদ ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে বলছেন,

'সা কস্মৈচিৎ পরম প্রেমরূপা'

সেই ভক্তি কিরকম? না কোন একটি প্রেমাস্পদের প্রতি পরমপ্রেম। পরমপ্রেম কথাটির বিশিষ্ট অর্থ আছে। সাধারণ আত্মীয় পরিজন বা বিষয়ের প্রতি যে প্রেম তা স্বার্থপরতা দোষে দুষ্ট। মমত্ব-বুদ্ধি থেকে এই ভালবাসা প্রেরিত হয় তাই তা বন্ধনের কারণ। পরমপ্রেম বলতে বলেছেন, 'পরম' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যে অনুরাগ। তার তাৎপর্য হল প্রেমাস্পদ যিনি তিনি উদ্দেশ্য, উপায় নন। তিনি কিছু দেবেন এইজন্য তাঁকে ভালবাসা নয়, তাঁকে ভালবাসব 'তিনি' বলে। এই ভালবাসাই

পরমপ্রেম। কলিযুগে এই নারদীয় ভক্তি। কেন? না, এখানে মনের খুব একটা উচ্চ অবস্থা না থাকলেও ভগবানকে প্রভুরূপে, সন্তান-রূপে অথবা যে কোনোরূপে আমরা চিন্তা করতে পারি। আমাদের নাগালের ভিতর অভ্যাস করতে পারি। কিন্তু 'আমি ব্রহ্ম' বলে যখন নিজেকে বলি তখন সেই ব্রহ্ম আমাদের এত নাগালের বাইরে থাকেন যে তাঁর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই মনে রেখাপাত করে না। আমার সঙ্গে তাঁর এত পার্থক্য যে একজন আর একজনের একেবারে বিরুদ্ধ—Negation, দুজনের মধ্যে একত্বের কল্পনাও অসম্ভব। তবে যখন মনের মলিনতা কেটে আমি তাঁর মতো শুদ্ধ হয়ে যাই তখন 'আমিই তিনি' একথা বলা সাজে। তার আগে পর্যন্ত 'আমিই তিনি' বলা ভাল নয়। ঠাকুর তাই বহু জায়গায় বলেছেন, 'সোঽহং' বলা ভাল নয়। তা বলার মত মনের স্থিতি, মনের ভূমিকা কোথায়, ধারণা করবার মত শক্তি কোথায়? তাই ভক্তি-ভাবে, বিনীতভাবে কোন সম্বন্ধ নিয়ে তাঁকে যদি ভালবাসতে পারা যায় তবে চেষ্টা করতে করতে মনের মলিনতা ধীরে ধীরে দূর হয় এবং এই ভক্তির ভিতর দিয়ে ভক্ত ও ভগবানের দূরত্বের অবসান ঘটে। প্রথম প্রথম এই ভালবাসায় কামনা-বাসনা কিছু কিছু মিশ্রিত থাকলেও দোষের হয় না, ক্রমে ক্রমে শুদ্ধি আসে।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির প্রয়োজনীয়তা

তাই ঠাকুর বলতেন, সাধারণ লোকের জন্য জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ভাল। স্বামীজীও এর উপর খুব জোর দিয়েছেন। বিচারকেও আশ্রয় করতে হবে· আবার তাতেই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ না করে ভক্তিকে অবলম্বন করে সাধনপথে এগিয়ে যেতে হবে। এ না হলে অন্ধের গো-লাঙ্গুল ধরে বৈকুণ্ঠযাত্রার মত অবস্থা হয়, এইজন্য বিচার খুব দরকার। অনেকে বলে বিচার করতে নেই, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। সে

অন্যকথা। তর্ক বলতে তিন রকম আছে। জল্প, বিতণ্ডা আর বাদ। জল্পে যেন তেন প্রকারেণ অপরকে পরাজিত করে নিজের মত স্থাপনের জন্য অনর্থক কূট তর্ক করা হয়। বিতণ্ডাতে কোন মত স্থাপনের চেষ্টা নেই কেবল প্রতিপক্ষের মতখণ্ডন করে যাওয়া মাত্র। (সত্যকে জানবার জন্য যে তর্ক করা হয়, তাকে বাদ বলা হয়। যেখানে এই বাদকে অস্বীকার করা হয় সেখানেই সর্বনাশকে ডেকে আনা হয়। কারণ ভক্তিযোগ পরে আমাদের কতকগুলি কুসংস্কারে ডুবিয়ে রাখে এবং পরিণামে কোন পথে সে নিয়ে যায় তার ঠিকানা নেই। এইজন্য জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির প্রয়োজন। ঠাকুর একজায়গায় একজন ভক্তের শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনার উত্তরে বলছেন, যাঁকে ভক্তি করবি তাঁকে না জানলে কি করে ভক্তি করবি? অর্থাৎ তাঁকে কিছুটা জানা দরকার, নইলে বিভ্রান্ত হতে হয়।)

তারপর আর একটি কথা বললেন, এখন বেদমত চলে না। এখন তন্ত্রমত ভাল। তন্ত্রমত, পুরাণমত একই পর্যায়ে পড়ে। মানুষের বুদ্ধির সীমা, শুদ্ধির সীমাকে স্বীকার করে তন্ত্র পুরাণ প্রভৃতি রচিত হয়েছে। আর বেদমার্গ বলতে বোঝায় সেই শুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অথবা যাগযজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড। কোনোটাই আমাদের পক্ষে এখন অনুকূল নয়। এক একটা যাগযজ্ঞ করতে প্রায় একশ বছর লাগে, এখন কি আমরা অতদিন বাঁচব যে যজ্ঞ পূর্ণ করব? তারপর যজ্ঞাদির উপকরণ যোগাড় করবার সামর্থ্যও নেই। সুতরাং এখন আর যাগযজ্ঞাদি চলে না। ঠাকুর বলেছেন, এখন আর দশমূল পাঁচনে হবে না, এখন ডি-গুপ্ত। অর্থাৎ কবিরাজী পাঁচন তৈরী করা এখন এমন দুরূহ ব্যাপার যে প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত হবে। ডি-গুপ্ত অর্থাৎ পেটেন্ট ওষুধ এখনকার পক্ষে উপযোগী। ধর্মজীবন সম্বন্ধেও সেইরকম। প্রাচীন ব্যবস্থাগুলি অনুকূল পরিবেশসাপেক্ষ, যা এখন পাওয়াই অসম্ভব। এখন তো একটু নির্জন জায়গা পাওয়াই

মুসকিল তার উপর খাওয়ার সমস্যা তো আছেই। স্বামীজীও বলেছেন, সেই বৈদিক যজ্ঞীয় ধর্মেতে আকাশ আচ্ছন্ন করার দিন আর নেই। যুগে যুগে ধর্মকে যুগোপযোগী করে পরিবর্তিত করা হয়েছে, বর্তমানেও কালোপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়। তাই বলছেন, কলিতে নারদীয় ভক্তি।

পরমহংসের অবস্থা

এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে মাস্টারমশাই বলছেন, 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুদিগের কথা কহিতে কহিতে পরমহংসের অবস্থা দেখাইতে লাগিলেন।' এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে, দেখাতে লাগলেন বলতে কি বোঝায়? তিনি কি অভিনয় করছেন? এক হিসাবে মনে হয় অভিনয় কারণ সকলে দেখছে, তিনি দেখাচ্ছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও ভাবতে হবে, ঠাকুরের এই পরমহংসের অবস্থাটি তাঁর জন্ম থেকেই সহজ স্বাভাবিক অবস্থা। 'সেই বালকের ন্যায় চলন! মুখে এক একবার হাসি যেন ফাটিয়া পড়িতেছে! কোমরে কাপড় নাই; দিগম্বর; চক্ষু আনন্দে ভাসিতেছে!' এই-ই পরমহংসের অবস্থা। ঠাকুর যখনই পরমহংসের কথা ভাবছেন, তখনই তাঁর ভিতর সেই ভাবটিও ফুটে উঠছে। ভক্তদের তিনি অনুকরণ করে দেখাচ্ছেন তা নয়। তাঁকে দেখে ভক্তেরা বুঝতে পারছেন পরমহংস কাকে বলে। অন্তত বাহ্যলক্ষণগুলি তাঁদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। বাহ্যলক্ষণগুলি বলছি এই কারণে যে, তাঁর অন্তরের ভাবকে বুঝতে হলে পরমহংসের মনোভাব নিয়ে বোঝা দরকার, তা নাহলে বোঝা সম্ভব নয়। তাই বাহ্যলক্ষণ দেখে যতটা বোঝা যায়, ততটাই লোকে বুঝছে। শিশুদের ভিতরে যেমন ভাব গোপন করবার চেষ্টা নেই, যে কোন ভাব মনে উঠুক না কেন তা সমস্ত অঙ্গে প্রকাশ পায়, ঠাকুরও তেমনি একেবারে সহজ সরল শিশুর মতো।

যেই পরমহংসের কথা মনে হয়েছে তেমনি তাঁর সর্বঅঙ্গে সেই ভাবটি ফুটে উঠছে। এর ভিতর দিয়েই মানুষ পরমহংস সম্বন্ধে যতটা পারে ততটাই বুঝছে।

প্রত্যক্ষ ও সত্যজ্ঞান

মণি দার্শনিক সুতরাং তাঁর দার্শনিক মন বিচারে প্রবৃত্ত হোল। বলছেন, 'জীবনটা যেন একটা লম্বা ঘুম! এইটি বোঝা যাচ্ছে সব ঠিক দেখছি না।' কেন? না, দৃষ্টির ভিতর একটা ভ্রম এসে পড়ে। যখন একটা সাদা দেওয়াল দেখি তাকে সাধারণভাবে দেখলে একটা পর্দার মতো দেখায়। কিন্তু আমরা বলি দেওয়ালটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা আছে। এগুলি এমনি চোখে দেখি না কল্পনা করে নিয়ে দেখি। এরকম অনেক জিনিসই আমাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে, আমাদের দার্শনিক মন বিচার করলেই তা টের পায়। অর্থাৎ নিজস্ব কিছু অবদান দিয়ে আমরা বস্তুটি তৈরী করে নিই। এইজন্য তাকে বলে **apperception.** সুতরাং বস্তুকে আমরা যেরূপে দেখছি সেটা তার আসল রূপ নয়। এটুকু বিজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা বুঝতে পারি। মাস্টারমশাই বলছেন, 'যে মনে আকাশ বুঝতে পারি না, সেই মন নিয়েই তো জগৎ দেখছি'; এখন আকাশ বলতে কি বোঝায় তা বোঝা মুসকিল। আকাশ মানে বলছেন, অবকাশ—একটা জিনিস থেকে আর একটা জিনিসের মধ্যে যে ফাঁক তাই আকাশ। এখন এই আকাশটা কতদূর পর্যন্ত, এ প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারি না। যতদূর বস্তু আছে ততদূর আকাশ এবং তা ছাড়িয়েও আকাশ। আমাদের ইন্দ্রিয় যতখানি আমাদের অনুভব করায়, ততখানি আমরা ধারণা করতে পারি। আকাশকে দেখবার মতো আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ই নেই। যদিও ন্যায়ের বিচারে আকাশের একটি গুণ বলা হয়েছে—

'শব্দগুণমাকাশঃ'—শব্দ এর গুণ। যা আঘাত থেকে উৎপন্ন হয় তাই হল শব্দ। আকাশ না থাকলে আঘাত হয় না। এইজন্য শব্দ হচ্ছে আকাশের গুণ। কিন্তু বলছেন, এই আকাশকেই যখন ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারছি না, সমস্ত জগৎটাকে বুঝব কি করে? অতএব ঠিক দেখা কেমন করে হবে? সত্যই ঠিক দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এইজন্য দার্শনিকদের মধ্যে নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে।)

কেউ বলছেন, জগৎটাকে যেমন দেখছি তেমনই ঠিক। পরিবর্তনশীল জগতে পরিবর্তন সত্য। যতক্ষণ দেখব ততক্ষণ সত্য, যখন বদলাবে তখন আমরা তাকে সত্য বলব না। আবার কেউ বলছেন, জগৎটাকে এইরকম করে দেখছি আসলে এর খানিকটা বস্তু আর খানিকটাতে আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ আরোপ করা আছে। অজ্ঞেয়বাদ বলে, আসলে জগৎটার তত্ত্ব যা, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বস্তুর স্বরূপকে আমরা বুঝতে পারি না। বস্তু যখন আমাদের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে উপস্থাপিত হয় তখন আমরা তার স্বরূপকে দেখি না, অন্যান্য বস্তুকে তার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় দেখি। তাই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে আমরা বুঝি না। পাশ্চাত্য দার্শনিক **Kant** বলেছেন, **Thing-in-itself**—অর্থাৎ সেই আসল বস্তুটি যার উপর কোন প্রলেপ পড়ে না, কোন কিছু আরোপ করা হয় না—সেই বস্তুটি অজ্ঞেয়।

ঠাকুর বললেন, 'আর একরকম আছে। আকাশকে আমরা ঠিক দেখছি না: বোধহয়, যেন মাটিতে লোটাচ্ছে। তেমনি কেমন করে মানুষ ঠিক দেখবে? ভিতরে বিকার।' এই সম্বন্ধে দার্শনিকরা বলেন, 'আকাশের একটা তলা আছে, একটা জায়গা আছে যেখানে এসে আকাশটা দিগন্তের সঙ্গে মিশেছে। কিন্তু এগুলো আমরা আমাদের মন দিয়ে ভাবি। আসলে সবই মিথ্যা।' আকাশ কি সত্যিই কোন

দিগন্তের সঙ্গে মেশে ? যদি মেশে তবে কোন জায়গায় ? তা কিন্তু সঠিক কেউ বলতে পারে না। কারণ আমাদের দৃষ্টি সীমিত। আমাদের দৃষ্টির বাইরেও যে আকাশ আছে, সেটা দেখতে না পেলেও আমরা সেটা বুঝি। তেমনি ধোঁয়াতে আকাশটা মলিন হলেও আসলে আকাশটা মলিন হচ্ছে না। সুতরাং যে গুণগুলি আকাশের নয়, সেই গুণগুলি আমরা আকাশের উপর আরোপ করে দেখছি, দেখে আকাশকে সেই গুণবিশিষ্ট বলে মনে করছি। তেমনি মানুষ কেমন করে ঠিক দেখবে ? মানুষ যে মন দিয়ে দেখে সেই মনটিই তো আসলে বিকৃত। ঠাকুর বলছেন, বিকারের রুগী যখন কোন বস্তু দেখে তখন সে বিকারের ঘোরেই দেখে। বিকার মানে তার মনের সহজ স্বাভাবিক অবস্থা নয়। আমাদের মনেরও ঠিক সেইরকম স্বাভাবিক অবস্থা নয়। ঠিক দেখাও তাই হয় না।

(আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা তাহলে কি ? যখন ভিতরে কোনরকম রাগদ্বেষাদির তরঙ্গ নেই, বাসনা কামনার বিক্ষোভ নেই সেই অবস্থাই হল স্বাভাবিক অবস্থা। এই স্বাভাবিক অবস্থার বোধ আমাদের হয় না বলেই যখন যা দেখছি তাই আমাদের কাছে বিকারের ঘোরে দেখা।)

এরপর ঠাকুর মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন, 'এ কি বিকার শঙ্করী ! কৃপা চরণতরী পেলে ধন্বন্তরী।' ধন্বন্তরী রোগীর বিকার কাটায়। আর মার কৃপা পেলে আমাদের মনের বিকার কাটে। আমাদের বিকার কি ? না, আমরা তত্ত্ববিচার করি না, নিজেকে নির্লিপ্ত করতে পারি না। সব জিনিসের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে আমরা পরস্পরের সঙ্গে পৃথক হয়ে যাই। মণি বলছেন, 'কিশোরীকে বলেছিলাম, খালি বাক্সের ভিতর কিছুই নাই—অথচ দুইজনে টানাটানি করছে—টাকা আছে বলে!' অর্থাৎ অনিত্য বস্তু নিয়ে মারামারি। ভোগের ভিতরে সুখ আছে মনে করে আমরা এই অনিত্য বস্তু নিয়েই

টানাটানি করি। এই ভোগলিপ্সাই মানুষে মানুষে বিরোধের কারণ। কিন্তু বিচার করলে দেখতে পাই, সেই ভোগের ভিতরে কোন তত্ত্ব নেই, কোন সার্থকতা নেই।

আত্মার আবরণ ও মুক্তি

এরপর মাস্টারমশাই স্বগতোক্তি করছেন; 'আচ্ছা, দেহটাই তো যত অনর্থের কারণ। ঐসব দেখে জ্ঞানীরা ভাবে খোলস ছাড়লে বাঁচি।' খোলস ছাড়লে আমরা বাঁচি বটে কিন্তু খোলসের ভিতরে কি আছে তা না জানা পর্যন্ত বাঁচব কেমন করে? খোলস মানে কি? না, আবরণ। আত্মার উপরে নানা আবরণ রয়েছে যার দ্বারা আমরা নানান উপাধি জড়িয়ে নিজেদের ভূষিত করি। যেমন, আমি অমুক, আমার ঘর, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, এইরকম নানা উপাধি জড়িয়ে আছে। এইগুলিই আমাদের খোলস। এই খোলস ছাড়লে আমরা আমাদের আসল স্বরূপকে জানতে পারি। তাই ভাবছেন, দেহটাই অনর্থের মূল। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, কেন? রামপ্রসাদ গানে বলেছেন, 'এই সংসার ধোঁকার টাটী'। কিন্তু ভক্ত আজু গোঁসাই এই জগৎটাকে ভগবানের লীলা বলে গ্রহণ করে বলছেন, 'এই সংসার মজার কুটি'। ধোঁকার টাটী মানে যার কোন সত্তা নেই, অলীক বস্তু। কিন্তু সত্যিই যদি অলীক হোত তাহলে এই জগৎটা আমাদের আকর্ষণের কারণ হোত না, এখানেও আনন্দ আছে।

কিন্তু মণি খুঁত ধরে বলছেন, 'নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ কোথায়?' ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করলেন, 'হাঁ, তা বটে।' বাস্তবিক এখানে যে আনন্দ আছে তা টুকরো টুকরো। এ যেন গভীর অন্ধকার আকাশের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানে এক একটি নক্ষত্র ফুটে থাকা।

পরে মাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করছেন, জগতে যদি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ

নাই-ই থাকে তাহলে দেহধারণের কি দরকার? শুধু কর্মভোগ করার জন্য দেহ? ঠাকুর তার উত্তরে বলেছেন, 'ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়লেও ছোলাগাছই হয়।' অর্থাৎ আত্মা সর্বদাই শুদ্ধ পবিত্র। অপবিত্র বিষয়ের সম্পর্কে এসে তিনি অশুদ্ধ, অপবিত্র হন না। বলছেন, আগুন যেমন জগতে বিভিন্ন প্রকারের আকার নিয়ে প্রতীত হয় সেইরকম এক ব্রহ্মও বিভিন্ন আকারে প্রতীত হচ্ছেন। তিনি যেমন তেমনিই থাকেন, শুধু তাঁর রূপের পার্থক্য প্রতীয়মান হয়।

তাই শুনে মাস্টারমশাই বলছেন, 'তা হলেও অষ্টবন্ধন তো আছে?' অর্থাৎ এই বন্ধনের ভিতরে পড়ে দুঃখ বেদনার অনুভব তো আছে?' ঠাকুর এই অষ্টবন্ধন কথাটি সংশোধন করে বলছেন, অষ্ট পাশ। গুরুর কৃপা হলে এক মুহূর্তে কেটে যায়। আমরা বন্ধনের মধ্যে পড়ে হা হুতাশ করি কিন্তু যিনি এর পিছনে দড়ি ধরে আছেন, তিনি একবার নাড়া দিলেই সব গিরো খুলে যাবে।

কেশব ও ঈশান

এরপর ঠাকুর কেশব সেনের প্রসঙ্গ আনলেন। বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের উপর একসময় কেশব সেনের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তাঁর যে পরিবর্তন হয়েছিল সেটি ঠাকুর লক্ষ্য করেছেন। ব্যাপকভাবে শিক্ষিত সমাজে তিনি প্রশ্নটি তুললেন, 'আচ্ছা, কেশব সেন এত বদলালো কেন, বল দেখি?' কেশব সেন আগে নিরাকার ভগবানের উপর অত্যন্ত জোর দিতেন। পরে তিনি ভগবানকে সর্বরূপে ভাবতে শিখেছেন, বিশেষ করে মাতৃভাবে তাঁকে ভজনা করতে শিখেছেন এবং শেখাচ্ছেন। এটা অভিনব। ঠাকুর এখানে আরও ইঙ্গিত করছেন, 'এখানে কিন্তু খুব আসতো' এই ইঙ্গিতের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেই তাঁর এই ভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। একথা

তখন কারো বোঝবার মত সামর্থ্য ছিল না তাই তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। তাঁকে যখন কেউ বুঝতে না পারে তখন তাঁকেই অপরকে বোঝাতে হবে আর এই জন্যই তো তাঁর আসা। এরপর বলছেন, 'এখান থেকে নমস্কার করতে শিখলে।' শুধু উপদেশ দিয়ে নয়, ঠাকুর নিজে নমস্কার করে অপরকে নমস্কার করতে শিখিয়েছেন।

এরপর একটি কথার শুধু সূত্রটুকু বলা আছে পরিষ্কার করে বেশী বলা নেই। বলছেন, 'একদিন ঈশানের সঙ্গে কলকাতায় গাড়ী করে যাচ্ছিলুম। সে কেশব সেনের সব কথা শুনলে।' ঈশান হচ্ছেন একেবারে গোঁড়া হিন্দু। আর কেশব সেন এঁদের মতে নামমাত্র হিন্দু ব্রাহ্ম, আসলে খ্রীষ্টান। ঈশান প্রাচীনপন্থী, কেশব সেন নব্যপন্থী। দুই পরস্পর বিরোধী মতের একটি সুষ্ঠু সম্মিলন ঘটাতে হবে। তারই সূত্রটুকু এখানে ঠাকুর বললেন, কেশবের কথা ঈশান শুনলে। অর্থাৎ গঙ্গা যমুনার যেন মিলন ঘটান হল।

এরপর ঠাকুর বলছেন, 'হরিশ বেশ বলে এখান থেকে সব চেক্ পাশ করে নিতে হবে, তবে ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যাবে।' চেক্ পাশ করবে কে? না, যে সব জানে, তত্ত্বকে জানে। অর্থাৎ ঠাকুরের কাছে এলে পরীক্ষা হবে সত্য কোথায়, ধন ঠিক কিনা। মণি বুঝলেন, গুরুরূপে সচ্চিদানন্দ চেক্ পাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে জগৎ গুরুরূপে নিজে জগতের সকলের ভিতরে যে তত্ত্ব রয়েছে তাকে উদ্ঘাটিত করছেন, তার স্বরূপকে প্রকাশ করছেন।

পাঁচ

২.১০.১-৬

ঠাকুরের সঙ্গে কেশব সেনের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তার চিত্র আমরা আগেও পেয়েছি ; এইটি বোধহয় শেষ চিত্র কারণ এর অল্পদিন পরেই কেশবের দেহত্যাগ হয়।

সেদিন কেশবের বাড়ী ঠাকুরের আসবার কথা ছিল। তাই একটি ভক্ত বাড়ীর সামনে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বলা বাহুল্য এই ভক্তটি মাষ্টারমশায় স্বয়ং। কাছাকাছি একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের বাড়ী থেকে মৃতদেহ নিয়ে যাবার জন্য গাড়ী এসেছে, দেখে ভক্তটির মনে হচ্ছে মৃত্যুর পরে কি হয়, কোথায় যায় ? এই প্রশ্ন সকলের মনেই ওঠে বিশেষ করে যাঁরা ভগবানের চিন্তা করেন, একটু শুদ্ধ মন যাঁদের, তাঁদেরই মনে ওঠে। উপনিষদেও বলা আছে যে, 'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে। অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।' (কঠ, ২১, ২০) —মানুষের মৃত্যু সম্বন্ধে এই সংশয় আছে—কেউ বলেন, পরলোকগামী আত্মা আছেন, কেউ বলেন নেই।

দেহাত্মবোধ ও আত্মবোধ বা পূর্ণজ্ঞান

এই যে মৃত্যুর পরে কি হয়, আত্মা থাকে কিংবা থাকে না, এই প্রশ্ন চিরন্তন। এর সঠিক উত্তর আমাদের কাছে খুব স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় না, কারণ আমাদের দেহের প্রতি আত্মবুদ্ধি এত নিবিড় যে আমরা ভাবতেই পারি না যে দেহাতিরিক্ত কোন সত্তা আছে।

কেশবের অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, তাই ঠাকুর তাঁকে দেখতে এসেছেন। সঙ্গে মাষ্টারমশাই ও রাখাল। আসার সঙ্গে সঙ্গে কেশবের

কাছে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল না। অপেক্ষা করতে হচ্ছে কিন্তু ঠাকুর কেশবকে দেখবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হচ্ছেন। তখন প্রসন্ন তাঁকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে কেশবের বর্তমান অবস্থার কথা বলতে লাগলেন। তিনিও ঠাকুরের মতো মার সঙ্গে কথা বলেন, মা কি বলেন শুনে হাসেন, কাঁদেন —এসব কথা শুনে ঠাকুরের ভাবান্তর ঘটল, ভাবাবিষ্ট হয়ে ক্রমে সমাধিস্থ হলেন। যখন বাইরের জগৎ থেকে মনকে সরিয়ে বিশেষ কিছু চিন্তা করা হয় তখন ভাবাবেশ হয়, তারপরেই সমাধি হয় অর্থাৎ যেখানে দ্রষ্টার কোনো পৃথক অস্তিত্ব বোধ থাকে না, চিন্তার বস্তুর মধ্যে একেবারে নিবিড়ভাবে মগ্ন হয়ে যায়। ঠাকুরও এখানে ক্রমে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছেন। কোনোপ্রকারে তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। এবার একটু হুঁশ এসেছে। ঘরের আসবাবপত্র দেখে ভাবের ঘোরে বলছেন, 'আগে এসব দরকার ছিল। এখন আর কি দরকার?' ভগবানের সঙ্গে যতক্ষণ না ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়, ততক্ষণই ঠাট্‌বাট্ সাজসজ্জার প্রয়োজন। এখন অর্থাৎ যখন কেশব ভগবানে মগ্ন হয়েছেন তখন এগুলি তাঁর কাছে নিরর্থক। এরপর ভাবের ঘোরে জগন্মাতার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। নিজেই প্রসঙ্গ তুলছেন, 'দেহ হয়েছে আবার যাবে! আত্মার মৃত্যু নাই' মানুষের অপরিপক্ক মন, মনে করে, দেহের সঙ্গে আত্মার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কিন্তু মন যখন পরিপক্ক হয় তখন দেহ আর আত্মা দুদিকে আলাদা বলে বোধ হয়।

এরপর পূর্বদিকের দ্বার দিয়ে অতি কষ্টে কেশব কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর অস্থি-চর্মসার মূর্তি দেখে সকলে বিস্মিত। কেশব ভূমিষ্ঠ হয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলেন কিন্তু ঠাকুরের তখন কেশবের দিকে দৃষ্টি নেই, তিনি আত্মস্থ হয়ে রয়েছেন। তাঁর মনকে বাহ্য জগতে ফিরিয়ে আনবার জন্য কেশব উচ্চৈঃস্বরে বলছেন, 'আমি এসেছি', 'আমি এসেছি'! ঠাকুর ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। আপনা আপনি কত কথা

বলছেন। ভক্তেরা সকলে অবাক হয়ে শুনছেন। ঠাকুর বলে যাচ্ছেন, 'যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণই নানা বোধ। যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, এইসব। পূর্ণজ্ঞান হ'লে এক চৈতন্য-বোধ হয়।' আমরা বেদান্তের উপাধি শব্দটির অর্থ অনেকবার আলোচনা করেছি। দুটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। অনুলোম বিচার এবং বিলোম বিচার। অনুলোম বিচারে নেতি নেতি করে বৈচিত্র্যকে সরিয়ে দিয়ে এক তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা করে এবং বিলোম বিচারে বলে, ব্রহ্মই জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন। পূর্ণজ্ঞান হলে অনুলোম বিলোম দুইভাবেই জগতের সর্বত্র ব্রহ্মকে অনস্যূত দেখে। এটিকে ঠাকুর বিজ্ঞানীর অবস্থা বলছেন। তবে শক্তি বিশেষ আছে। তিনিই সব হয়েছেন বটে কিন্তু কোনখানে বেশী শক্তির প্রকাশ, কোনখানে কমশক্তির প্রকাশ ঘটে। আধার অনুযায়ী শক্তি প্রকাশের তারতম্য হয়। এই সম্বন্ধে উপনিষদে আছে—

'যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে,
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে,
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।' (কঠ-২. ৩. ৫)

—বিভিন্ন ব্যক্তিতে এই ব্রহ্মানুভূতি কিরকম হয় তা বলা হয়েছে—দর্পণে বস্তু যেমন সুস্পষ্ট দেখা যায় তেমনি নরলোকে বুদ্ধিতে আত্মার দর্শন সেইরকম সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। আর স্বপ্নে যেমন অস্পষ্ট দেখা যায় সেইরকম পিতৃলোকে ব্রহ্ম অস্পষ্টভাবে উদিত হন। জলের উপর ছায়া পড়লে যেমন দেখায় গন্ধর্বলোকে সেই ব্রহ্মানুভূতি আরও অস্পষ্ট। কিন্তু ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণুভূতি অত্যন্ত স্পষ্ট। ছায়া এবং আতপ অর্থাৎ অন্ধকার এবং আলো যেমন সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেইরকম ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম এবং অন্য বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্মই সেখানে স্পষ্টতম রূপে অনুভূত হয়।

ব্রহ্মের প্রকাশ যেমন বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ধরনের হয় তেমনি ঠাকুর এখানে বলছেন, বিভিন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ব্রহ্ম বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত

হন। ভক্তের হৃদয়ে একভাবে আবার জ্ঞানীর হৃদয়ে আর একভাবে প্রকাশ হয়। আবার মোহগ্রস্ত জীবের হৃদয়ে অন্যরকমে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মশায় সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখতে চাইতেন বলে তিনি ভাবতেন সব জায়গায় সমান শক্তি আছে কিন্তু ঠাকুর বলছেন, 'তাঁর লীলা যে আধারে প্রকাশ করেন, সেখানে বিশেষ শক্তি।' পঞ্চাশ জন লোককে হারিয়ে দেবার শক্তি একজনের ভিতরে আসে কেমন করে? ঐশী শক্তির বিশেষ প্রকাশ না হলে এ সম্ভব নয়। গীতায় আছে—

'যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥' (১০/৪১)

—যা কিছু ঐশ্বর্যবান, সৌন্দর্যসম্পন্ন ও বিশেষ শক্তি বিশিষ্ট সেই সব বস্তু আমার তেজের অংশসম্ভূত বলে জেন। শুধু প্রকাশের তারতম্য আছে।

কার্যের দ্বারা শক্তির প্রকাশ অনুমেয়

তারপর বলছেন, কোথায় তাঁর শক্তির বিশেষ প্রকাশ কি করে বুঝব? না, কার্যের দ্বারা শক্তি অনুমেয়। 'যেখানে কার্য বেশী সেখানে বিশেষ শক্তির প্রকাশ' অনুমান করতে হবে। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। একটিকে ছাড়া অন্যটিকে ভাবা যায় না। যেখানে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেখানে কোনও শক্তির তারতম্য নেই, সেখানে কাজও নেই, বৈচিত্র্যও নেই, কোন বিশেষ অনুভবও সেখানে নেই। কিন্তু যেখানে বৈচিত্র্য আছে সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ ইত্যাদি পার্থক্যের অনুভব আছে। সেখানে শক্তিরও প্রকাশেরও তারতম্য ঘটে। তাই বলছেন, ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি অভেদ সম্পর্কযুক্ত। ন্যায়ের ভাষায় এই সম্বন্ধকে বলে সমবায় সম্বন্ধ বা নিত্য সম্বন্ধ। বেদান্তের ভাষায় এই সম্বন্ধ হচ্ছে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বা অভেদ সম্বন্ধ। 'আদ্যাশক্তিই এই জীবজগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন'।

সত্ত্বগুণী ভক্তদের মধ্যে ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশ

তারপর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, 'রাখাল, নরেন্দ্র আর আর ছোকরাদের জন্য এত ব্যস্ত হই কেন?' ভোলানাথকে জিজ্ঞেস করে জানলেন, সমাধিস্থ লোক সমাধি থেকে নেমে সত্ত্বগুণী ভক্তদের নিয়ে থাকে। এই সকল ছোকরাদের ভিতর ভগবানের বিশেষ প্রকাশ দেখতে পান, তাই এঁদের নিয়ে তিনি আনন্দ করেন। যেখানে তাঁর প্রকাশ বেশী সেখানে আকর্ষণও বেশী।

এরপর বলছেন, 'ভাবসমুদ্র উথলালে ডাঙায় এক বাঁশ জল।' ঈশ্বরলাভ করবার পর তাঁকে সর্বত্র দেখা সম্ভব। 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'—যেখানে যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেখানেই তিনি। অন্যত্র দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, ছাদে ওঠবার পর দেখে যে জিনিসে ছাদ তৈরী সেই জিনিসেই সিঁড়ি তৈরী। তাই সমাধি থেকে নেমে আসার সময় থেকেই সমাধিস্থ ব্যক্তি এক সূত্র ধ'রে থাকেন যে সূত্রে সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। দেখেন সেই এক তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি

এরপর বলছেন, 'যিনি ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এই সব করেন তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি।' মনে রাখতে হবে এই প্রকৃতি সাংখ্যের প্রকৃতি নয়। সেখানে পুরুষ নির্বিশেষ চৈতন্য আর শক্তি হল জড় বস্তু, সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। চৈতন্যের সান্নিধ্যে প্রকৃতি সেখানে নানাভাবে পরিবর্তিত হচ্ছেন। কিন্তু বেদান্ত মতে বা শাক্তমতে বলা বলা হয় প্রকৃতি পরমেশ্বরেরই আর একটি স্বরূপ। এক পুরুষের উপরেই প্রকৃতির সৃষ্টি স্থিতি ক্রিয়া বিরাজ করছে, সেই শক্তি পুরুষের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই শাক্ত মতে শিবের উপরে শক্তি দাঁড়িয়ে আছেন।

শিব হলেন শক্তির আধার, শক্তি শিবের আধার ছাড়া অন্যত্র থাকতে পারেন না, আবার শিবও যদি শক্তির আশ্রয় না হন, তাহলে তিনি জগৎ সৃষ্টি স্থিতি লয় করতে পারেন না। এই শিবই সেই শুদ্ধ পরমেশ্বর রূপী চৈতন্য। তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।

পৃথক জ্ঞান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পুরুষ ও প্রকৃতি দুটি আলাদা মনে হয় কিন্তু কেবল পুরুষ বা কেবল প্রকৃতি ভাবা যায় না। যেখানেই বৈচিত্র্য সেখানেই দুটিকে ভাবতে হয়। দুটি পৃথক বস্তু নয়, দুটিকে অভিন্নভাবে অর্থাৎ একটি অন্যটির আধার, একটি অন্যটির প্রকাশ—এইরকম ভাবতে হয়। আর যেখানেই বৈচিত্র্য সেখানেই প্রকৃতির রাজ্য।

জগন্মাতা বাঞ্ছাকল্পতরু

এবপর কেশবকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'মা—কি মা? জগতের মা।' জগতের মা অর্থাৎ এই জগৎ যাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে; যিনি তাঁর সন্তানদের সর্বদা রক্ষা করছেন আর ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—যে যা চাইছে তাকে তাই দিচ্ছেন তিনিই জগতের মা। ইনি সংহারও করছেন। সংহার মানে হত্যা নয়, নিজের ভিতরে সম্যকরূপে আহরণ করে নেওয়া। তিনি নিজের ভিতর থেকে জগৎকে প্রকাশ করছেন, কিছুক্ষণ রাখছেন, আবার নিজের ভিতরেই তাকে গুটিয়ে নিচ্ছেন।

আর একটি ভাববার বিষয় আছে। এই মা, যে যা চাইছে তাকে তাই-ই দিচ্ছেন। 'আরাধিতা-সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা' (চণ্ডী ১৩. ৫)—তাঁকে আরাধনা করলে তিনি ইহজগতের সুখসমৃদ্ধিও দেন আবার স্বর্গও দেন। চাইলে মুক্তি, অপবর্গ এসবও দেন। এখন আমরা বলব, তিনি আমাদের বন্ধনের মধ্যে রেখেছেন কেন? প্রশ্ন এই যে, তিনি রেখেছেন না আমরা চেয়েছি? আমরা যদি বন্ধন না চাই,

বন্ধন মোচনের জন্য প্রার্থনা করি তাহলে তিনি তো রয়েছেন বন্ধন খুলে দেবার জন্য। কিন্তু আমরা কি প্রার্থনা করি? মা, আমাদের কল্যাণ কর, সন্তানদের কল্যাণ কর, তাদের সন্তানদের কল্যাণ কর—এইরকম আমাদের চাওয়া। এইসব ছেড়ে দিয়ে কেবল মাকে তো আমরা চাই না, তাই মা-ও উদাসীন থাকেন। কিন্তু যখন খেলনা ফেলে মাকে চাইব, মা কোলে তুলে নেবার জন্য অবশ্যই প্রস্তুত। সুরথ রাজা স্বর্গাদিলোক চেয়েছিলেন, তো এমন স্বর্গ তাঁকে দিলেন যে ভোগের একেবারে চূড়ান্ত! আবার সমাধি বৈশ্য মোক্ষ চেয়েছিলেন, মা তাকে মোক্ষ দিলেন। ঠাকুর বলছেন, ছোটছেলে সন্ধ্যার সময় খেলনা ফেলে কেবল মাকে চায়, অন্য সব ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সেইরকম আমাদের যদি কোনদিন মায়ের জন্য ঐরকম ব্যাকুলতা আসে তাহলে মা আর থাকতে পারেন না, ছুটে আসেন। তিনি খেলারও ব্যবস্থা রেখেছেন আবার খেলার পরে তাঁর শান্তিময় কোলও রেখেছেন, যে যা চায় তাকে তাই দিচ্ছেন।

ঈশ্বর ভক্তির বশ

কেশবের এই অসুখটি তাঁকে জীবনাবসান ঘটায় তাই হয়তো ঠাকুর অনর্গল ভগবৎ প্রসঙ্গ করে চলেছেন। তাছাড়া আরও একটি কারণ আছে। আমাদের এই নশ্বর দেহটা আসলে ভগবানের চিন্তা করার জন্য। কাজেই ভগবৎপ্রসঙ্গই সার আর সব অনিত্য। এটিই যেন কেশবের সঙ্গে প্রসঙ্গ করে ঠাকুর সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

কেশবকে বলছেন, যাকে আপনার মনে করি তার ঐশ্বর্যের কথা মনে হয় না। ঈশ্বরকে আপনার বলে মনে করবে, তাঁর ঐশ্বর্যের কথা অত ভাববে না। দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, তোমার প্রয়োজন এক বোতল মদের, শুঁড়ির দোকানে কত মন মদ আছে তা জানার কি দরকার? ভাব

হচ্ছে, ভগবানের ঐশ্বর্যের খবরে কি প্রয়োজন, তাঁকে ভালবাস, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কর তারপর যদি দরকার হয় তিনিই তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্যের খবর দেবেন। আসলে মানুষ নিজে ঐশ্বর্য ভালবাসে তাই ভাবে ঈশ্বরও ঐশ্বর্য ভালবাসেন। তাই ঠাকুরকে গয়না গড়িয়ে দেয়। বিষ্ণুঘরের গয়না চুরি যাওয়ায় মথুরবাবুও আক্ষেপ করেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে বলেছেন, তোমার কাছেই গয়না মূল্যবান তাঁর কাছে এগুলো মাটির ঢেলা। বলছেন, 'ঈশ্বর কি ঐশ্বর্যের বশ? তিনি ভক্তির বশ। তিনি কি চান? টাকা নয়। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য এই সব চান।' বিবেক বৈরাগ্যবান ভক্ত জানে যে, এই সব ঐশ্বর্যে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নেই। তাই ঠাকুর তিনরকম ভক্তের কথা বলেছেন। সত্ত্বগুণী, রজোগুণী এবং তমোগুণী। তমোগুণী ভক্ত ঈশ্বরকে পাঁঠাবলি দেয়, রজোগুণী আড়ম্বর করে পূজা দেয় সত্ত্বগুণী অতি গোপনে সামান্য আয়োজন করে পূজা করে। আসলে ঈশ্বর বিবেক বৈরাগ্য প্রেম ভক্তিই চান।

তীব্র বৈরাগ্য

বৈরাগী চূড়ামণি সনাতন গোস্বামীর জীবনে এইরকম তীব্র বৈরাগ্যের কথা আছে। তিনি তাঁর ঠাকুরকে বলছেন, আজ তুমি নুন চাইছ, কাল বলবে মাখন দাও, তারপর বলবে আরও কিছু দাও—ওসব আমার দ্বারা হবে না। আমার যা আছে তাই-ই তোমায় নিতে হবে। এরই নাম বৈরাগ্য। আবার আছে, যখন সনাতন গোস্বামীর স্পর্শে ব্যাপারীর নৌকা ভেসে উঠল, ব্যাপারী ঠাকুরের মন্দির করে দিলেন। তখন সনাতন গোস্বামী বলছেন, ঠাকুর, বুঝেছি, এখন তোমার ভোগের বাসনা হয়েছে। তা, তোমার ভোগ নিয়ে তুমি থাক আমার ওসব পোষাবে না। আমি চললাম। তীব্র বৈরাগ্য হলে ভগবানের জন্যও কোনো ভোগের আয়োজন ভক্ত সহ্য করতে পারে না।

তীব্র ভাবাবেগের ফল

তারপর কেশবের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছেন, 'তোমার অসুখ হ'য়েছে কেন তার মানে আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চ'লে গেছে, তাই ঐরকম হয়েছে।' ঠাকুরের নিজের জীবনে এর অনুভব তো আছেই, শ্রীচৈতন্যের জীবনেও আছে—ভাবের বেগে তাঁর শরীরের রোমকূপ দিয়ে রক্তপাত হোত। খুব উচ্চ শক্তিসম্পন্ন (high volt এর) বৈদ্যুতিক তার স্পর্শ করলে যেরকম হয়, সমস্ত শরীরে সেরকম ভাবের প্রবাহ বয়ে যায়। সেজন্য ভাবের বেগ সত্ত্বগুণের দেহ না হলে সহ্য করতে পারে না। ভাবের প্রভাব শরীরের উপর কতটা পড়ে তা সাধারণ মানুষও কিছুটা অনুভব করতে পারে। যখন মানুষের তীব্র শোকের বা আনন্দের অনুভব হয় তখন তার দেহের উপর প্রতিক্রিয়া হয়। অনেক সময় শোনা যায় কোনো লোক একটা দুর্ঘটনার খবর শুনে অজ্ঞান হয়ে গেল। ভাবের বেগ সহ্য করতে পারেনি তাই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। আর ভগবৎ অনুভবের আনন্দ এত তীব্র যে খুব শুদ্ধসত্ত্ব শরীর না হলে ধারণা করতে পারে না। নিজের অনুভূতি থেকে বলছেন ঠাকুর, এই ভাব যখন আসে তখন বোঝা যায় না কিন্তু পরে শরীরের উপর এর প্রভাব বোঝা যায়, একটা যেন তোলপাড় ঘটে যায়। কেশবকে বলছেন, রোগের একটু বাকি থাকলে ডাক্তার যেমন হাসপাতাল থেকে ছাড়ে না, তেমনি শুদ্ধির একটু বাকি থাকলে তিনিও ছাড়েন না। ভগবানের পথে গেলে সমস্ত বেগ, সমস্ত কষ্ট সহ্য করতে হবে। উপায় নেই। ঠাকুর বলছেন, 'হৃদু বোল্‌তো, এমন ভাবও দেখি নাই! এমন রোগও দেখি নাই।' আসল কথা তখনতো আর দেহবুদ্ধি ছিল না, দেহের উপর দিয়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে প্রশ্নই মনে আসছে না। মন তখন সূক্ষ্ম তত্ত্বেতে স্থির। পরে কেশবকে বলছেন, 'শিশির পাবে ব'লে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধ তুলে দেয়',

অর্থাৎ এই রোগভোগ এ যেন ভবিষ্যতের একটা বিরাট কিছু সম্ভাবনার সূচনা। আগের বারে কেশবের অসুখের সময় ঠাকুরের মন খুব ব্যাকুল হয়েছিল কিন্তু এবারে তাঁর মন যেন স্বীকার করে নিয়েছে কেশব আর বেশীদিন বাঁচবেন না তাই তত ব্যাকুল হননি।

এরপর যখন কেশব সেনের মা ঠাকুরকে কেশবের রোগ সারানর জন্য অনুরোধ জানালেন, তিনি বললেন, মা আনন্দময়ীই দুঃখ দূর করবেন। আবার কেশবকে বলছেন, 'মেয়েছেলেদের মধ্যে থাকলে আরো ডুববে; ঈশ্বরীয় কথা হলে আরো ভাল থাকবে।' সংসারের পরিবেশ মনকে নামিয়ে দেয় তাই সতর্ক করে দিচ্ছেন।

ঠাকুর শরীরের লক্ষণ দেখে লোকের চরিত্র বুঝতে পারতেন। কেশবের হাত ওজন করে দেখছেন, হাল্কা না ভারী। বলছেন, 'খলদের হাত ভারী হয়।' তবে শারীরিক ত্রুটিগুলি সব সময় নির্ভুল হয় না।

পূর্ণ সমর্পণ

কেশবকে আশীর্বাদ করবার জন্য যখন তাঁর মা, ঠাকুরকে অনুরোধ জানালেন ঠাকুর বলছেন, জগন্মাতাই যা করেন। তিনি নিজেকে মায়ের যন্ত্রস্বরূপ মনে করেন। বলছেন, মানুষের মোহ যেতে চায় না। দুদিন বাদে সবাইকে এই মাটি ছেড়ে চলে যেতে হবে তবু জমি নিয়ে ভাই ভাই বিবাদ করে। আমরা আমাদের ইচ্ছাকে মায়ের কাছে জানাতে পারি, প্রার্থনা করতে পারি কিন্তু তিনি কি করবেন না করবেন সেটা তাঁর হাতে। আর আমরা যা চাইছি তা আমাদের প্রকৃত কল্যাণকর কিনা তা-ও আমরা জানি না। শুভাশুভ আমরা বিচার করতে পারি না। তাই ঠাকুর বলেছেন, সব তাঁর হাতে ছেড়ে দাও, তিনিই তোমাদের কল্যাণ করবেন। যে নির্ভরশীল সাধক সে কখনও দুঃখকষ্ট এড়াবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে না।

যীশু একসময় বিপদমুক্ত হবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন কিন্তু পরক্ষণেই বলছেন, না, আমার ইচ্ছা নয় তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। Thy will be done and not mine. এখানেই হোল দেহের উপরে আত্মার বিজয়। ঠাকুরকে একবার তাঁর সন্তানেরা বলছেন, যোগশাস্ত্রে আছে অসুস্থ দেহের প্রতি মনকে কেন্দ্রিত করলে সেই অসুস্থ স্থানটি সুস্থ হয়ে যায়, আপনিও এরূপ করুন। ঠাকুর বলছেন, সে কিরে, যে মন ভগবানকে দিয়েছি সেই মন এই দেহের উপরে কেমন করে দেব? ঠাকুরের ছিল এইরকম পূর্ণ নির্ভরশীলতা। কর্তৃত্ববোধ যখন নিঃশেষে দূর হয়ে যায় তখন আর নিজের ভাল মন্দের জন্য কোন প্রার্থনাই থাকে না। সাধারণ মানুষের এই পূর্ণ নির্ভরতা আসে না। তাই ভক্তদের বলি, যতক্ষণ মনের মধ্যে চাওয়া আছে ততক্ষণ চাইবে না কেন? তাঁকে আপনার বলে মনে করে চাইলে দোষ হয় না। তবে ঠাকুর বলতেন, ছোটখাট জিনিসের চেয়ে তাঁকে চাইলে ভাল হয়। আসলকথা ভগবানকে উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করতে হবে উপায়রূপে নয়। তা না হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

অতএব এইটি হোল আসল কথা, তাঁকে পেয়ে আমাদের পরিপূর্ণ হতে হবে। কারণ তিনি ছাড়া সকল বস্তু অনিত্য। তাই ঠাকুর বলছেন, আগে তাঁকে ধরো তাঁকে অবলম্বন কর, বাবুকে জানতে পারলে তাঁর সব খবর তিনিই জানিয়ে দেবেন। ধ্রুবোপখ্যানের মধ্যে এই কথাই বলা হয়েছে। ধ্রুব তপস্যান্তে ভগবানের দর্শন পেয়েই আনন্দে বিভোর হয়ে গিয়েছেন। আগের অভিলাষ আর পূরণ করার আগ্রহ নেই। বলছেন, আমি কাঁচ খুঁজতে এসে কাঞ্চন পেয়ে গিয়েছি। এতেই আমার হৃদয় ভরে গিয়েছে আর কিছু আমার প্রয়োজন নেই। এরই নাম 'আত্মারামো ভবতি'—এই নিজের আনন্দে নিজে পূর্ণ থাকা, এইখানেই জীবনের পূর্ণ সার্থকতা।

ঠাকুরের আশীর্বাদ

অমৃত কেশবের বড় ছেলেকে আশীর্বাদ করতে বললে ঠাকুর ছেলেটির গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'আমার আশীর্বাদ করতে নাই।' আশীর্বাদ করা মানে লোকের কল্যাণ কামনা করা, তা তিনি করতে পারেন না তা নয়, এতো তাঁর নিত্য কর্ম। কিন্তু আশীর্বাদের অর্থ যদি ঐহিক সুখের কামনা পূরণ বা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, এরকম তিনি করতে পারেন না। মায়ের কাছে তিনি এরকম শক্তি চাননি কেবল শুদ্ধা ভক্তি চেয়েছেন। সাধুর কাছে এসে সকলে রোগমুক্তি, আর্থিক সঙ্কট বা অন্যান্য বিপদ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন। এরকম কোন প্রার্থনা নিয়ে সাধুর কাছে যাওয়া ঠাকুর পছন্দ করতেন না। কারণ এতে মানুষের মন ভগবানের দিকে না গিয়ে ঐহিক বিষয়ের দিকে যায়। অবশ্য বিষয়াসক্ত মনের পক্ষে এ সব চাওয়া স্বাভাবিক। দোষেরও নয়। কিন্তু ঠাকুর তাঁর ইচ্ছাকে জগন্মাতার ইচ্ছাতে লীন করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর ইচ্ছা বলতে জগন্মাতার ইচ্ছা যা তাই হবে।

দয়ানন্দ সরস্বতী

তারপর কেশবের সম্বন্ধে বলছেন, দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। কেশব অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ঐহিক সম্পদ, প্রতিপত্তি আদিও ছিল, তাই ঐহিক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁকে মানতেন আবার তাঁর ঈশ্বর ভক্তি, ভগবদ্‌বিষয়ে অনুরাগ ইত্যাদি দেখে সাধুরাও তাঁকে মানতেন। সর্বত্রই তাঁর মান সম্ভ্রম ছিল।

দয়ানন্দ এবং আর্যসমাজীদের প্রসঙ্গে বলছেন, তাঁরা হোম করেন, দেব দেবী মানেন না। বলেন, কর্মের দ্বারাই ফল হবে। নিরীশ্বরবাদী মীমাংসকদেরও এই মত। তাঁরা বলেন, ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন

নেই। আবার ঈশ্বরবাদী মীমাংসক বলেন, ঈশ্বর ফলদাতা বটে কিন্তু কর্মফল দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোনো স্বাধীনতা নেই। যেমন কর্ম করবে, ঈশ্বরকে সেইরকমই ফল দিতে হবে। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার মতো, যতটাই রাখা যায় ততটাই পাওয়া যায়। এইরকমভাবে সেখানে ঈশ্বরকে মানা হয়।

কেশবের শিষ্যদের কাছে ঠাকুর তাঁর প্রশংসা করে বলছেন, কেশব গুরু পদবী নিতে চান না। 'যা যা সন্দেহ সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে'।—এর দুটি অর্থ হ'তে পারে। এক ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা কর কিংবা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর, স প্রশ্নের উত্তর পাবে। তাই ঠাকুর বলছেন, 'ইনি আরও কোটি গুণে বাড়ুন। আমি মান নিয়ে কি করবো ?'

ছয়

২. ১১. ১-৪

বর্তমান প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কিত। তাঁর তিনটি অবস্থা হোত— বাহ্য, অর্ধবাহ্য ও অন্তর্দশা। বাহ্যদশায় জগতের প্রত্যক্ষ হচ্ছে। অর্ধবাহ্যদশায় অন্তরে রসের আস্বাদন করতেন। আর অন্তর্দশায় মহাকারণে মন লীন হোত, সমাধিস্থ হতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'বেদান্তের পঞ্চকোষের সঙ্গে, এর বেশ মিল আছে।' পঞ্চকোষ মানে আত্মার পাঁচটি আবরণ। পাঁচটি আবরণ থাকায় তার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রূপে শক্তির প্রকাশ হচ্ছে। প্রথম, 'স্থূলশরীর, অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ।' তারপর 'সূক্ষ্মশরীর, অর্থাৎ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ।' এর সতেরোটি অবয়ব—পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ আর মন ও বুদ্ধি। কারণ শরীর বলছেন, আনন্দময় কোষ। শাস্ত্রে আনন্দময় কোষ সম্পর্কে দুরকমের বিচার আছে। একজায়গায় আনন্দময় কোষকেই বলছেন সেই আনন্দসত্তা! আর একজায়গায় বলছেন, আনন্দময় কোষও একটি কোষ অর্থাৎ আচ্ছাদন। তারও পশ্চাতে রয়েছে আর একটি তত্ত্ব যেটি বাক্য মনের অগোচর তাকেই এখানে মহাকারণ বলেছেন।

হঠযোগ, রাজযোগ ও ভক্তিযোগ

জনৈক ভক্ত হঠযোগ কিরূপ জানতে চাইলে ঠাকুর বলছেন, 'হঠযোগে শরীরের উপর বেশী মনযোগ দিতে হয়'। তাঁর মতে এগুলি অলৌকিক শক্তি লাভের পক্ষে উপযোগী, অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভের

উপায়। কিন্তু তিনি সর্বদাই বলতেন, এই সমস্ত শক্তির দ্বারা আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি কিছু হয় না, মনেরও শুদ্ধি হয় না। এগুলি থেকে বিরত থাকার জন্য ভক্তদের সর্বদাই সাবধান করতেন।

দৃষ্টান্ত দিলেন, মাটির নীচে কবরস্থ বাজিকরের। বহুকাল পরে চৈতন্য লাভ করেই বাজিকর চেঁচাতে লাগল, 'লাগ্ ভেল্কি, লাগ্ ভেল্কি! রাজা কাপড়া দে, রুপিয়া দে।' সাপ ব্যাঙের মত দীর্ঘকাল মাটির নীচে থেকে কেউ দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে কিন্তু তার দ্বারা আসল বস্তু ভগবানের দিকে যদি মন না যায় তবে সেই অকেজো দীর্ঘজীবন লাভ করে কি ফল? বেদান্তবাদীরা হঠযোগ মানেন না, রাজযোগ মানেন। রাজযোগ অর্থাৎ মনকে ভগবানের দিকে প্রেরণ করা, মনের সংযম নিয়মন ইত্যাদি। এই রাজযোগের সাহায্যে যা করতে যায়, ভক্তির দ্বারা, বিচারের দ্বারাও সেই কাজই হয়।

হঠযোগ দ্বারা শক্তিলাভ করতে গেলে মন ক্রমশ ঈশ্বরের থেকে দূরে সরে যাবে। এজন্য বলছেন, ভক্তিই সার, সবচেয়ে নিরাপদ। এই পথকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করা ভাল। অবশ্য বিচারের পথ ও রাজযোগের কথা পরে বলেছেন কিন্তু সেসব পথগুলি কঠিন। সাধারণের পক্ষে ভক্তিযোগই উপযোগী। কলিতে অন্নগত প্রাণ তাই ভক্তিযোগই ভাল।

ঠাকুরের সান্নিধ্যে মাষ্টারমশায়ের ব্যাকুলতা লাভ

পরবর্তী পরিচ্ছেদে ঠাকুরের কথা খুব বেশী নেই, শ্রোতাও শুধু মাষ্টারমশাই নিজে। মাষ্টারমশাই দু বছর হল ঠাকুরের কাছে আসা যাওয়া করছেন। মনে প্রবল বৈরাগ্য, ভগবানকে দেখার জন্য ব্যাকুলতা জেগেছে। তাই একান্তে পঞ্চবটীর বেড়ার ধারে বসে জপধ্যান করছেন। এমন সময় ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হয়ে বলছেন, 'তোমার শীঘ্র হবে। একটু করলেই কেউ বলবে, এই এই!' অর্থাৎ একটু জপধ্যান করলে,

সাধন পথে একটু এগিয়ে গেলে, পরবর্তী পথের নির্দেশ কেউ না কেউ দিয়ে দেয়। আসলে আন্তরিক ভাবে চেষ্টা যদি কেউ করে, তাহলে নির্দেশ দেবার লোকের অভাব হয় না। কারণ তিনিই গুরুরূপে সকলের অন্তরে রয়েছেন, সকল প্রশ্নের নিরসন তিনিই করছেন।

তারপর বলছেন, 'তোমার সময় হয়েছে। পাখী ডিম ফুটোবার সময় না হ'লে ডিম ফুটায় না। যে ঘর বলেছি; তোমার সেই ঘরই বটে।' ঘর মানে? কিরূপ ভাব নিয়ে তিনি সাধন করবেন, সেইরূপ ভাবটি তাঁর ঘর।

তপস্যা কতখানি করতে হবে এই প্রসঙ্গে বলছেন, 'সকলেরই যে বেশী তপস্যা করতে হয়, তা নয়। আমায় কিন্তু বড় কষ্ট করতে হ'য়েছিল।' ঠাকুরকে এত কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছিল কেন? না, অবতার আসেন দৃষ্টান্ত দেখাতে। তিনি সকলকে এমন দৃষ্টান্ত দেখিয়ে যান যার আংশিক অনুষ্ঠান করেও তাদের জীবন সার্থক হতে পারে।

মাষ্টারমশাই এরপর নিজের সম্বন্ধে বলছেন, তিনি কলেজে পড়াশুনা করেছেন, বিবাহাদি করেছেন। পূর্বে কেশব সেনের মত বড় বড় পণ্ডিতদের লেকচার শুনেছেন কিন্তু ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে শুধু তাঁর কথা শুনতেই ভাল লাগে। ঠাকুর বলেছেন, সাধন করলেই ঈশ্বরকে দেখা যায়। আর এই ঈশ্বর দর্শনই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা জীবন যাপন করি উদ্দেশ্য—বিহীন ভাবে। শুধু খাওয়া পরা বংশবৃদ্ধি—এতেই জীবনের শেষ, যেন আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু এতো পশুজীবনের সদৃশ। মানুষের বুদ্ধি আছে, বিচার আছে। সেগুলিকে কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে? হয়তো কেউ ভাল ছাত্র হল, কি ভাল রোজগার করল, তারপর বিবাহাদি করে সুখে দুঃখে দিন কাটিয়ে দিল। এছাড়া আর উদ্দেশ্য আছে বলে মনেই হয় না। পাশ্চাত্য দেশে জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য খুঁজে না পাওয়ায় অনেক ধনী ঘরের

ছেলে হিপি হয়ে যাচ্ছে। যেটুকু চেষ্টা আছে তা শুধু বর্তমান দুঃখকে এড়াবার জন্য। এইভাবে উদ্দেশ্যবিহীন পথে চলতে চলতে চরম ব্যর্থতা মানুষকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে। ঠাকুর তাই বলেছেন, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানলাভ। একটা উদ্দেশ্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হয়, লক্ষ্যহীন হলে শুধু ঘুরে মরা ছাড়া আর কোন গতি নেই।

আমরা ঠিক এইরকমই একটি কথা শুনেছি স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের কাছে। তিনি বলতেন, দেখ, ব্রাহ্মণের শরীর কেবল তপস্যার জন্য। তপস্যা কথাটির উপর খুব জোর দিতেন। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেই ব্রাহ্মণ শরীর হয় না। ব্রাহ্মণত্বের গুণ,-ব্রাহ্মণ পদবীতে উন্নীত হবার মতো সাধনার উপযোগী যে শরীর তাকে বলছেন ব্রাহ্মণ শরীর। এই ব্রাহ্মণ শরীরের উদ্দেশ্য ভগবানলাভের জন্য সাধনা করা। এরপর ঠাকুর মাস্টারমশাইকে একাদশী করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আমরা যেন না ভাবি ঠাকুর আমাদেরও সকলকে করতে বলেছেন। তাঁর বিশেষ বিশেষ উপদেশ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত, সকলের জন্য বাধ্যতামূলক আদেশ তিনি করেননি।

তাঁর চিহ্নিত ভক্তদের প্রসঙ্গে বলছেন, সাক্ষাৎভাবে এইসব ভক্তদের দেখার আগেই তিনি ভাবচক্ষে তাঁদের এবং তাঁদের পরিবেশটি পর্যন্ত দেখেছেন। আবার বলছেন, এই সাদা চোখেই গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গদের দেখেছিলেন। বলাবাহুল্য, তাঁর সাদা চোখ, সাধারণের চোখ নয়। এ দৃষ্টি মায়িক নয়, মায়ার অতীত সে দৃষ্টি। সাদা চোখেই সব দর্শন হত, এখন তো ভাবে হয়। কারণ তাঁকে সকলের সঙ্গে চলতে হয় মনকে আচ্ছাদিত করে। সব সময় উঁচু সুরে মন বাঁধা থাকলে জগতের সকলের সম্পর্কে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হোত না। তাই দৃষ্টিকে নিজেই যেন নামিয়ে রেখেছেন। গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে মাস্টারমশাইকে দেখেছিলেন। সেই কথাও বললেন।

ভক্তের জন্য ভগবানের ব্যাকুলতা

শুদ্ধ ভক্তদের জন্য তাঁর প্রাণ কিরকম কাঁদত সেই প্রসঙ্গে বলছেন, 'মাকে কেঁদে কেঁদে বলতাম, মা! ভক্তদের জন্যে আমার প্রাণ যায়, তাঁদের শীঘ্র আমায় এনে দে।' নানাভাবে নানান জায়গায় এই ভক্তদের জন্য তাঁর ব্যাকুলতার কথা বলেছেন। আসলে তাঁর শুদ্ধ মন সংসারের কলুষের ভিতরে বেশীক্ষণ আটকে থাকতে পারত না। সংসারের দিকে মনটা নামিয়ে রাখার জন্য এইসব শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদের বড় প্রয়োজন ছিল। এঁরা ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ, আপনার জন। এঁদের সঙ্গে তিনি আনন্দ করতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনীতে আছে, শেষের দিকে তাঁর মন এত ভাবপ্রবণ হয়ে গিয়েছিল যে, সে সময় অন্য ভাবের লোককে তাঁর কাছে যেতে পর্যন্ত দেওয়া হত না, তাতে তাঁর কষ্ট হত। সেজন্য ভক্তেরা তাঁকে সর্বদা ঘিরে রাখতেন যাতে তিনি তাঁদের সঙ্গে পরম তত্ত্বকে আস্বাদন করতে পারেন।

ভক্তের বোঝা ভগবান বয়

নিজের জীবনের পুরনো দিনের ঘটনা বলতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, 'পঞ্চবটীতে তুলসীকানন করেছিলাম; জপধ্যান করবো ব'লে।' তা বেড়া দেবার জিনিসগুলি আপনিই জোয়ারের জলে এসে হাজির হল। মায়ের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলেন তাই যখন যা মনে করেছেন তাই ঘটে গিয়েছে। মথুরবাবুকে রসদদার হিসাবে পেয়েছিলেন একথাও বহু জায়গায় তিনি বলেছেন। মথুরবাবু প্রাণ দিয়ে ঠাকুরের সেবা করেছেন। ঠাকুরের জন্য সোনার থালা বাটি করিয়ে দিয়েছিলেন। ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যিনি ত্যাগীর বাদশা, ধাতু স্পর্শমাত্র একদা যাঁর শরীরে যন্ত্রণা হত, তিনিই আবার অন্যসময়ে সোনার থালা ব্যবহার করেছেন। এ হল ভাবের ব্যাপার। যখন যে ভাবে থাকতেন, সেই-

ভাবেরই চরম আদর্শ দেখিয়েছেন। স্ত্রীভাবে রয়েছেন তো ষোল-আনাই স্ত্রীভাব, কোনো কৃত্রিমতা নেই। আবার অন্যভাবে যখন রয়েছেন তখন মেয়েদের থেকে দূরে থাকতেন এবং অপরকেও দূরে থাকবার নির্দেশ দিতেন। এটা স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করার উদ্দেশ্যে নয়, সাধনপথে পুরুষদের সাবধান করার জন্য। আবার অন্যদিকও আছে, পুরুষদের থেকে মেয়েদের সাবধান করে দিচ্ছেন। অন্য এক জায়গায় বলছেন, যত পুরুষ সব জানবে রাম আর যত স্ত্রী আছে সব জানবে সীতা। শ্রীশ্রীমা-ও তাঁর সন্তানদের বলতেন, বাবা একটু দূরত্ব রাখতে হয়, এটি মেয়ের শরীর কিনা। সুতরাং ব্যবধান মানে অবজ্ঞা নয়, সাধনের জন্য এটুকু প্রয়োজন।

ঠাকুরের সাধনস্থলের মাহাত্ম্য

মাস্টারমশাই ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। মন জানার জন্য ঠাকুর বলছেন, 'দেখ, একদিন দেখি—কালীঘর থেকে পঞ্চবটী পর্যন্ত এক অদ্ভুত মূর্তি। এ তোমার বিশ্বাস হয়?' মাস্টার মশাই-এর আগে বিশ্বাস ছিল না কিন্তু এখন ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে ভাবছেন, এত যখন দেখছি তখন আর বিশ্বাস না হয়ে উপায় কি? তবে সেকথা না বলে নিরুত্তর রইলেন। পঞ্চবটীর শাখা থেকে দু'একটি পাতা নিয়ে রাখতে রাখতে মাস্টারমশাই বলছেন, এই গাছের ডাল বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছি। ঠাকুর বলছেন, 'এই ডাল প'ড়ে গেছে, দেখছ; এর নীচে বসতাম'। লীলাপ্রসঙ্গে উল্লেখ আছে, বোধহয় এই আসনে বসবার উপযুক্ত এমন কেউ আর নেই বলে ওভাবে ডালটি ভেঙে গিয়ে আসনটি ঢাকা হয়ে গিয়েছে। মাস্টার মশাই যখন বলছেন, এই স্থানটি একদিন মহাতীর্থ হবে, তখন তার উত্তরে ঠাকুর হেসে বলছেন, 'কিরকম তীর্থ? কি, পেনেটীর মত?' পেনেটীতে ঠাকুর নিজে যেতেন এবং কীর্তনানন্দ করতেন।

ধর্মগ্রন্থের সারগ্রহণ

এরপর ভক্তমাল পাঠ হচ্ছে। এখানে সুন্দর ভক্তির কথা আছে কিন্তু কেবল কৃষ্ণভক্তি ছাড়া অন্য কিছু নেই, এবং অন্যমতের নিন্দাও করা হয়েছে। আমরা অল্প বয়সে চৈতন্যচরিতামৃত পড়তে শুরু করে দেখি এক জায়গায় বলছেন, 'গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর, শঙ্কর কিংকর।' শুনে এত বিরক্তি বোধ হল যে বই বন্ধ করে ভেবেছি এ বই আর পড়ব না। পরে ঠাকুরের ভাবের সঙ্গে পরিচিত হবার পর সেই গ্রন্থের তাৎপর্য খানিকটা বুঝতে সক্ষম হলাম। ধর্মগ্রন্থে গোঁড়ামী থাকলেও সেগুলিকে ঘুরিয়ে অন্যরকম অর্থ করে নিতে হয়। গোঁড়ামীটুকু নেব কেন ; ভাবটুকু নেব। ঠাকুর কেশব সেনকে বলেছিলেন, রাধাকৃষ্ণ না-ই মান সেই টানটুকু নাও। আসল কথা হচ্ছে কি করে তাঁর জন্য মনপ্রাণ ব্যাকুল হবে যাতে সব তাঁকে উৎসর্গ করা যায়—এই ভাবটি গ্রহণ করা। এইটি করতে পারলে জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। ঠাকুর একদশীভাব পছন্দ করতেন না কিন্তু এছাড়া যে ভাবটুকু আছে তার প্রশংসা করছেন। এমনি বাইবেলের কথায় বলছেন, ভগবানে ভক্তি—এ খুব ভাল কথা তবে ওতে বড় 'পাপ পাপ' আছে। যেটুকু পছন্দ করছেন না তা স্পষ্ট করে বলছেন, আবার যেটুকু ভাবের পরিপোষক তার প্রশংসাও করছেন। তাই বলছেন যে ধমে বা যে পরিবেশেই হোক তার থেকে যদি আমার ভাবের পরিপুষ্টি হয় তবে সেখানে কেন আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব না ? এরকম উদার দৃষ্টি ঠাকুর আমাদের সকলের কাছ থেকেই চাইছেন।

মাস্টারমশাইকে পথপ্রদর্শন

পরবর্তী পরিচ্ছেদেও মাস্টারমশাই নিজের মনের ভিতরে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে যে চিন্তা উঠেছে সেগুলি সংক্ষেপে বলছেন। তিনি ঠাকুরের কাছে বাস করছেন তাই তাঁর মন এখন খুব বৈরাগ্যপ্রবণ হয়েছে, তিনি

জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করছেন। এই জগতের কর্তা কে? আর আমিই বা কে? তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক এ না জানলে জীবনটাই যেন বৃথা। পৃথিবীতে জন্মে শুধু জীবনযাপন করলাম—এই কি সব? কি করলে আমাদের জীবনে সার্থকতা লাভ হবে—এই প্রশ্ন তাঁর মনকে আলোড়িত করছে।

আবার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাবছেন, ইনি পুরুষশ্রেষ্ঠ। তখনও ঈশ্বরাবতার বলে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু এইটুকু বেশ বোঝা যায় যে তিনি একজন অসাধারণ ভগবৎ প্রেমিক।

সাত

২. ১২. ১৮৮৩

এই অধ্যায়ের বর্ণনীয় দিনটি অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তি। মাস্টারমশাই ঠাকুরকে প্রণাম করায় ঠাকুর বলছেন, 'আজ বেশ দিন।' তিথি হিসাবেও ভাল এবং মাস্টারমশাই একটি শুভ সংকল্প নিয়ে এসেছেন তাই ভাল দিন। ঠাকুরের কাছে থেকে মাস্টারমশাই কিছুদিন সাধন করবেন। ঠাকুর বলেছেন, সাধন আরম্ভ করলে ক্রমশ কোন পথে এগোতে হবে তা অন্তর থেকে তিনিই বলে দেন। সাধু ও কাঙালদের জন্য নির্ধারিত অতিথিশালার অন্নগ্রহণ করতে ঠাকুর মাস্টারমশাইকে নিষেধ করেছেন, তাই তিনি সঙ্গে একজন লোক এনেছেন। ঠাকুরও তাঁর সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।

কর্ম করার প্রসঙ্গে ঠাকুর বলছেন, 'কর্ম যে বরাবরই ক'রতে হয়, তা

নয়। ঈশ্বর লাভ হ'লে আর কর্ম থাকে না। ফল হ'লে ফুল আপনিই ঝরে যায়।' সেইরকম কর্ম করতে করতে যখন মানুষ শুদ্ধ হয়ে যায় তখন আর কর্মের প্রয়োজন থাকে না। বলছেন, কখন এই প্রয়োজন ফুরবে? না, যখন হরিনামে কি রামনামে পুলক হবে, তখন আর সন্ধ্যাদি কর্মের প্রয়োজন থাকে না। রামপ্রসাদের গানে আছে, 'ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়? সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায়।' তখন আব সন্ধ্যা বন্দনার দরকার হয় না।

কোন কর্ম ভাল এই প্রসঙ্গে বলছেন, সকাম কর্ম ভাল নয়। বলছেন, যে কর্ম ভগবানের দিকে নিয়ে যাবে সেই কর্মই ভাল এবং যে কর্ম ভগবান থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তাই মন্দ কর্ম। ভালমন্দ বিচারের এই একটিই মানদণ্ড।

কেশব সেনের প্রসঙ্গ তুলে একজন ভক্ত বলছেন, কেশব সেন রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। এই নিয়ে তখনকার দিনে ব্রাহ্মসমাজে তাঁকে খুব নিন্দা করা হয়েছিল। কিন্তু ঠাকুর কেশবের নিন্দা সহ্য করতে না পেরে বলছেন, 'যে ঠিক ভক্ত, সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন।' অর্থাৎ কেশব ঠিক ভক্ত তাই তার এরকম অনুকূল পরিবেশ স্বয়ং পরমেশ্বরই সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

এরপর আচার নিয়মের প্রসঙ্গে বলছেন, 'মানুষের ভিতর যতক্ষণ কামনা থাকে ততক্ষণই এই আচার নিয়মগুলি প্রয়োজন। সদ্‌ব্রাহ্মণ যার কোন কামনা নাই, সে হাড়ীর বাড়ীর সিধে নিতে পারে।' তাতে তার দোষ হয় না।

সংসারে কিরকম করে থাকতে হবে, এই প্রশ্নের উত্তর কথামৃতে বহু জায়গায় আছে এবং বহুবার আলোচিত হয়েছে। ঠাকুর বলেছেন 'পাঁকাল মাছের মত থাকবে'। অর্থাৎ অনাসক্ত হয়ে থাকলে গায়ে সংসারের মালিন্য লাগে না। তবে আগে অনাসক্তির অভ্যাস করতে

হয়। নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করতে হয়। ভগবানে ভক্তি এলে তবে অনাসক্ত হওয়া যায়। তাই সংসারে প্রবেশের আগে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়।

স্ত্রীজাতি আত্মাশক্তির অংশ

মাস্টারমশাই সাধন করতে এসেছেন, তাই তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য বলছেন, তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার ত্যাগ হয়ে যায়। আসলে কামিনী কাঞ্চনই মায়া। এই মায়াকে যতক্ষণ না চেনা যায়, ততক্ষণই তিনি আমাদের ঘোরান। চিনে নিতে পারলে মায়া তখন লজ্জায় পালায়। কামিনী কাঞ্চনের স্বরূপ বুঝতে পারলে এরা আর অভিভূত করতে পারে না। সাধনের সময় এই কামিনী কাঞ্চনকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়, তবে ঘৃণা করে নয়, দৃষ্টিভঙ্গির একটু পরিবর্তন আনতে হবে। জগতের সকল স্ত্রীজাতিকে আত্মাশক্তির অংশ বলে মনে করতে হবে। আবার 'মনে করলেই ত্যাগ করা যায় না। প্রারব্ধ সংস্কার এ সব আবার আছে।' আর একটি কথা বিশেষ করে মনে রাখবার যে, আমরা নিজেরাই নিজেদের বন্ধন সৃষ্টি করি। বন্ধন অপরে সৃষ্টি করে দেয় না। তাই একজনের কাছে যে পরিবেশ প্রতিকূল মনে হচ্ছে সেই পরিবেশই অন্যজনের কাছে অনুকূল বোধ হয়। মনের প্রতিক্রিয়ার উপর তা নির্ভর করে।

প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুর কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কথা তুললেন। এ পথকে সাধনপথ বলে স্বীকার করলেও তিনি নিজের সন্তানদের নিষেধ করেছেন এ পথে আসতে। তিনি বলেন, ও পথ বড় নোংরা পথ, প্রায়ই পতন হয়। মাতৃভাব বড় শুদ্ধ ভাব। তবে সে সম্পর্কেও সাবধান করে দিচ্ছেন।—বলছেন, সেখানে বেশী যাসনে পড়ে যাবি। সুতরাং বার বার বলেছেন, 'সাধু সাবধান।'

বাস্তবিক সাধনের পর্যায়ে কত সতর্কতা দরকার তা সাধন পথের পথিক মাত্রই জানেন। বারবার নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়। ঠাকুর বলেছেন, সব জলই যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমন সব পথই সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। যে পথ পরিশেষে মঙ্গল এনে দেবে, সেই পথই গ্রহণ করা ভাল।

সাধনার প্রাথমিক স্তর—প্রতিমাপূজা

এরপর ঠাকুর প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে বললেন। ঠাকুরের কাছে আগত শিক্ষক মহাশয় হয়তো প্রশ্ন করেছেন, প্রতিমা পূজা করা ভাল কিনা। উত্তরে ঠাকুর বলছেন, প্রতিমার ভিতরেও তিনি আছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, ছোট মেয়েরা পুতুল খেলা করে, কিন্তু যখন নিজেদের সংসার শুরু হয়ে যায় তখন পুতুলগুলিকে প্যাটরায় তুলে রেখে দেয়। তাই ঈশ্বরলাভ হয়ে গেলে তখন আর প্রতিমা পূজার দরকার হয় না! তুলসীদাসের একটি দোঁহায় আছে, 'তুলসি, জপতপ করিয়ে সব গুঁড়িয়াকে খেল, প্রিয়াসে যব মিলন হো তো রাখ্ পেটারী মেল'—হে তুলসি, জপতপ যা কর, এগুলি পুতুল খেলা। যখন স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন মেয়েরা পুতুলগুলিকে তুলে রাখে। সেরকম ভগবানের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় তখন আর প্রতিমার প্রয়োজন হয় না। যিনি নিরাকার নির্গুণ, তাঁকে আমরা কল্পনা করতে পারি না। তাই একটি আধারের দরকার হয়। তাই প্রতিমায় তাঁকে চিন্তা করে তাঁরই পূজা করে থাকি।

পরবর্তী স্তর—বিশ্বাস, অনুরাগ ও তীব্র ব্যাকুলতা

তারপর মাস্টারমশাইকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'অনুরাগ হলে ঈশ্বরলাভ হয়। খুব ব্যাকুলতা চাই। খুব ব্যাকুলতা হলে সমস্ত মন তাঁতে গত

হয়।' মাস্টারমশাই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে থেকে সাধন করবেন তাই ঠাকুর তাঁর বৈরাগ্যকে উদ্দীপিত করবার জন্য এই অনুরাগের প্রসঙ্গ করছেন।

এরপর বিশ্বাসের কথায় বলছেন, বিশ্বাসের জোরে বিধবা বালিকা স্বয়ং গোবিন্দকে স্বামীরূপে সাক্ষাৎ করেছে। তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, 'জটিল' বালক মধুসূদন দাদার সাক্ষাৎ পেয়েছে এই সরল বিশ্বাসের বলে। আর ব্রাহ্মণের ছোট ছেলেটির আকুল ক্রন্দনে ঠাকুর না এসে পারেননি। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করে তাঁর স্বরূপকে বোঝা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের সরল বিশ্বাসের উপর কতকটা নির্ভর করতেই হয়। তিনি আছেন, এই বিশ্বাস নিয়ে যদি তাঁকে চিন্তা করা যায় তাহলে তাঁর দর্শন লাভ হয়। 'অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাব প্রসীদতি'—অর্থাৎ যে 'অস্তি' এইরূপে তাঁকে জানে, তাঁর স্বরূপ তার কাছে প্রকাশিত হয়। বিশ্বাসের জোরে কত অসাধ্যসাধন সম্ভবপর হয় ঠাকুর তার প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

মাস্টারমশাই-এর প্রকৃতি ছিল কবিসুলভ। তাই দক্ষিণেশ্বরে থাকবার সময় নহবতের উপরের ঘরখানি পছন্দ করলেন কিন্তু ঠাকুর দেখছেন কোন স্থানের মাহাত্ম্য বেশী। যেখানে ভগবানের নাম হয় সেখানকার স্থানমাহাত্ম্য বেশী। তাই বললেন, পঞ্চবটীর ঘরে অনেক হরিনাম, ঈশ্বরচিন্তা হয়েছে, তাই সাধনের পক্ষে বেশী উপযোগী।

সাধনের প্রসঙ্গেই বলছেন, 'কথাটা এই—তাঁকে ভক্তি করা, তাঁকে ভালবাসা।' সাধারণত সাধন বলতে আমরা নানারকম অনুষ্ঠানাদি, জপ তপ ইত্যাদি বুঝি। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, সাধন মানে হচ্ছে তাঁকে ভালবাসা। এই সমস্ত জপ-ধ্যান কৃচ্ছ্র-সাধনের ফলে যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে তবেই এগুলি সার্থক, তা নাহলে এসব ভস্মে ঘি ঢালার মতো হয়ে দাঁড়ায়। একেবারে হয়তো বৃথা যায় না কিন্তু এগুলি সার্থক

হলে যে ফল পাওয়া যেত তা আর পাওয়া যায় না। ভালবাসা এলে ভগবানের দর্শনও গৌণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই ভালবাসা বা অনুরাগ না এলে তাঁকে আপনার বলে বোধও হয় না এবং তিনি দর্শন দিলেও সে দর্শনের আনন্দ উপলব্ধি করা যায় না।

তাই বলছেন, তাঁর জন্য তীব্র ব্যাকুলতা দরকার। তাঁকে অন্তর দিয়ে চাওয়াটাই বড় কথা। কথায় বলে, পাওয়ার চেয়ে চাওয়া বড়। বৈষ্ণব সাধকেরা, যাঁরা খুব বৈরাগ্যবান, তাঁরা কীর্তনের সময় মাথুর শোনেন, মিলন শোনেন না। কারণ ভগবানের জন্য ঐ বিরহ আকুল ভাবটি অন্তরে জাগিয়ে রাখতে চান, সেটিকে পুষ্ট করতে চান। সাধনের রহস্যই এইখানে যে, অন্তরের সঙ্গে তাঁকে চাইতে হবে। একটি গানে আছে—'এই হরিনাম নিতে নিতে, প্রেমের মুকুল ফুটবে চিতে'—অর্থাৎ ভগবানের নাম করতে করতে অন্তরে তাঁর প্রতি প্রেমের উন্মেষ হবে। ভাগবতে আছে, 'ভক্ত্যাঃ সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্'—ভক্তির দ্বারা ভক্তি উৎপন্ন হবে, তখন সেই ভক্তির লক্ষণ, শাস্ত্রের কথিত সাত্ত্বিক বিকারগুলি—প্রেম, রোমাঞ্চ স্বেদ পুলক অশ্রু আদি—সব দেখা যাবে। ঠাকুর বলছেন, অনুরাগ হলে বুঝতে হবে অরুণোদয়ের আর দেরী নেই।

(একটি গানে আছে, 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না')—গানটি শুনে একদিন মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন, চিরদিন কি তাঁকে আমরা চেয়েছি যে চিরদিন তাঁর দেখা পাব? যদি তাঁর দর্শন মুহূর্তের জন্যও পাওয়া যায় তাতেই আমাদের হৃদয়মন ভরে যায়। ছোট শিশুর যেমন মা ছাড়া চলে না তেমনি করে যখন আমরা তাঁকে চাইব, অর্থাৎ তিনি যখন আমাদের কাছে একেবারে অপরিহার্য হয়ে উঠবেন, তখন তিনি কি আর দূরে থাকতে পারেন? সাধনের এই তাৎপর্যটুকু বুঝতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ আসছেন, গোপীরা একদৃষ্টিতে তাঁকে

দেখছেন আর বলছেন, নির্বোধ বিধাতা আমাদের চোখের পলক সৃষ্টি করেছেন। এই পলকটুকুর বিরহ তাঁরা সহ্য করতে পারছেন না। ভাগবতে আছে—'ক্রটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্' এক নিমেষকে তাঁদের এক যুগ বলে মনে হচ্ছে 'নিমিখে মানয়ে যুগ।'

এইরকম তীব্র অনুরাগ চাই। মীরা তাঁর গানে বলছেন, 'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।' প্রেম বিনা সেই ভগবানকে পাওয়া যায় না। ঠাকুর তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাচ্ছেন, জগন্মাতার জন্য কি সকাতর আর্তি, কি করুণ কান্না। মুখ ঘসড়াচ্ছেন মাটিতে, রক্ত বেরচ্ছে মুখ দিয়ে, আর মা মা করে কাঁদছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনেও অনুরূপ অবস্থার বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্য আছাড় পিছাড় করে কত তাঁর আর্তি—এইগুলি সব দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য যে কিরকম ব্যাকুলতা হলে ভগবানকে লাভ করা যায়। কিরূপ সাধনের দ্বারা আমরা সেই পরম বস্তু লাভ করব, কি আমাদের লক্ষ্য, তাঁরা জীবন দিয়ে তা দেখাচ্ছেন। অতএব যতক্ষণ না জপতপাদির দ্বারা ভগবানের প্রতি প্রেম জন্মায় ততক্ষণ সাধককে ভাবতে হবে তাঁর থেকে এখনও অনেক দূরে রয়েছি। এত জপধ্যান করলাম বলে মনে যেন সন্তোষ না আসে। আমাদের সাধনের প্রকৃত পরিণতির দিকে ঠাকুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

আট

১. ১৩. ১-৪

অবতারের জীবভাব ও দেবভাব

প্রাণকৃষ্ণের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলছেন, 'মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ।...পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।' একথাটি তিনি বহুবার বলেছেন। ব্রহ্ম—যিনি সমস্ত গুণ, সুখ দুঃখ, রোগশোকের অতীত তিনিই যখন আবার দেহধারণ করেন তখন জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি ইত্যাদি জীবধর্ম তাঁকে স্বীকার করতে হয়; তা না হলে অবতার হওয়া সার্থক হয় না। আবার তিনি ইচ্ছা করলে এই দেহধর্ম ছেড়ে দিতে পারেন। সাময়িকভাবে শরীরটা যেন তাঁকে আটকে রেখে দেহে কিছু আমিত্ব-বোধ এনে দেয়।

অবতারকে জানতে হলে তাঁর দুটি দিক ভাবতে হয়। একটি তাঁর ঈশ্বরত্ব, দেবভাব আর একটি জরাব্যাধির অধীনতা—জীবভাব। এটি কল্পনা নয়, সত্য। এই দেহধারণ করা যতখানি সত্য, দেহের ধর্মগুলি স্বীকার করাও ততখানি সত্য। তা না হলে সাধারণ মানুষের থেকে তিনি অনেক দূরে থেকে যান। তাই মানুষের কাছে এলে তাদেরই মতো হয়ে তাদের কাছে ধরা দেন। দেহধর্ম স্বীকার করে এলেও সেই সঙ্গে তাঁর দেবভাবও পূর্ণমাত্রায় থাকে। আবার কখনও কখনও তাও বিস্মৃত হন। রামচন্দ্র সীতার শোকে আকুল হয়েছিলেন। ঠাকুরও অক্ষয়ের মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করে বলেছিলেন, যখন অক্ষয়ের মৃত্যু হল, দেখলাম যেন খাপের ভিতর থেকে তলোয়ারটা বের করে নেওয়া হল। দেহটা পড়ে রইল, প্রাণহীন আত্মা তার থেকে বিযুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু

তারপরই বলছেন, বুকের ভিতরে যেন গামছা নিঙড়োচ্ছে। এই বেদনা হল জীবধর্ম, অবতার এটিকে অস্বীকার করেন না।

অনাহত ধ্বনি

তারপর অনাহত শব্দের প্রসঙ্গ উঠল। প্রত্যেক শব্দের উৎপত্তির মূলে থাকে কোনো না কোনো আঘাত। অনাহত শব্দের অর্থ হল যে শব্দ আঘাত থেকে উৎপন্ন নয়। অনাহত ধ্বনি বলতে শাস্ত্র বলছেন, এই জগৎটার যে সূক্ষ্মরূপ সেটি হল যেন নাম বা শব্দ। সমস্ত বস্তুর নামের একটা অব্যক্ত স্বরূপ, সেটি অনাহত ধ্বনি। যে স্বরূপ থেকে পরে জগতের বিভিন্ন বস্তুর নাম ও রূপ ক্রমশ পরিস্ফুট হবে। এ ধ্বনি যেন ব্রহ্মের অবিভক্ত রূপ। তাঁর জগৎ রূপে নিজেকে বিভক্ত করার আগে জগতের যে কারণ বা বীজরূপ—সেই রূপটিকে বলে অনাহত রূপ। বলা হয়, যোগীরা অলৌকিক যোগশক্তির বলে এই ধ্বনি শুনতে পান। একেই প্রণব ধ্বনি বলা হয়। প্রণব মানেই হচ্ছে জগতের সূক্ষ্ম আদি রূপ যার থেকে জগতের সমস্ত নাম ও রূপের প্রকাশ। পঞ্চভূতাদি এমনকি তন্মাত্রাদি আবিষ্কারের অনেক পূর্বে ব্রহ্মের যে অব্যক্ত রূপ তাকে আর একদিক দিয়ে অনাহত বলা হয়েছে।

পরলোক প্রসঙ্গে

প্রাণকৃষ্ণের 'পরলোক কি রকম' প্রশ্নের উত্তরে পরলোকের বিশদ ব্যাখ্যা না করে ঠাকুর তার তাত্ত্বিক স্বরূপটি বললেন। মানুষ যে শুদ্ধ আত্মা এই বোধ না হওয়া পর্যন্ত তাকে বার বার দেহধারণ করে আসতে হয় কারণ কর্মের পুটুলী তাকে সর্বদা দেহধারণ করতে নিযুক্ত করে। আমি কর্তা—এই অভিমান চলে গেলে আর আসতে হয় না। শাস্ত্রে আছে, যে যেমন কর্ম বা সাধনা করে তার সেইরকম দেহধারণ হয়।

'যথা কর্মং তথা শ্রুতম্' এই পরম্পরা চলে এলেও মানুষের সংশয় যায় না। কারণ মৃত্যুর পরে কি হয় তা ইহজন্মে কখনও অনুভব হয় না। উপনিষদে নচিকেতাও এই প্রশ্ন করছেন—

'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। কঠ ১. ১. ২০

—এই সংশয় মানুষের এবং দেবতাদেরও ছিল।

'দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ। কঠ ১. ১. ২১

এ সংশয় চিরন্তন। নিজের স্বরূপকে না জানা পর্যন্ত এ সংশয় থেকেই যাবে। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, কাঁচা হাঁড়ি ভাঙলে আবার কুমোরের হাতে পড়তে হয়, কিন্তু পাকা হাঁড়ি ভাঙলে আর কাজে লাগে না। তেমনি যতক্ষণ আত্মজ্ঞান লাভ না হয় ততক্ষণ জীবকে সংসারে বার বার আসতে হয় কিন্তু জ্ঞানলাভের পর আর দেহধারণ করতে হয় না। যেমন সিদ্ধ ধান পুতলে গাছ হয় না।

পরলোক বিষয়ে জ্ঞানের দিক দিয়ে বিচারের পর ঠাকুর পুরাণের মত বলছেন সরা ও সূর্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে। দেহটি সরা, তার ভিতর মন বুদ্ধি অহঙ্কাররূপ জলে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ছে, তাতে মানুষকে চেতনরূপ দেখাচ্ছে। আসল চৈতন্য হচ্ছে এক ঈশ্বরের চৈতন্য। বিভিন্ন দেহেন্দ্রিয়তে বহুধা বিভক্ত হয়ে তিনি প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন বলে তাঁর বিভিন্নরূপ দেখা যাচ্ছে। ভক্তের দৃষ্টিতেও এই বিভিন্নতা রয়েছে। পার্থক্য এইখানে যে, ভক্তের দৃষ্টিতে এগুলি সত্য, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে এগুলি মিথ্যা, কল্পনা মাত্র। সমুদ্রের জলে লাঠি পড়লে দ্বিধাবিভক্ত দেখা যায়, আসলে কিন্তু বিভক্ত নয়। তেমনি ঈশ্বর ও জগৎ এই দুটিকে পৃথকরূপে দেখছি মায়ারূপ লাঠির জন্য। 'অহং' লাঠিটি তুলে ফেললে জগৎ জীব ব্রহ্ম এক।

জ্ঞানীর লক্ষণ

তারপর জ্ঞানীর লক্ষণ কি—এই প্রসঙ্গে বলছেন, জ্ঞানী কারো অনিষ্ট করতে পারে না। গীতায় বলা হয়েছে,

'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃকরুণ এব চ।' (১২।১৩)

জ্ঞানী সর্বভূতের প্রতি দ্বেষরহিত মিত্রভাবাপন্ন ও দয়াবান। জ্ঞানী মানে যাঁর সর্বভূতে একাত্মবোধ হয়েছে।

বলছেন, জ্ঞানীর কোন বিষয়ে আঁট থাকে না, বালকের মত মমত্ব-বুদ্ধিহীন, নির্লিপ্ত। লোকে ঐশ্বর্যের জন্য উন্মত্ত হয়, জ্ঞানী তাকে তুচ্ছ করেন। এ হিসাবে তাঁকে উন্মাদ বলা হয়। আর শুচি অশুচি ভেদ জ্ঞান নেই বলে তাঁকে পিশাচ বলা হয়।

জ্ঞানীর অবস্থার কথা বলতে গিয়ে কাঠুরের স্বপ্নে রাজা হওয়ার গল্প বললেন। স্বপ্নে রাজা হওয়া যেমন সত্য, বাস্তবে কাঠুরে হওয়াও তেমন সত্য। অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে জ্ঞানীর পারমার্থিক দৃষ্টিতে কোনও পার্থক্য থাকে না, এইদিক দিয়ে দুটোই মিথ্যা।

এরপর বিজ্ঞানীর অবস্থা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলছেন, যে দুধের কথা শুনেছে সে অজ্ঞান, যে দেখেছে সে জ্ঞানী আর যে দুধ খেয়ে বলবান হয়েছে, যার অনুভব হয়েছে, সে বিজ্ঞানী। জ্ঞানের দ্বারা যাঁর সমস্ত জীবনটা সম্পূর্ণ প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তাঁকেই বলছেন বিজ্ঞানী। জগতের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও তিনি এক পরম সত্তাকে উপলব্ধি করেন।

সেই স্তরে যেতে গেলে প্রথমে নেতি-নেতি—এ নয়, এ নয় করতে হয়—ছাদে উঠতে গেলে প্রথমে সিঁড়ির ধাপগুলিকে ছেড়ে ছেড়ে যেতে হয়। কিন্তু ছাদে উঠে গিয়ে দেখা যায় যা দিয়ে সিঁড়ি তৈরী তাই দিয়েই ছাদ তৈরী। 'ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্বম্'—যা কিছু জগতে দেখছি সব তিনি। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই যে জ্ঞান, এরই নাম বিজ্ঞান।

তিনি ইচ্ছা করলে স্থূল বা সূক্ষ্ম দুই-ই হতে পারেন। এই জিনিসটি

স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝা যায়। স্বপ্নে কোনো বস্তু নেই আবার নদী গিরি নগরী সবই দেখা যায়, ঘুম ভাঙলে কিছুই থাকে না। স্বপ্ন মানে মনেরই বিভিন্ন বৃত্তির প্রকাশ। সূক্ষ্ম বস্তু আমাদের কাছে স্থূলরূপ নেয়। সেইরকম ব্রহ্মবস্তুটি জেগে থাকা রূপ জগতে স্থূলরূপ নিয়েছে। সুতরাং তাঁর পক্ষে স্থূল হওয়া যে অসম্ভব তা নয়। একে তাঁর ঐন্দ্রজালিক শক্তি বলি। তিনি এক হয়েও বহু হয়েছেন। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া অসম্ভবকেও সম্ভব করে। ভগবানের এই অচিন্ত্যশক্তিকেই আমরা মায়া বলি, তাঁরই প্রভাবে এই জগৎ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি। এই হচ্ছে বিজ্ঞানীর অনুভূতির কথা।

ব্রহ্মদর্শন ও দিব্যচক্ষু

জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর প্রসঙ্গে প্রাণকৃষ্ণকে ঠাকুর বলেছেন, বিজ্ঞানী সর্বত্রই ব্রহ্মদর্শন করেন। সুতরাং তিনি আর কি ত্যাগ করবেন! জ্ঞানলাভের পর শ্রীরামচন্দ্র সংসার ত্যাগ করতে চাইলে বশিষ্ঠ বললেন, রাম সংসার যদি ঈশ্বর ছাড়া হয়, তাহলে তুমি ত্যাগ করতে পার। রাম বুঝলেন, সর্বত্রই সেই একই ব্রহ্ম পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সুতরাং সংসার ত্যাগ করা হল না।

(আসল কথা হচ্ছে দিব্যচক্ষু চাই। মন শুদ্ধ হলে সেই চক্ষু হয়। চোখটা হচ্ছে যন্ত্র, আসলে কাজ করে মন। শুদ্ধ হলে, দেখাটাও শুদ্ধ হয় অর্থাৎ সর্বত্র সেই ব্রহ্মসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারা যায়। সুতরাং দিব্যচক্ষু মানে কোন অলৌকিক চক্ষু নয়—শুদ্ধ মন হওয়া। 'তবে সাধন চাই'। তাই মুখে হাজার বার 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—আওড়ালেও দৃষ্টি শুদ্ধ হয় না। মনকে শুদ্ধ করতে সাধন দরকার।)

গৃহীর ত্যাগ ও সন্ন্যাসীর ত্যাগ

এরপর সংসারেও যে সুবিধা আছে সেই প্রসঙ্গে ঠাকুর বলছেন, সংসারে থাকলেও দোষ নেই। এখানে একটু আধটু ভোগ করলেও মানুষ চিরকালের জন্য পতিত হয় না। আবার সে ওঠে। তাই শুনে মাষ্টারমশাই ভাবছেন, সংসারী লোকেরা একেবারে পেরে উঠবে না তাই ঠাকুর হয়তো এইটুকু ছাড় দিচ্ছেন। স্বগত প্রশ্ন করছেন, সংসারে কি ষোল আনা ত্যাগ একেবারেই অসম্ভব? কিন্তু ঠাকুর কখনও অসম্ভব বলেননি বরং ষোলআনা ত্যাগই করতে বলেছেন। এর ভিতরে কোনো আপোস নেই। তবে (উত্থান পতনের ভিতর দিয়েই মানুষকে এগোতে হয়। সংসারীর ক্ষেত্রে স্থূলভাবে আর ত্যাগীর ক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে উত্থান পতন হচ্ছে। উত্থান পতন মনেই, স্থূল শরীরটা বড় কথা নয়। সংসারীব ক্ষেত্রে ত্যাগের আদর্শ থেকে যদি কেউ সামান্য ভ্রষ্ট হয় তবে তার চিরকালের জন্য বিচ্যুতি হয় না, আবার ওঠে। কিন্তু ত্যাগীর ক্ষেত্রে ত্যাগ চরম, সেখানে সামান্যতম আদর্শভ্রষ্ট হলে তাকে আর সেই পর্যায়ে রাখা চলে না। এখানে সূক্ষ্মস্তরে সংগ্রাম চালাতে হয়। গৃহস্থ আর ত্যাগীর মধ্যে এইটুকুই শুধু পার্থক্য। ভগবানলাভের অন্যতম পথ—সত্যনিষ্ঠা)।

এরপর ঠাকুর সত্যনিষ্ঠার কথা বলছেন। সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারলে, লক্ষ্যপথে এগোন সহজ হয়। লক্ষ্যের দিকে এগোতে গেলে নানা পথ আছে, সত্যও একটি পথ। বলছেন, সত্যকথার খুব আঁট চাই। আপাতদৃষ্টিতে এইটি সহজ পথ মনে হলেও যখন ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগ করতে যাই তখনই বুঝতে পারি এই সহজ পথটাই কত কঠিন। এজন্য কি বিরাট মূল্য দিতে হয় তা রাজা হরিশ্চন্দ্রের জীবনী থেকে বুঝতে পারা যায়। ঠাকুর বলছেন, আগে এত আঁট ছিল যে, যা বলে ফেলেছি তা মানতেই হবে, এখন একটু কমেছে। কিন্তু

সাধনাবস্থায় এত দৃঢ়তা চাই যে সাধারণ মানুষের কাছে মনে হবে যেন সেটা বাড়াবাড়ি। কিন্তু সাধন জগতে বাড়াবাড়ি বলে কিছু নেই। যা ধরব তাকে একেবারে পরিপূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করব, পালন করব—এই হল সাধনের নিয়ম।

এরপর পূর্ণজ্ঞানের প্রসঙ্গে বলছেন, 'বৈষ্ণবচরণ বলেছিল, মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বরদর্শন হবে তখন পূর্ণজ্ঞান হবে।' ঠাকুর নিজের পূর্ণ-জ্ঞানের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। এখন তিনি সর্বত্র নারায়ণ দর্শন করছেন। দেখছেন, সেই এক নারায়ণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে সর্বত্র বিরাজ করছেন।

মনে ত্যাগ কঠিন

প্রাণকৃষ্ণের কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথায় বলছেন, 'হাঁ, বড় ঝঞ্ঝাট। এখন দিনকতক নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করা খুব ভাল। কিন্তু তুমি বলছো বটে ছাড়বে। কাপ্তেনও ঐ কথা বলেছিল। সংসারী লোকেরা বলে, কিন্তু পেরে উঠে না।' লোকে ভাবে এইবার কাজ থেকে অবসর নেব, একমনে ভগবানের নাম করব, কিন্তু ছাড়ব বললেই ছাড়া যায় না, অবসর নেবার পরও অনেক সময় আবার একটা কাজ জুটিয়ে নেয়। জিজ্ঞাসা করলে বলে, কি করব, চুপ করে থাকতে পারি না। আসলে ভগবানকে নিয়ে থাকবে, তার জন্য মন এতদিন ধরে প্রস্তুত হয়নি, কাজেই বাহ্য কর্মের লোপ হলে কি হবে, মনের কর্মের লোপ হয় না।

এরপর পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্যের কথা বলছেন। বিবেক বৈরাগ্য না থাকলে পণ্ডিতে আর পশুতে পার্থক্য থাকে না। শঙ্করাচার্যের সূত্রেও আছে, বিবেকহীন পণ্ডিত আর পশুতে কোন পার্থক্য নেই।

মাষ্টারমশাই-র পরিবর্তন

এরপর মাষ্টারমশাই নিজের মনোভাব কিছু ব্যক্ত করছেন। তিনি

ব্রাহ্মভাবে ভাবিত ছিলেন, ভগবানের সাকার রূপ মানতেন না ; কিন্তু এখন ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে মাকে প্রণাম করেন কারণ ঠাকুর মাকে মানেন এবং মাকে প্রণাম করেন। 'দেখিলেন—বামহস্তদ্বয়ে নরমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয়। একদিকে ভয়ঙ্করা আর একদিকে মা ভক্তবৎসলা। দুইটি ভাবের সমাবেশ।' ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশব সেনও মাকে মেনেছেন এবং বলেছেন, 'ইনিই কি মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী'? মায়ের চিন্ময়ী সত্তাকে উপলব্ধি করতে হলে শুদ্ধ দৃষ্টি চাই, যে দৃষ্টি ঠাকুরের ছিল। আমরা যে মাকে প্রস্তর মূর্তিতে দর্শন করি সেটা আমাদের দৃষ্টির ত্রুটি। স্থূল জগতেও এইরকম পার্থক্য দেখা যায়। মায়ামুগ্ধ চোখ মায়ার পাত্রেই আবদ্ধ থাকে। তার কাছে সে ছাড়া প্রিয় বস্তু আর কিছু নেই। পেঁচা তার ছানাটাকেই সবচেয়ে সুন্দর দেখে, লক্ষ্মীর দেওয়া মালাটিকে তার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। দিব্যচক্ষু থাকলে স্থূল বস্তুর মধ্যেও চিন্ময় সত্তাকেই উপলব্ধি করতে পারা যায়।

জাগতিক ব্যবহারে নিষ্ঠা

এরপর একটি ব্যবহারিক ঘটনার কথা বললেন। মাষ্টারমশাই স্নানান্তে ঠাকুরের কাছে এলে ঠাকুর তাঁকে প্রসাদ দিয়েছেন। মাষ্টার-মশাই জলের ঘটিটি বারান্দায় ফেলে এসেছেন। ঠাকুরের তা দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলছেন, 'ঘটি আনলে না?' মাষ্টার-মশাই অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি আনতে গেলেন। ঠাকুর বলতেন, সমাধিতে থাকলে পরণের কাপড়েরও হুঁশ থাকত না, কিন্তু বাহ্যিক জগতে যখন মন রয়েছে তখন কোন বিষয়েই ভুল হয় না। এই লৌকিক ব্যাপারে ভুল হলে ঠাকুর অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। এরজন্য সর্বদা সকলকে সতর্ক করতেন।

ঠাকুর পরমতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলেও জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধেও

খুব সচেতন। যৌথ পরিবারে থাকলে জপধ্যানের সুবিধা হয় তাই মাষ্টারমশাইকে তাঁর পুরানো বাড়ীতে ফিরে যাবার জন্য বলছেন। কিন্তু মাষ্টারমশাই ভয় পাচ্ছেন। ঠাকুর বলছেন এ ভয় অমূলক। মনে অবিশ্বাস থাকলে এরকম ভয় মানুষকে পেয়ে বসে। অনেকে বিপদের সময় অমূলক ভয় পেয়ে হুটোপাটি করে বিপদকে আরও বাড়িয়ে তোলে কিন্তু বিপদের সময় শান্ত হয়ে থাকলে অনেক সময় বিপদ আপনিই কেটে যায়। তা বলে প্রতিকার করতে বারণ করেননি কিন্তু অযথা বিপদ ডেকে আনাও ঠিক নয়। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ছে —একবার স্বামী সারদানন্দ মহারাজ নৌকায় করে যাচ্ছেন, যেতে যেতে তামাক খাচ্ছেন। ডাঃ কাঞ্জীলাল প্রভৃতি তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। হঠাৎ খুব ঝড় ওঠায় নৌকাটা উথল পাথল করছিল। মহারাজ কিন্তু তামাক খেয়ে চলেছেন অচঞ্চল নির্বিকার চিত্তে। ডাঃ কাঞ্জীলাল তখন সক্রোধে তাঁর কলকেটা ছুঁড়ে গঙ্গায় ফেলে দিলেন। বললেন, 'নৌকা ডুবছে আর আপনি বসে বসে তামাক খাচ্ছেন?' তারপর ঝড় থামল। নৌকা এসে পাড়ে ভিড়ল। তখন মহারাজ বললেন, 'আচ্ছা আমি না হয় তামাক খাচ্ছিলাম, তুমিই বা করলে কি? কল্‌কেটা ফেলে দেওয়া ছাড়া আর তো কিছু করলে না। ওতে কি নৌকা বাঁচত?' এইরকম অনর্থক ভয় পেয়ে আমরা অনেক সময় বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলি।

আচার্যের লক্ষণ

নববিধানের প্রসঙ্গ উঠল। কেশব সেন যে নতুন সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন তারই নাম নববিধান। অনেকেই এই নববিধানের কার্যকলাপ নিয়ে সমালোচনা করেছেন। রাম বলছেন, কেশবের ভিতর সার বস্তু নাই, নইলে তাঁর শিষ্যদের এরূপ অবস্থা হয়? ঠাকুর কিন্তু এ কথায় সায় দিলেন না। বললেন, 'কিছু সার আছে বৈকি। তা না হ'লে

এত লোকে কেশবকে মানে কেন? তবে সংসার ত্যাগ না করলে আচার্যের কাজ হয় না, লোকে মানে না। লোকে বলে, এ সংসারী লোক, এ নিজে কামিনীকাঞ্চন লুকিয়ে ভোগ করে; আমাদের বলে, ঈশ্বর সত্য, সংসার স্বপ্নবৎ অনিত্য! সর্বত্যাগী না হ'লে তার কথা সকলে লয় না।' একথাটি ঠাকুর অনেক জায়গায় বলেছেন; ভগবানের পথে যেতে হলে সকলকে সংসার ত্যাগী হতেই হবে তা নয়, যাঁরা সংসারে আছেন তাঁরা অন্তরে ত্যাগ করবেন, কিন্তু আচার্যকে অন্তরে বাইরে দুইদিকেই ত্যাগী হতে হবে। তাই সংসারীদের আচার্য হওয়া কঠিন। কারণ ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত যাঁরা, তাঁরা এঁদের কথা গ্রহণ করতে পারেন না।

ধর্মভাবে ঠাকুরের উদারতা

রাম ঠাকুরকে নববিধানী বললে ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'কে জানে বাপু, আমি কিন্তু নববিধানের মানে জানি না!' তিনি কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করছেন না। আসলে কেশবচন্দ্র যে নতুন ধর্মমত সৃষ্টি করেছেন, সেটি ঠাকুর মানতে চাইছেন না। তিনি বলছেন ধর্মপথে যাবার বিধানগুলি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। সত্য চিরন্তন, যুগে যুগে নতুন হয় না। পুরানো সত্যকেই যুগে যুগে নতুনভাবে উপস্থাপিত করা হয় এইমাত্র। কেশব সেনের বহু পূর্বে রচিত অধ্যাত্ম রামায়ণে জ্ঞান ও ভক্তির মিশ্রণ আছে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রায় সর্বত্রই এই মিশ্রণ দেখা যায়। গীতাতেও জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সামঞ্জস্য দেখান আছে। সুতরাং কেশব সেন নতুন কিছু সৃষ্টি করেন নি, তাঁর শিষ্যরা যদি একথা বলেন তাহলে ভাবতে হবে তাঁরা ধর্ম-জগতের সামগ্রিক রূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত নন। এই প্রসঙ্গেই ঠাকুরের উদার দৃষ্টিভঙ্গির একটি কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন, এ

বুদ্ধি নাই যে, যাকে কৃষ্ণ বলছ তাকেই শিব, তাকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়। ঠাকুরের আগে এই রকম বিভিন্ন ধর্মের একত্র সমাবেশ কোথাও দেখা যায়নি। যদিও কবীরের দোঁহা অথবা নানকের ধর্মমতের ভিতরে হিন্দু মুসলমান ধর্মমতের কিছু সামঞ্জস্যের কথা আমরা পাই কিন্তু সেও একটা গণ্ডীর ভিতর সীমিত, হয়তো সীমার বাইরে দৃষ্টি দেবার তখন প্রয়োজন ঘটেনি। কেননা খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রভাব তখন আমাদের উপর পড়েনি, তাই ধর্মের ব্যাপকতা আসেনি। ঠাকুরের দৃষ্টিতে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত যত ধর্মমত প্রচলিত আছে এবং হবে সবেরই উচ্চস্থান রয়েছে। যিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছেন, যাঁর শিক্ষা দীক্ষা অত্যন্ত সীমিত, সেই ঠাকুর কি করে এত অপরিসীম উদার দৃষ্টিসম্পন্ন হলেন একথা ভাবলে সত্যি অবাক হতে হয়। তিনি বিভিন্ন ধর্মমতকে নিজের জীবনে অনুভব করেছেন, সাক্ষাৎ করেছেন, করে বলেছেন, সেই পরমব্রহ্মই বিভিন্নরূপে বিভিন্ন নামে প্রকাশ পাচ্ছেন।

অনেক জায়গায় ভগবানের অংশ, কলা এই রকম বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ নিয়ে মতভেদ আছে কিন্তু ঠাকুর বলেছেন যিনি অখণ্ড, অবিভাজ্য, তাঁকে অংশ দিয়ে বিভক্ত করা যায় না। সর্বত্র সেই ব্রহ্মশক্তি পূর্ণভাবে বিরাজ করছেন, আংশিক ভাবে নয়। তবে তাঁর শক্তির প্রকাশের তারতম্য আছে, একথা অনেক জায়গায় বলেছেন।

আমি তাঁকে যেভাবে জেনেছি, তিনি শুধু সেইরকম আর কিছু হতে পারেন না—এ মতও ঠাকুর স্বীকার করেন না। "তুমি তাঁকে যেভাবে জেনেছ সেটা তোমার কাছে সত্য হতে পারে কিন্তু অন্য পথ বা অন্য মত অবলম্বন করে তাঁর অন্যরূপ দর্শন করেছ কি? সেটা করি না—কারণ সেটা আমাদের সামর্থ্যের অতীত। একপথে গিয়ে একরূপ দর্শন করেই আমরা ভরপুর হয়ে যাই, অন্যরূপ দেখবার জন্য ধৈর্য ধরবার সাধ্য নেই। তিনি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হতে পারেন, তাঁর রূপের

ইতি করা যায় না। তিনি দশহাত, সহস্রহাত হতে পারেন, কিন্তু আমাদের সীমিত দৃষ্টি তাঁকে ধারণা করতে পারে না। অর্জুনকে যখন ভগবান বিশ্বরূপ দেখালেন, অনন্ত বাহু, অনন্ত মস্তক, অর্জুন তা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর দৃষ্টি ঐ বিরাটকে গ্রহণ করতে পারছে না। তখন নিজের অসামর্থ্য জানিয়ে বলছেন, হে বিশ্বমূর্তি, তুমি সেই চতুর্ভুজ মূর্তিতে দেখা দাও। অর্জুন তাঁর অসামর্থ্য স্বীকার করেছেন কিন্তু আমরা ধৃষ্টতাবশত নিজেদের অসামর্থ্যকে উপেক্ষা করে তাঁকেই সীমিত করে ফেলি। বলি, তিনি এই হতে পারেন আর এই হতে পারেন না। ঠাকুর এই বিষয়ে গাছতলায় অবস্থিত গিরগিটির উপমা দিয়েছেন।

পুরাণে আছে, ভগবান অবতার হয়ে যখন মর্তে এসেছেন, দেবতারা বলছেন স্বর্গে আপনার সিংহাসন খালি পড়ে রয়েছে, আপনি ফিরে চলুন। এ কল্পনা শিশুসুলভ। ঠাকুর বলছেন, যিনি সর্বব্যাপী, তিনি কি সিংহাসনছাড়া হতে পারেন? সুতরাং তিনি সর্বত্র এবং সর্বরূপে বিরাজমান। একটা উপমা দিচ্ছেন, একটা মাঠের একদিকে দেওয়াল আছে, দেওয়ালে ছোট একটা ছিদ্র আছে, তার ভিতর দিয়ে একটুখানি মাঠ দেখা গেল। ছিদ্রটা বড় করলে আরও বেশী অংশ দেখা গেল। এইরকম আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির জন্য পরিপূর্ণরূপে সর্বত্র তাঁকে দেখতে পাই না। এই দৃষ্টির আবরণের জন্য একজন একভাবে দেখে, অন্যজন অন্যভাবে দেখে। ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য তিনি সর্বরূপে মাকে দেখেছেন আবার অরূপেও তাঁকে দর্শন করেছেন। তাঁর বিশাল দৃষ্টি ছিল তাই বিরাটকে অনুভব করেছেন। কিন্তু অতবড় ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরী, তিনি শক্তির খেলা, ভগবানের সাকার রূপকে কল্পনাও করতে পারছেন না। উপনিষদ ব্রহ্মের স্বরূপ বলতে গিয়ে বলছেন, তিনি অরূপ, নির্গুণ আবার এও বলছেন, 'সর্বরূপঃ সর্বকামঃ সর্বরসঃ সর্বগন্ধঃ।' অর্থাৎ সবই তিনি।

আপাত-বিরোধী গুণগুলি একমাত্র তাঁতেই সম্ভব। ঠাকুর বলেছেন, তিনি সাকারও বটে আবার নিরাকারও বটে, আবার এর পরেও আছেন। স্বামীজী একজায়গায় বলছেন, ঠাকুর যেমন জোর দিয়ে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা বলেছেন, 'ভগবানের ইতি কোরো না'—কথাটির উপরও তেমনই জোর দিয়েছেন।

ঠাকুরের এই উদার দৃষ্টি থাকার ফলে যেখানে-যতটুকু ভাল দেখেছেন তার মর্যাদা দিয়েছেন। আমরা যদি তাঁর ভাবটি মনে মনে ধারণা করতে পারি তবে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ থাকবে না। ভগবানের স্বরূপ না জেনেও কেউ যদি উদ্ভট কোনো প্রকারে আন্তরিক ভাবে ভগবানকে ডাকে তবে ঠাকুর বলছেন তাতেও দোষ নেই। প্রয়োজন হলে তিনিই তার ভুল ভাঙিয়ে দেবেন, তাকে কৃপা করবেন। সুতরাং কারও প্রতি বক্রদৃষ্টিতে চাইব না। শুধু দেখব আন্তরিকতা আছে কি না, বৈরাগ্য আছে কি না। ঠাকুর এটি সবসময় বলছেন, বৈরাগ্য চাই, আন্তরিকতা চাই, তাহলেই ভগবানের স্বরূপ প্রকটিত হবে।

গুরুকে বিচার

বাবা মা গুরু এঁদের প্রতি ভক্তি সম্বন্ধে ঠাকুর বলছেন, বাপ-মা, ভাল হোক বা মন্দ হোক, তাঁদের প্রতি সমান ভক্তি থাকা উচিত। গিরীন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলছেন, বাপ-মা যদি কোন গুরুতর অপরাধ করেন তবুও তাঁদের ত্যাগ করতে নেই। 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'—কথাটি বোঝা বড় কঠিন। যদি কারো অগাধ বিশ্বাস থাকে তাহলে সে যে কোনো ব্যক্তিরূপ আধারের ভিতর দিয়ে ভগবানের কৃপা পেতে পারে। আমরা একলব্যের কাহিনী জানি, দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তি তৈরী করে, সাধনার দ্বারা তাকেই চেতন করে তুললেন। কাজেই এরকম অসাধারণ ক্ষেত্রে

গুরুর আধার বিচার করার দরকার হয় না। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন ওঠে, আমরা গুরু সম্বন্ধে কি বিচার করব না? এ সম্বন্ধে ঠাকুর তাঁর সন্তানদের নির্দেশ দিচ্ছেন, আমি যা বলব তা যাচিয়ে বাজিয়ে নিবি। যোগানন্দ স্বামীকে বলেছেন, সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে তাকে বিশ্বাস করবি। আবার এও সত্য, আধার যেমনই হোক নিজের বিশ্বাসই বড় কথা। তাই গুরু বিচারে ভুল হলেও, দৃঢ় বিশ্বাসের জোরে তার ক্ষতি হয় না, সে চৈতন্যের প্রকাশকে অনুভব করতে পারে। ঠাকুর বলেছেন গুরু সেই এক সচ্চিদানন্দ। তিনি আমাদের অন্তরেই আছেন তবে আমরা সেখানে তাঁর সন্ধান পাই না বলে বাইরের কোনো ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে তাঁর চিন্তা করি। গুরু অনাদি, অনন্ত। গুরুরূপী দেহটি তাঁরই প্রতিমা। আমরা প্রতিমাতে মা দুর্গার পূজা করি, প্রতিমাটি খড় মাটি দিয়ে তৈরী। আমরা সেই খড় মাটিকে পূজা করি না, তার ভিতর দিয়ে চিন্ময়ী মাকে পূজা করি। প্রতিমা বিসর্জন মানে মাকে বিসর্জন দেওয়া নয়, অন্তরে গ্রহণ। গুরুরও মৃত্যু নেই, তিনি অন্তরে গুরুরূপে চিরদিন বিরাজ করেন।

তবে কুৎসিত প্রতিমায় যেমন সাধকের মন যায় না, তাই মায়ের পূজাও ঠিক হয় না। তেমনি যে গুরুর নিকট নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে তাঁকেও শুদ্ধ হতে হবে। নাহলে তিনি শুদ্ধপথে চালিত করবেন কি করে? তাই গুরুকে বিচার করে নিতে হয়। মন শুদ্ধ হলে তখন আর এসবের প্রয়োজন থাকে না। ঠাকুর বলছেন, শেষে মনই গুরু হয়, সাধনার পরিণামে এটি হয়। এমনও দেখা যায় শিষ্য হয়তো গুরুকে অতিক্রম করে যাচ্ছে।

আর একটি কথা আছে। কুল পরম্পরায় গুরুগিরি জিনিসটি আমাদের সমাজের খুব হানি করেছে। কারণ ডাক্তারের ছেলে সব সময়ে ডাক্তার নাও হতে পারে; তার কাছে ওষুধ জানতে গেলে কি

চলে? তেমনি বর্তমানে গুরুবংশ শিষ্যবংশের সঙ্গে যেখানে ভালভাবে যোগই নেই, সেখানে শুধু কুলপ্রথাটুকুকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন, গুরু করবার আগে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে যতটা পারিস দেখেশুনে নিবি, বিচার হয়ে গেলে তখন আর কোনো সংশয় নয়, মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করবি। অর্থাৎ আগে নিঃসংশয় হওয়া, তারপর একেবারে মনপ্রাণ সমর্পণ করা। সংশয়যুক্ত হলে কোনো জিনিসকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারবে না। তখন 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'—এই অবস্থা।

পিতামাতাকে ভক্তি

এরপর মা-বাপের প্রতি শ্রদ্ধার প্রসঙ্গে বললেন, যদি আমরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে কোনো এক জায়গায় আমাদের সম্বন্ধকে দৃঢ় করতে না পারি তবে ভগবানকেও শ্রদ্ধা করতে পারব না। বাবা মায়ের প্রতি পূজ্য ভাবটি ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলন করতে করতে ভগবানের উপর তা আরোপ করতে পারি। না হলে যাকে আমরা দেখিনি, জানি না, সেই ভগবানকে ভালবাসব কি করে? তাই তাঁর উপর কোনো সাংসারিক সম্বন্ধ আরোপ করে তাঁকে ভালবাসতে চেষ্টা করি। এক জায়গায় শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার।

সামাজিক কর্তব্য

এরপর কতকগুলি ঋণের কথা বলেছেন। সামাজিক জীবনে সমাজের অন্তর্গত একজন ব্যক্তির সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধ রয়েছে। সেই সম্বন্ধের ভিতর কতকগুলি কর্তব্য জড়িত থাকে, যেগুলি পালন করতে হয়, কর্তব্যের প্রতি উদাসীন থাকলে চলে না। যেমন বাপ-মা বা স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য। এইরকম বিভিন্ন কর্তব্যগুলিকেই ঠাকুর পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, স্ত্রীঋণ,

এইরকম বলছেন। সমাজে বাস করে সমাজের দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে কেউ যদি সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন না করে, তবে তার সামাজিক জীবন কখনও সুষ্ঠু হতে পারে না। প্রতি পদক্ষেপে অপরের সাহায্য নিতে হচ্ছে তার প্রতিদানে অবশ্যই কিছু দিতে হয়, তাই কর্তব্যগুলিকে পালন করতেই হয়।

যার বন্ধন নেই তার কর্তব্যও নেই

তবে ঠাকুর এও বলেছেন যে, ভগবানের জন্য পাগল হলে তার আর কোনো কর্তব্য থাকে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ত্রিজগতে আমার কোনো কর্তব্য নেই। কারণ তিনি কর্তৃত্ব বোধ নিয়ে কিছু করেন না। সাধারণতঃ মানুষ নিজের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করবার জন্য কর্ম করে কিন্তু ভগবান নিজেই পূর্ণ সুতরাং কিছু পাবার জন্য কর্ম করেন না। তিনি তাঁর স্বভাবহেতু জগতের কল্যাণ করে চলেছেন।

'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্ত'—

যেমন বসন্ত ঋতু সকলের মনে সুখ জাগায় কেন না এটা তার স্বভাব, সে প্রতিদানে কিছু চায় না। সেইরকম অবতারও শুধু দিতে আসেন। দিয়ে যাওয়াই তাঁর স্বভাব, তাই তাঁর কোন কর্তব্য নেই। তেমনি যিনি কর্তৃত্ব বুদ্ধিহীন তাঁর আর কর্তব্য অকর্তব্য কিছু থাকে না। তিনি মুক্ত, বন্ধনহীন, বিধিনিষেধের পারে। বিধি বা নিষেধ প্রয়োগ করা হয় এমন ব্যক্তির উপর যে নিজেকে কর্তা বলে ভাবে, সে-ই ভাবে কি কি করবে আর না করবে। বিধি প্রয়োগ করতে গেলে তিনটি প্রশ্ন ওঠে—কে করবে, কি করবে এবং কেমন করে করবে? কি কর্মযোগ, কি জ্ঞানযোগ সর্বত্র এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে। জ্ঞানের উপদেশে আছে—আত্মাকে দেখতে হবে—প্রথমে অধিকারী কে অর্থাৎ কে দেখবে? না, যে মুমুক্ষু তার জন্য এই বিধান। এরপর, কি

করবে? না, আত্মবিচার করবে। তৃতীয়, কেমন করে করবে? না, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—এই উপায়ে করবে। এইরকম সর্বক্ষেত্রে একজন কর্তা থাকলে তার উপরে বিধান চাপান হয়। কর্তা না থাকলে বিধান চাপান হবে কার উপর?

ঠাকুর বলেছেন, বাবা-মা পরম পূজ্য, তাঁদের কাঁদিয়ে কি ধর্ম হয়? যদি প্রশ্ন ওঠে এমন কোন ছেলে আছে কি, যে বাপ-মায়ের চোখের জল না ফেলে সাধু হয়েছে? এর উত্তরও ঠাকুর দিয়েছেন, ঈশ্বর সকলের চেয়ে বড় তাই তাঁর জন্য প্রকৃত ব্যাকুল হলে, পাগল হলে তাকে আর সংসারের কর্তব্য করতে হবে না। সে সমস্ত ঋণমুক্ত। কিন্তু সেয়ানা পাগল, বুঁচকি বগল এরকম হলে চলবে না।

ঠাকুরের উপদেশ অধিকারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন—এটুকু স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। প্রতাপকে বলছেন, বাড়ীতে মা খেতে পায় না আর তুমি ধর্ম করছ? আবার স্বামীজীকে বলেছেন, ও যদি সংসারের দিকে যায় তাহলে একটা রাজাধিরাজ হবে। কিন্তু তাঁকে রাজাধিরাজ হতে না দিয়ে একেবারে ভিখারী করে দিলেন। তিনি জেনেছেন স্বামীজী সংসারের দাবী মেটাতে আসেননি, তাই তাঁর জন্য এই বিধান।

পরিশেষে ঠাকুর প্রেমোন্মাদের লক্ষণ সম্বন্ধে বলছেন যে, সে অবস্থায় জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়। চৈতন্যদেবের হয়েছিল। তিনি সাগরে ঝাঁপ দিয়েছেন, সাগর বলে বোধ নেই। এটি বললেন এই কারণে যাতে কেউ মনের সঙ্গে জুয়াচুরি বা কপটতা না করে।

নয়

২. ১৪. ১—৮

খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষাংশে ঠাকুর বহুদক ও কুটীচকের কথা প্রসঙ্গে বলছেন, 'যে সাধু অনেক তীর্থে ভ্রমণ করেন তাঁর নাম বহুদক।' যিনি এক জায়গায় আসন করে বসেন তাঁকে বলে কুটীচক। বুড়ো গোপালকে তীর্থে যাওয়ার প্রসঙ্গে বলছেন, 'যতক্ষণ বোধ যে ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান।' অর্থাৎ অন্তরে তিনি রয়েছেন আমরা দেশবিদেশে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ঠাকুর উপমা স্বরূপ হাতে লণ্ঠন নিয়ে টিকে ধরাবার জন্য প্রতিবেশীর বাড়ী যাওয়ার সেই গল্পটি বললেন। সকল তীর্থের উৎস যিনি তিনি সামনে রয়েছেন, তবু আমরা তাঁকে ছেড়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছি। রাম বলছেন, গুরুবাক্যে বিশ্বাস হবার জন্যই গুরু শিষ্যকে তীর্থে যেতে নির্দেশ দেন। আসলে তীর্থে যাবার কথা আবহমানকাল থেকে চলে আসছে, সেখানে গেলে অন্তরে যিনি আছেন বাইরে তাঁকে দেখে ভাবের উদ্দীপন হয়, ভিতরের ধর্মভাবকে জাগ্রত হয়। যদি ভিতরে ভাব না থাকে তাহলে তীর্থে গিয়ে কোন লাভ নেই।

চুনীলাল সবে বৃন্দাবন থেকে ফিরেছেন, ঠাকুর রাখাল ও অন্যান্য সঙ্গীদের খুঁটিনাটি খবর নিচ্ছেন। তিনি ভক্তদের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক সব বিষয়েরই খবর রাখতেন। এরপর নারাণের সরলতার প্রসঙ্গ উঠল। সরলতা মানুষকে ভগবানের পথে এগিয়ে দেয়, তাই কেউ সরল হলে ঠাকুর খুব খুশী হন। 'ছোড় কপট চতুরাই'—কপটতা, চতুরতা ছেড়ে দিয়ে ভগবানের দিকে যেতে হয়।

সর্বভূতে আত্মদর্শন

চৈতন্যলীলা থিয়েটার দেখতে যাওয়ার কথা উঠল। কথা হচ্ছে চৈতন্যলীলার অভিনেত্রীরা বেশ্যা। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, 'আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখবো।' আরও বলছেন, 'শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।' এরপর উদ্দীপনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেন। এই যে, association of ideas—এর থেকে একটি জিনিস অন্য জিনিসের উদ্দীপনা এনে দেয়। ঠিক ভক্ত যিনি তাঁর কোনো কামনা নেই শুধু শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করেন।

সিদ্ধাই—ঈশ্বরলাভের পথে বিঘ্ন

এরপর সিদ্ধাই-এর অসার্থকতার কথা বলছেন। সিদ্ধাই-এর সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের কোনো সম্বন্ধই নেই। এগুলি অগ্রসর তো করায়ই না বরং সাধকের জীবনে বিঘ্ন ঘটায়। ভগবান বলছেন, অষ্টসিদ্ধির একটা থাকলেও আমাকে পাবে না। তাই ঠাকুর বার বার সিদ্ধাই-এর ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছেন। এরা ক্রমে ভগবানকে ভুলিয়ে দেয়, বিপথে চালিত করে।

সাধারণ লোকের ধারণা সাধুরা হাত দেখতে জানেন, ওষুধ দিতে জানেন, চাকরী করে দিতে পারেন—এইরকম অলৌকিক শক্তির অধিকারী। সাধুর কাছে এসে লোকে তাই এইসব প্রার্থনা করে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, একবার আমি এক ধনীগৃহের অতিথি হয়েছি। তাঁর এক আত্মীয়া এসে আমাকে বললেন, আপনি হাত দেখতে জানেন? বললাম, না। আপনি কোষ্ঠী বিচার করতে জানেন? বললাম, না। তাহলে আপনি কি জানেন? আমিও ভাবছি কি জানি! তখন গৃহস্বামী ভদ্রলোক খুব লজ্জা পেয়ে বললেন, ওঁরা ওসব করেন না, ওঁদের ওসব বলবেন না। লোকে এইরকম আশা করে।

তবে এর একটা কারণও আছে। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অনেকে রোগের ওষুধপত্র জানতেন এবং লোকের মঙ্গলের জন্য সেই ওষুধ বয়ে নিয়ে বেড়াতেন। তাঁদের কাছে চাইলে তাঁরা ওষুধ দিতেন। তাই লোকের ধারণা সাধু হলেই বুঝি ওষুধ জানবেন, আমরা জানি না বললেও তা লোকে বিশ্বাস করে না।

তারপর বলছেন, সরল হতে হয় আর বিনয়ী হতে হয়। 'আমি বুঝেছি, আর সব বোকা—এ বুদ্ধি ক'রো না। সকলকে ভালবাসতে হয়। কেউ পর নয়।' শ্রীশ্রীমাও বলেছেন, জেন, কেউ পর নয়, সবাই আপনার। প্রহ্লাদের কাহিনীর ভিতর দিয়ে বোঝাতে চাইলেন, 'হরি একরূপে কষ্ট দিলেন। সেই লোকদের কষ্ট দিলে হরির কষ্ট হয়।' কারণ সর্বভূতে সেই এক হরিই বিরাজমান। তাই সকলকে ভগবান বুদ্ধিতে ভালবাসতে পারলে সেই ভালবাসা সার্থক। নতুবা সেটি আমাদের বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দেহবুদ্ধি থাকলেই বন্ধন সৃষ্টি করে।

ঈশ্বরের জন্য উন্মাদনা

এরপরের পরিচ্ছেদে শ্রীমতির প্রেমোন্মাদের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, 'আবার ভক্তি-উন্মাদ আছে। যেমন হনুমানের।' হনুমানের দাস্যভাব, সেইভাবে উন্মত্ত হয়ে তিনি রামকে মারতে যান। কেন? না, সীতা দেবী আগুনে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে প্রবেশ করতে দিলেন এইজন্য তাঁর উপর অভিমান। এখানে ভক্তি উন্মাদনা।

'আবার আছে জ্ঞানোন্মাদ। একজন জ্ঞানী পাগলের মত দেখেছিলাম। লোকে বললে, রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসভার একজন।—এক পায়ে ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি আর একটি ভাঁড়, আঁবচারা। গঙ্গায়

ডুব দিলে। তারপর কালীঘরে গেল।······কুকুরের কাছে গিয়ে কান ধ'রে তার উচ্ছিষ্ট খেলে—কুকুর কিছু বলে নাই।' ঠাকুর হৃদয়কে বলছেন, আমারও কি ঐ দশা হবে?

একবার হৃদয় ঐরকম এক জ্ঞানীর পিছন পিছন গিয়েছিলেন। তিনি উন্মাদ, প্রথমে মারতে এলেন, তারপর যখন দেখলেন কিছুতেই ছাড়ে না তখন বললেন, দ্যাখ্, এই নর্দমার জল আর গঙ্গার জল একবোধ হলে বুঝবি জ্ঞান হয়েছে অর্থাৎ নর্দমার জলও গঙ্গার মতোই পবিত্র এই বোধ। কারণ গঙ্গা কখনও অপবিত্র হয় না। যেমন সূর্যের আলো, অগ্নি প্রভৃতি নানা দৃষ্টান্ত ঠাকুর দেখিয়েছেন। অপবিত্র বস্তুকে প্রকাশ করে সূর্য বা অগ্নি নিজে অপবিত্র হয় না।

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন
লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। কঠ ২. ২. ১১.

তারপর নিজের উন্মাদ অবস্থার কথা বলছেন, 'নারায়ণ শাস্ত্রী এসে দেখলে একটা বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছি।' বললে, 'ওহ্ উন্মস্ত হ্যায়।' মস্ত মানে পাগল। সাধুদের ভিতর পাগল মানে ভগবানের জন্য পাগল। এইরকম অবস্থায় ঠাকুর নীচ জাতির হাতের অন্নও খেয়েছেন। আবার কাঙ্গালীদের উচ্ছিষ্টও খেয়েছেন। কিন্তু—পরে বলেছেন, এখন আর ওরকম পারি না। তিনি জ্ঞান দিতে এসেছেন সুতরাং সবসময় উন্মত্ত থাকলে জগৎকে কিছু দেওয়া যাবে না। তাই সাধারণের মতো আচরণ করেন, নিজেকে ঢেকে রাখেন।

ঠাকুর ব্রাহ্মণদের হাতের রান্না খেতেন, সেই প্রথা অনুযায়ী আজও মঠ মিশনে ঐ নিয়মই প্রচলিত আছে। ঠাকুরের ভোগ সন্ন্যাসীরা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীদের দিয়েই তৈরী ও নিবেদন করান হয়।

একজন ভক্ত বলছেন, সংসারী লোকের যদি জ্ঞানোন্মাদ কি প্রেমোন্মাদ হয় তাহলে সংসার চলে কেমন করে? ঠাকুর উত্তর

দিচ্ছেন, সংসারীদের পক্ষে মনে ত্যাগ, বাইরে ত্যাগ নয়। ত্যাগ ছাড়া হবে না, এটা ঠিক। তবে সন্ন্যাসী যেমন করে, গৃহস্থকেও তেমন করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। গৃহস্থকে অন্তরে ত্যাগ করতে হবে। তাই কেশব সেনকে বলেছিলেন, ভক্তি নদীতে একেবারে ডুব দিলে এদের (মেয়েদের) কি হবে? কাজেই একবার একবার উঠো। খুব বাস্তবানুগ কথা। সংসারী যে, সে কি করে সর্বস্ব ত্যাগ করবে? তাই সর্বস্ব ত্যাগ করতে গৃহস্থকে কখনও বলেননি। বলেছেন, মনে ত্যাগ করবে। মন নিয়েই কথা। মনেতেই আসক্তি, মনেতেই অনাসক্তি। সন্ন্যাসীর আদর্শ জগতের কল্যাণের জন্য, তাই তাকে অন্তরে বাইরে ত্যাগ করতে হবে নতুবা সে আদর্শভ্রষ্ট হবে। তাই একদিকে ত্যাগী সন্তানদের নিখুঁত করে গড়ে তুলেছেন, অন্যদিকে নাগমশাইকে সংসারে রেখেছেন গৃহস্থদের শিক্ষার জন্য।

এরপর প্রসঙ্গক্রমে বলছেন, হাজরা বলে, তুমি রজোগুণী লোক বড় ভালবাস। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, তাহলে এই নরেন্দ্র, নেটো, হরিশ এদের ভালবাসি কেন? এদের তো কিছুই নেই। আসলে হাজরার ঘরে কিছু দেনা ছিল, তিনি আশা করেছিলেন ঠাকুর এর একটা কিছু বিহিত করে দেবেন। কিন্তু ঠাকুর কিছু করেননি তাই অভিমান করে এসব বলছেন।

এরপর থিয়েটারে বসা নিয়ে প্রসঙ্গ হল। ঠাকুর নিজেকে নিম্ন পর্যায়ে রাখতে চাইতেন, তাই বেশী টাকা দিয়ে দামী বক্সে বসতে চাইছেন না। ঠাকুরের ভাব হচ্ছে দেখা নিয়ে কথা, যেখান থেকেই হোক দেখা হলেই হল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ঠাকুর চৈতন্যলীলা থিয়েটার দেখার সময় পথে মহেন্দ্র মুখুজ্যের ময়দার কলে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। মহেন্দ্র মুখুজ্যে যদিও দুই-একবার

ঠাকুরের কাছে গিয়েছেন তবু তাঁর বাবা ঠাকুরকে চেনেন না। তাই যথাযথ সমাদর না হবার আশঙ্কায় তিনি ঠাকুরকে বাড়ীতে না নিয়ে গিয়ে কলে নিয়ে গেলেন। ঠাকুর তখন ভাবস্থ ছিলেন, তাই 'জল খাব' বলে মন বাহ্যজগতে ফেরাতে চেষ্টা করছেন। সমাধিস্থ পুরুষের কোন বাসনা থাকে না কিন্তু জগতের কল্যাণের জন্য মনকে সমাধি অবস্থা থেকে নীচে নামাতে হয়। তখন ঐ ছোটখাট বাসনাকে আশ্রয় করে মনকে বাহ্যজগতে ফেরাতে চেষ্টা করেন।

চৈতন্যলীলা দেখতে যাবেন, তাই মনের ভিতর চৈতন্যদেব সম্বন্ধে নানা কথা উঠছে। বলছেন, হাজরা বলে 'এসব শক্তির লীলা—বিভু এর ভিতর নাই।' ঠাকুরের মতে 'বিভু ছাড়া শক্তি কখন হয়?' বহু জায়গায় ঠাকুরের এরূপ উক্তি আছে। এখানেও বলছেন, 'আমি জানি, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন; তবে কোনখানে বেশী শক্তির কোনখানে কম শক্তির প্রকাশ।' শক্তির প্রকাশে তারতম্য আছে, বস্তুর সত্তায় তারতম্য নেই।

এরপর শুদ্ধ ভক্তের প্রসঙ্গে বলছেন, 'যে শুদ্ধভক্ত সে কখনও ঐশ্বর্য প্রার্থনা করে না।' সে শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করে। যে ঐশ্বর্য চায় সে ভগবানের সত্তা থেকে দূরে সরে যায়। ঐশ্বর্য-বুদ্ধি থাকলেই পার্থক্যের সৃষ্টি হয় এ কথা বারবার বলেছেন।

কলে বসেই কথা হচ্ছে। সন্ধ্যা হয়েছে কি না জানবার জন্য ঠাকুর হাতের লোম দেখছেন। 'লোম যদি গণা না যায়, তাহা হইলে সন্ধ্যা হইয়াছে।' আমরাও দেখেছি, তখনকার দিনে সবজায়গায় ঘড়ি থাকত না, ঘড়ির চলও বেশী ছিল না, তাই বৃদ্ধরা লোম দেখতেন সন্ধ্যা হয়েছে কিনা জানবার জন্য। ঠাকুর বলছেন, সন্ধ্যার সময় সব কাজ ছেড়ে হরিকে স্মরণ করবে।

এরপর ঠাকুর ষ্টার থিয়েটারে এলেন। গিরীশ ঘোষের সঙ্গে তখনও পরিচয় হয়নি। গিরীশ শুধু তাঁর নাম শুনেছেন। ঠাকুর এসেছেন শুনে খুশী হয়ে তাঁকে বক্সে বসালেন। এখানকার বর্ণনা শুনে জানা যাচ্ছে আগের দিনে বক্সে যাঁরা বসতেন তাঁদের হাওয়া করবার জন্য একজন বেয়ারা নিযুক্ত থাকত। তখন তো বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না। তাই ঠাকুরের জন্যও টানা পাখার বন্দোবস্ত হল। ঠাকুর হলটি দেখে খুশী হয়েছেন। বলছেন, 'অনেক লোক এক সঙ্গে হ'লে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই, তিনিই সব হয়েছেন।'

এরপর নাটকের দৃশ্যগুলির বর্ণনা আছে। প্রথম দৃশ্যে পাপ আর ছয় রিপুর সভা এবং বিবেক বৈরাগ্য ভক্তির কথাবার্তা শুরু হল। ভক্তি বলছেন, গৌরাঙ্গ নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই বিদ্যাধরী আর মুনিঋষিগণ ছদ্মবেশে দর্শন করতে আসছেন। তারপর গান আরম্ভ হল। বিদ্যাধরী ও মুনিঋষিরা গান শুরু করলেন। গানটি গিরীশ ঘোষের রচনা, রচনার বৈশিষ্ট্য আছে। পুরুষেরা যে কলিগুলি গাইছেন সেগুলি পৌরুষব্যাঞ্জক আর মেয়েরা যে কলিগুলি গাইছেন, সেগুলির কমনীয় ভাব। ঠাকুর গান শুনে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

আগে ঈশ্বরে ভক্তি পরে সংসার ধর্ম

নিমাই-এর শিক্ষাগুরু গঙ্গাদাস নিমাইকে সংসারধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলায় ঠাকুর বলছেন, সংসারীরা দু-দিক রাখতে চায়। ঠাকুর নিজেও উপদেশ দিয়েছেন তোমরা এ-ও কর, ও-ও কর। অর্থাৎ একহাতে তাঁকে ধর অন্যহাতে সংসার কর। তাহলে এখানে কটাক্ষ করছেন কেন? তাঁর ভাব হচ্ছে এই যে, দুদিক রাখবে কিন্তু যখন সমস্ত মন প্রাণ সেইভাবে ভরে যাবে তখন আর ইচ্ছা করলেও দুদিক রাখতে পারবে না। এখানে নিমাই যেমন বলছেন, 'আমি ইচ্ছা ক'রে সংসার

ধর্ম উপেক্ষা করি নাই; আমার বরং ইচ্ছা যাতে সব বজায় থাকে।' তাই ঠাকুর বলছেন, প্রথমে এক হাতে তাঁকে ধর, তারপর সময় হলে দু-হাতে তাঁকে ধরবে। ঠাকুরের বলার একটা বিশেষত্ব আছে। সংসার কর একহাতে তারপর একটু ঈশ্বরকে ধর—এ নয়। তাঁকে ধরাটাই প্রধান। উপমা দিয়েছেন, আগে হাতে তেল মাখ তারপর কাঁঠাল ভাঙ্গ। আগে দই নিয়ে মন্থন করে মাখন তোল তারপর তাকে সংসার জলে রাখলে তা আর ডুববে না। তাই আগে ঈশ্বর-ভক্তি লাভ কর তারপর সংসার করলে দোষ হবে না। সাধারণ সংসারীরা যে বলে, এ-ও রাখ, ও-ও রাখ, তার মানে সংসার আর ভগবানকে তুল্য মূল্য দেয়। ঠাকুর কিন্তু তা বলেন নি, এই পার্থক্যটুকু বিশেষ করে মনে রাখবার।

যদি প্রশ্ন হয়, ঈশ্বরে ভক্তি এলে আর সংসারে প্রবেশ কেন? তার উত্তর এই—যার যেমন প্রকৃতি তাকে সেই অনুসারে চলতে হবে। ঈশ্বরে ভক্তি এলেও তিনি যে সংসারে প্রবেশ করতে বাধ্য—তা নয়। তেমন তীব্র বৈরাগ্য এলে না প্রবেশ করলেও পারে। কিন্তু যাদের সংস্কার আছে তাদের কথা বলছেন, আগে ভক্তি লাভ করে পরে সংসারে প্রবেশ করলে আর ক্ষতি হয় না। শুধু প্রবৃত্তির বশে সংসারে ঢুকলে বেরনো কঠিন। ঠাকুর যেমন বলেছেন, বিশালাক্ষীর দ; একবার পড়ে গেলে আর উপায় নেই। তার মানে এই নয় যে, ঠাকুর সংসারকে নিন্দা করেছেন বা পরিহার করতে বলেছেন। তাঁকে ধরে সংসার কর—এই বলেছেন। মুখ্য তিনি, সংসার গৌণ। অর্থাৎ এক হাতের কাজ ফুরালে দুই হাতেই তাঁকে ধরবে, এইটাই তাঁর বলার উদ্দেশ্য। ভাগা-ভাগির প্রশ্ন নেই এখানে। উপস্থিত মনের গতি অনুসারে আগে নির্জনে গিয়ে ভক্তিলাভ কর তারপর সংসারে প্রবেশ কর কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। পরিণামে সমস্ত মনটাই ভগবানে সমর্পণ করতে হবে। যতদিন

তা না হচ্ছে ততদিন খানিকটা মন দিয়ে সংসারের কর্তব্য কর, তাতে দোষ হবে না, এই কথাই বলছেন।

আর একটা কথা আছে, বিজ্ঞানীর অবস্থায় সংসারে থাকা না থাকা একই ব্যাপার। সংসারের মধ্যেই তিনি তখন ব্রহ্ম দর্শন করবেন সুতরাং সংসার ত্যাগ বা গ্রহণ এর কোন প্রশ্নই ওঠে না তাঁর কাছে। আর আমাদের জীবনেরও তাই উদ্দেশ্য, পূর্ণভাবে তাঁতে অবস্থিত হওয়া। সুতরাং সংসারকে সেখানে ঐ প্রয়োজন সিদ্ধ করার উপায় হিসাবে গ্রহণ করলে সেটা দোষের নয়। তাই প্রাচীনকালে অল্প বয়সে গুরুগৃহে পাঠান হোত। সেখানে লেখাপড়ার সঙ্গে মনেরও প্রস্তুতি হোত। আচার্য শিষ্যকে গৃহে ফিরে যাবার অনুমতি দিলে সে গৃহে ফিরে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করতে পারত। তখন সেই সংসারও একটি আশ্রম। এ যুগে আমরা সেরকম প্রস্তুতি না নিয়েই উপযুক্ত বয়স, কি একটা চাকরী, একটু লেখাপড়া—এসব থাকলে সংসারে ঢুকে পড়ি। তাই সংসার আমাদের কাছে 'আশ্রম' হয় না, পার্থক্য এখানেই।

তাই ঠাকুর বারবার বলেছেন, সংসারকে গোছাবার আগে নিজেকে গোছাবার চেষ্টা কর নাহলে পরিণামে দেখবে সবই গোছান হল, শুধু নিজেকেই গোছান হয়নি।

দশ

২. ১৫. ১-২

অবতার ও তাঁর পার্ষদ

ঠাকুর ষ্টার থিয়েটারে গৌরাঙ্গলীলা দেখতে এসেছেন। সেই প্রসঙ্গ চলছে। নিতাই নিমাইকে খুঁজছেন, নিমাইও নিতাইকে খুঁজছেন। এই নিমাই আর নিতাই-এর সম্বন্ধ, বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রে একটি বিশেষ ঘটনা। নিমাই সর্বভাবের আধার এবং সেই ভাবকে গ্রহণ করার মত অধিকারী হচ্ছেন নিতাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত—এই তিনটি নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। প্রেমের উৎস শ্রীগৌরাঙ্গ আর সেই প্রেম বিতরণ করছেন নিতাই। নিতাই যেন তাঁর ভাবের ধারক ও বাহক। অবতার যখন আসেন তাঁর কোন এক বিশেষ পার্ষদকে আশ্রয় করে তাঁরই ভিতর দিয়ে তিনি কাজ করেন। নিত্যানন্দ সেইরকম অদ্বিতীয় পার্ষদ আর অদ্বৈত আচার্য সম্পর্কে বলা হয় যে তাঁর আকুল আহ্বানে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই অদ্বৈত আচার্য হলেন ভগবানের অবতীর্ণ হবার বিশেষ কারণ। শ্রীগৌরাঙ্গ বলছেন, অদ্বৈত পূজারী, সে আবাহন করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের যুগেও আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী—দুজনে দুদিক দিয়ে সেই সত্তার ধারক এবং বাহক অর্থাৎ একই সত্তার তিনটি বিকাশ।

এখানে নিমাই নিতাইকে বলছেন 'সাথর্ক জীবন'; কেন? তাঁর কি কোন অপূর্ণতা ছিল যা নিত্যানন্দ আসায় পরিপূর্ণ হল? অপূর্ণতা নয়, তিনি যে উদ্দেশ্যে দেহধারণ করে এসেছেন, সেই উদ্দেশ্য সফল হবে

নিত্যানন্দের সহযোগিতায়। তাই বলছেন, 'সার্থক জীবন'। আর বলছেন, 'সত্য মম ফলেছে স্বপন।' অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ পার্ষদদের সঙ্গে অবতারের পূর্ব থেকেই পরিচয় থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এর প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা বহুবার দেখেছি। ঠাকুর বলছেন, কাকেও দেখলে হঠাৎ লাফিয়ে উঠি কেন জান? অন্তরঙ্গদের অনেকদিন পরে দেখলে যেমন লোকে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে সেইরকম হয়। তিনিও প্রতীক্ষা করেছেন তাঁর লীলার সহচরদের জন্য। স্বামীজীকে প্রথম দেখেই চিনতে পেরে কত স্তবস্তুতি। এখানেও নিত্যানন্দের সঙ্গে নিমাই-এর মিলন হল। থিয়েটার চলছে। শ্রীবাস ষড়্‌ভুজ দর্শন করলেন। ঠাকুরও ভাবাবিষ্ট হয়ে ষড়্‌ভুজ দর্শন করছেন। গৌরাঙ্গের ভাব বুঝে নিতাই গাইলেন, 'কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণসই!' শ্রীরাধিকার ভাব নিয়ে গৌরাঙ্গ দেহ ধারণ করেছেন। তাঁকে 'রাধাভাবদ্যুতি-সবলিততনু কৃষ্ণস্বরূপম্' বলা হয়েছে। চৈতন্যাবতারের কারণ ব্যাখ্যা করে চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে—শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ, আমার যে মাধুর্য রাধাকে মুগ্ধ করে সেই মাধুর্য কিরূপ আর সেই মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে আনন্দ লাভ করেন সেই আনন্দই বা কিরূপ —এই তিন বাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হলেন। এসব ভাবের কথা। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা মনে করি। তিনি বলেছেন, দেখ, এর ভিতর (নিজেকে দেখিয়ে) দুটো আছে। একটি ভগবান আর একটি ভক্ত। অবতার চরিত্র সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না। একবার বলছেন, (নিজের দেহ দেখিয়ে), একে চিন্তা করবে। আবার কখনও কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন মা, এখনও দেখা পেলাম না বলে। এই দুই ভাবের একত্র সমাবেশ এখানেও হয়েছে।

ভগবানের জন্য শ্রীরাধার ব্যাকুলতার তুলনা হয় না। দ্বিতীয় উপমা

নেই যা দিয়ে এই ব্যাকুলতাকে এমন করে বোঝান যায়। ঠাকুর বলছেন, এই মহাভাব জীবের হয় না। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে একমাত্র শ্রীরাধাই মহাভাবের অধিকারিণী—'মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।' গৌরাঙ্গ সেই রাধার ভাবকে আশ্রয় করে এসেছেন। তাই তাঁর কত আর্তি, কত ব্যাকুলতা। রাধাকে বলা হয় ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি, আনন্দদায়িনী শক্তি, যে শক্তির দ্বারা ভগবান জগতে আনন্দ, প্রেম বিতরণ করেন। তাই রাধা আর শ্রীকৃষ্ণ দুটি ভিন্ন নয়, পূর্ণ ভগবত্তা উভয়ের মধ্যেই আছে। শুধু পার্থক্য হচ্ছে একটির প্রকাশ ভগবানরূপে আর একটির প্রকাশ ভক্তরূপে। এই দুটি জিনিসই শ্রীগৌরাঙ্গের ভিতর প্রকাশিত। ভাগবতে বলেছে—'ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মাণি ন বিরুধ্যতে'—তুমি পরমেশ্বর, তোমাতে এই বিপরীত ভাব বিরুদ্ধ নয়। দুটি ভাবকেই নিজের ভিতর প্রকট করা তোমার পক্ষেই সম্ভব।

এরপর ঠাকুরের মন যখন আবার বাহ্যজগতে ফিরে আসছে, দেখছেন তাঁর পিছনে, খড়দার নিত্যানন্দ গোস্বামীর বংশের একজন বাবু দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখেই নিত্যানন্দের ভাব মনে উদয় হল, ঠাকুর তাই আনন্দে বিভোর। অনুরূপ দৃষ্টান্ত সেই ভক্তের যিনি বাবলা গাছ দেখে ভাবছেন এর কাঠ দিয়ে ভগবানের বাগানের কুড়ুলের বাঁট হয়, আর অমনি ভগবানের ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েন। সেইরকম সম্পর্কগুলি অনেক দূরের হলেও তাঁর দৃষ্টি সেগুলিকে ভেদ করে চলে যায়। বলছেন, 'আর একটু হ'লে আমি দাঁড়িয়ে পড়তুম'। অর্থাৎ সমাধি হয়ে যেত।

অবতার ও অভক্ত

এরপর জগাই মাধাই-এর সঙ্গে নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছে। জগাই মাধাই-এর উদ্ধার কাহিনী আমাদের সকলের জানা। ভগবান

শুধু ভক্তদের জন্যই আসেন না, যারা অভক্ত, ভগবৎবিদ্বেষী তাদের জন্যও আসেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের উৎসবে অনেক দুষ্ট লোক গণিকা ইত্যাদি আসে তাই দেখে কেউ কেউ স্বামীজীর কাছে এর প্রতিবাদ করে জানালেন, এদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা করুন। স্বামীজী তখন আমেরিকায় ছিলেন। উত্তরে লিখলেন, ঠাকুর কি শুধু শুদ্ধ ভক্তদের জন্য এসেছেন? যারা মূর্খ, সমাজে যারা পতিত, তাদেরই তো তাঁকে বেশী দরকার। কাজেই ঠাকুরের দরজা কারো কাছে বন্ধ হবে না। তবে কোনো অন্যায় না হয় তার চেষ্টা করবে।

তাই জগাই মাধাই উপলক্ষ্য, পতিত উদ্ধারের জন্যই ভগবানের আসা। তাদের প্রতি করুণা করে তিনি তাদের আরও কাছে টেনে নেন। হোক না জগাই মাধাই মহাপাপী, উদ্ধারকর্তা তো আছেনই। গিরীশের পানাসক্তির কথায় ঠাকুর বলেন, খাক্ না কদিন খাবে। পরে যে বস্তুর আস্বাদ পাবে তাতে অন্য সব কিছু বিস্বাদ হয়ে যাবে। অবতারের উদ্ধার কার্যের এই হল প্রক্রিয়া।

এবার নিমাই-এর সন্ন্যাসের কথা হচ্ছে। সবাই হাহাকার করছে কিন্তু ঠাকুর স্থির হয়ে আছেন। তিনি জানেন সন্ন্যাসের আদর্শ দেখাবার জন্য ভগবানের আবির্ভাব, তবে চোখের কোণে এক ফোঁটা প্রেমাশ্রু ফুটে উঠল।

অভিনয় শেষ হল। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেখলেন? ঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন, 'আসল নকল এক দেখলাম।' যারা সেজেছে তিনি তাদের দেখেননি, যা সেজেছে তাই দেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে নকল কিছু নেই, সবই আসল।

তারপর ঠাকুর আবার মুখুজ্যের কলে এসেছেন। এখনও মনের ভিতর গৌরাঙ্গের ভাব চলছে। ভাবে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করছেন।

এরপর মহেন্দ্র তীর্থে যাবেন, সেই প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে। তীর্থে যাবার

জন্য ঠাকুর বিশেষ উৎসাহ দিলেন না। এমন মহাতীর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ রয়েছেন, যা নেবার তা তো এখান থেকেই পাওয়া যায়, আবার তীর্থ কেন? ছুটাছুটি করলে, ঘোরাঘুরি করলে ভাব জমবে না বরং শুকিয়ে যাবে। তাই হয়তো বলছেন, 'প্রেমের অঙ্কুর না হ'তে হ'তে সব শুকিয়ে যাবে।' তবে বারণও করেননি। শুধু বললেন, শীঘ্র এস। অধ্যাত্মে বিশ্বাসের জন্য মহেন্দ্রবাবুর বাপের প্রশংসা করলেন। উদারতা ও সরলতার জন্য মহেন্দ্রবাবুরও প্রশংসা করলেন। এর ভিতর আবার যদু মল্লিকের চিন্তাও করছেন। মাষ্টার মশাই ভাবছেন, 'চৈতন্যদেবের ন্যায় ইনিও কি ভক্তি শিখাইতে দেহধারণ করিয়াছেন।'

চৈতন্যলীলার সঙ্গে, অনেক জায়গায়, শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভক্তদের নিয়ে আনন্দ করার ব্যাপারে মিল আছে। মাষ্টার মশাই ঠাকুরের কাছে উল্লেখও করেছেন। ঠাকুরও এই ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহিত করতেন, কি কি মিল আছে জানতে চাইতেন। তার মানে মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কতখানি বুঝেছেন, কতখানি ধারণা করতে পেরেছেন তা এইভাবে জেনে নিতেন। ভক্তদের ঠাকুর এইভাবে পরখ করতেন। শুধু তাই নয়, লৌকিক জীবনেও তাদের পরীক্ষা করতেন, খুঁটিনাটি লক্ষ্য করতেন। আবার কোথাও ত্রুটি থাকলে সংশোধনও করে দিতেন, যাতে তাঁদের ভিতর খুঁত না থাকে।

সব ধর্মপথের লক্ষ্য—সেই পরমেশ্বর

ঠাকুর শিবনাথকে দেখতে যাচ্ছেন। কারণ শিবনাথ ভগবানকে ডাকে, আর যে ভগবানকে ডাকে তার ভিতর সার আছে। তাই শিবনাথের প্রতি ঠাকুরের এত আকর্ষণ। শিবনাথ ব্রাহ্ম সমাজের একজন নেতা। নিরাকারে বিশ্বাসী, তবে সাকারবাদীদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ নন। বাড়ীতে শিবনাথকে না পেয়ে ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে এসেছেন।

এখানকার বেদীতে প্রণাম জানাচ্ছেন। বলছেন, এই বেদীতে বসে ভগবানের কথা হয়, তাই ওটি পবিত্র বস্তু। ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য লোক যদি ঠাকুরকে যথাযথ সম্মান না করে সেই আশঙ্কায় নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমাজ-মন্দিরে যেতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, 'আমি বলি সকলেই তাঁকে ডাকৃছে। দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। কেউ বলছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার—অর্থাৎ যে যেটা মানে তাতেই বিশ্বাস পাকা করে থাকুক, সেইভাবেই তাঁকে চিন্তা করুক। তবে বারবারই বলেছেন, মতুয়ার বুদ্ধি ভাল না। অর্থাৎ আমি যেটা জানি শুধু সেইটাই ঠিক আর সকলের মত ভুল—এই বুদ্ধি ভাল নয়। অন্যমত ভুল কি ঠিক আমি জানি না—এ দৃষ্টিভঙ্গি ভাল। কারণ অন্যমত অনুসরণ করে তার যাথার্থ্য নির্ণয় তো করিনি, সুতরাং ভুল বলে জানব কি করে? ঠাকুর সেজন্য বার বার বলেছেন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না হলে তাঁর স্বরূপ বোঝা যায় না।

একথাও বলেছেন, সকলেই এক বস্তু চাইছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চাইছে। বলছেন যার পেটে যা সয়, মা তার জন্য সেইরকম ব্যবস্থা করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুশীলন করবার বিভিন্ন পথ তিনিই সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ নিজের নিজের রুচিমত এক একটি পথ দিয়ে চলতে পারে। ঠাকুর বলছেন, আমি মাছ সবরকমে খেতে ভালবাসি। অর্থাৎ সবরকম পথ দিয়ে তাঁকে অনুশীলন করতে চাই। বাস্তবিক তিনি তাঁর জীবন দিয়ে তাই করেও দেখিয়েছেন। আর বলছেন, তিনি যে নানারকম ধর্ম আচরণ করেছেন সেগুলিই ঈশ্বর নয়, ঈশ্বরকে পাবার বিভিন্ন পথ। তাই এ-ও মনে রাখতে হবে, আমি এখনও তাঁকে লাভ করতে পারিনি, শুধুমাত্র একটি পথ ধরে চলেছি। সুতরাং অন্যমত ভ্রান্ত বলার অধিকার নেই। যদি আন্তরিক ভাবে চলা শুরু হয় তবে ঠাকুর আশ্বাস দিচ্ছেন, ভুল পথ হলেও তিনিই শুধরে দেন। যেমন

বলেছেন, জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে ভুল পথে গেলেও কেউ না কেউ ঠিক পথটি বলে দেয়। তখন সে জগন্নাথ দর্শন করতে পারে। সুতরাং নিজের পথের উপর আন্তরিক নিষ্ঠা আনতে হবে, তার উপরই ঠাকুর খুব জোর দিয়েছেন। অন্যে কে কি করছে তার উপর কটাক্ষ করা——এগুলি অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ।

এরপর নিরাকারবাদীদের প্রশংসা করে বললেন, 'তা তোমাদের মতটি বেশ তো'। তাঁকে যেভাবে আস্বাদন করতে চাও সেইভাবেই পাবে। বহুরূপীর গল্প দিয়ে বোঝালেন, তিনি সব হতে পারেন। একটা ঠিক জানলে অন্যটাকেও জানা যায়।

ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বিজয়ের সম্বন্ধে বলছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা দেন। তবে তখনকার দিনের মতের ভিতর যে একদেশীভাব থাকত তাঁর বক্তৃতার মধ্যে সেটা ছিল না। তিনি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশেন বলে সমাজের ভক্তেরা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই ঠাকুর তাঁকে বোঝাচ্ছেন. যে ভগবানের পথে চলছে তাঁর কাছে নিন্দা স্তুতি সমান। কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। কামার শালার নেহাই-এর মতো নির্বিকার হয়ে থাকবে। যে যা বলে বলুক তুমি সব সহ্য করবে। ঋষিরা বনে ঈশ্বরচিন্তা করতেন। সেখানে বাঘ-ভাল্লুক আছে। তাদের ভয়ে তাঁরা কি ঈশ্বর চিন্তা ছেড়ে দিতেন? তবে একটু সাবধানে থাকতে হয়। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ করা দরকার। তা নাহলে অসৎ প্রভাবটা হয়তো মনের উপরে পড়ে তাতে মনকে বিকৃত করে দেয়। সৎসঙ্গ হলে সৎ-অসৎ বিচার আসে, নাহলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে।

সংসার ধর্মেরও লক্ষ্য—সেই ভগবানের পাদপদ্ম লাভ

বিজয় ঠাকুরকে কিছু উপদেশ দিতে বলছেন। ঠাকুর বলছেন, তোমাদের সাধনা বেশ। 'সারও আছে মাতও আছে।' গুড়ের

ভিতর ঝোলা অংশটাকে মাত বলে, বাকী অংশটা সার ভাগ। ঠাকুর বলছেন, শুধু সারটুকু হওয়া ভাল নয়। ভালমন্দের ভিতর থাকলে খেলা চলে 'আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি' তাই খেলা চলে না। তোমাদের সংসারের দিকেও দৃষ্টি আছে আবার ভগবানের পথে যাওয়ারও আগ্রহ আছে। এই সংসার আমার নয়, তোমার—এই দৃষ্টিতে সংসার করলে সংসার বন্ধনের কারণ হয় না। বড়লোকের বাড়ীর ঝি-এর মতো সংসারে থাকতে হয়। সে বাড়ীর সব কাজ করে, বাবুর ছেলেদের নিজের ছেলের মতোই লেখাপোনা করে, মনে কিন্তু ঠিক জানে এ বাড়ী আমার বাড়ী নয়, এ ছেলেও আমার ছেলে নয়। আমার বাড়ী সেই গ্রামের ভিতর। সেইরকম সংসারে আমরা যেন নিজেদের জড়িয়ে না ফেলি। মনে রাখতে হবে আমাদের নিজেদের বাড়ী, আসল স্থান হচ্ছে সেই ভগবানের পাদপদ্ম। স্বামীজীর 'মন চল নিজ নিকেতনে'—গানটি ঠাকুর খুব পছন্দ করতেন। অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে আন্তরিক ভাবে চাইলে তাঁকে পাওয়া যায়।

এরপর ঠাকুর অধরের বাড়ী প্রতিমা দর্শন করবার জন্য এখান থেকে উঠে পড়লেন। ব্রাহ্ম-ভক্তদের নমস্কারের বিনিময়ে তিনিও প্রতিনমস্কার জানালেন। ঠাকুর যে কতখানি উদারভাবাপন্ন ছিলেন, সকলের সঙ্গে তাঁর যে কিরূপ মিত্রতা ছিল তা এই ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে সপ্রেম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

এগারো

২. ১৬ ১-২

আজ মহাষ্টমীর দিনে অধরের বাড়ীতে প্রতিমা দর্শনের পর শ্রীরামকৃষ্ণ রাম দত্তের বাড়ীতে এসেছেন। সেখানে বিজয় ও কেদারকে একত্র দেখে হাসতে হাসতে বললেন, 'আজ বেশ মিলেছে। দুজনেই এক ভাবের ভাবী'। অর্থাৎ ভক্তিরসে দুজনেই একেবারে পরিপূর্ণ।

ঠাকুরের সাধ

ঠাকুর বলছেন, 'মনে চারিটি সাধ উঠেছে।' প্রথম বললেন, 'বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল খাব।' এটি গৃহধর্ম অনুসারে বলছেন। দ্বিতীয় সাধ—'শিবনাথের সঙ্গে দেখা ক'রবো।' অর্থাৎ শিবনাথ ভক্ত, তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। আর দুটি সাধ, হরিনামের মালা এনে ভক্তেরা জপবে, দেখবো। আর আটআনার কারণ অষ্টমীর দিন তন্ত্রের সাধকেরা পান ক'রবে, তাই দেখবো আর প্রণাম ক'রবো।' আমাদের মনে হতে পারে ঠাকুরের এরকম আচরণের উদ্দেশ্য কি? ঠাকুর পরে বলছেন কারণ দেখে তিনি মহাকারণের কথা মনে ভাববেন। মহাকারণের সঙ্গে ভক্তদের সম্পর্ক বা যোগ এরই প্রতীক রূপে তাদের কারণ পান। সেটা দেখবেন, দেখে ঠাকুর ভগবানের নেশায় বিভোর হবেন।

মহাকারণের ভাবে মাতাল ঠাকুর

এবার নরেনের দিকে চোখ পড়তেই তিনি সব ভুলে গেলেন। দাঁড়িয়ে উঠলেন, নরেনের হাঁটুতে একটি পা দিয়ে অনেকক্ষণ বাহ্যশূন্য

অবস্থায় রইলেন। 'অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল। এখনও আনন্দের নেশা ছুটিয়া যায় নাই।' আনন্দের নেশা মানে সমাধি অবস্থায় ঠাকুরের একটা নেশার ঘোরের মতো অবস্থা হোত। মাতালদের মতো দেহের উপরেও কোন কর্তৃত্ব বোধ থাকত না। তবে এ মাতাল সাধারণ মাতাল নয়, ঈশ্বরীয় ভাবে মাতাল—সাধারণ লোকে যাঁকে বোঝে না।

ঠাকুর বলছেন, 'সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ! ব'লবো? না, আজ কারণানন্দদায়িনী! কারণানন্দময়ী।' কারণ কথাটির মানে বলেছেন, জগৎরূপ কার্য তার কারণে লয় হয়। জগতের স্রষ্টা হচ্ছেন এই জগতের কারণ, আবার কারণ মহাকারণে লয় হয়। মহাকারণ বলতে সেখানে আর কোন ব্যক্তিত্ব নেই। জগৎস্রষ্টারূপ ঈশ্বরের ভিতরে ব্যক্তিত্ব আছে কিন্তু মহাকারণের ভিতরে কোন ব্যক্তিত্ব নেই তাই তাঁকে অব্যক্ত বলা হয়েছে। এখানে বলছেন, 'স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ! মহাকারণে গেলে চুপ। সেখানে কথা চলে না।' আগে বলেছেন, 'সা রে গা মা পা ধা নী। নী-তে থাকা ভাল নয়—অনেকক্ষণ থাকা যায় না। এক গ্রাম নীচে থাক্‌বো।' কেন? না, তাহলে ভক্তদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান সম্ভব হবে। তার উপরে গেলে একেবারে সমাধিস্থ। যেখানে গেলে আর বক্তা নেই, শ্রোতা নেই।

ঈশ্বরকোটি, জীবকোটি ও নিত্যসিদ্ধ

তারপর ব্যাখ্যা করছেন, 'ঈশ্বরকোটি মহাকারণে গিয়ে ফিরে আসতে পারে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা উপরে উঠে, আবার নীচেও আসতে পারে। ছাদের উপরে উঠে, আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে আনাগোনা করতে পারে। অনুলোম, বিলোম।' অনুলোম মানে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যাওয়া আর বিলোম মানে সূক্ষ্ম থেকে নেমে স্থূলে আসা।

উপমা দিয়ে বলছেন, 'রাজার ছেলে, আপনার বাড়ী সাত-তোলায় যাওয়া আসা কর্তে পারে।' সাততলা মানে মনের সাতটি কেন্দ্র আছে যার উপর দিয়ে ধাপে ধাপে মন উপরে ওঠে। সাততলায় ওঠা মানে মহাকারণে লয় হওয়া। ঠাকুর বলছেন, অবতার পুরুষেরাই এই সাততলা অবধি উঠে ফিরে আসতে পারেন, সাধারণ মানুষ পারে না। অবতার পুরুষেরা জীবের মঙ্গলের জন্য সমাধির উচ্চতম স্তরে উঠেও আবার নেমে আসেন। লোককল্যাণকামনার সূত্র ধরেই তাঁরা স্থূল জগতে নেমে আসেন। কিন্তু সাধারণ লোক যখন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তীব্র সংগ্রাম করে একটু একটু এগিয়ে গিয়ে সূক্ষ্ম তত্ত্বে কোনো রকমে পৌছায় আর তাদের নীচে নামার কোনো সূত্র থাকে না। নীচের সব আকর্ষণ মুক্ত হয়ে তারা সেই মহাকারণে লয় হয়ে যায়, তাদের ব্যক্তিত্ব আর থাকে না। এখন কথা হল যে, এরকম ব্যক্তিত্বহীন হওয়াই তো ভাল। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, সাধারণ লোক একবার খেলায় জিততে পারলে আর ঘুঁটি কাঁচাতে পারে না, পাকা খেলোয়াড় আবার ঘুঁটি কাঁচিয়ে খেলতে পারে। অবতার পুরুষেরা ইচ্ছামত মায়ার পারে যেতে পারেন, মায়ার ভিতর দিয়ে ফিরতেও পারেন। কোথাও আটকে যাবার ভয় নেই।

এখন এই ওঠানামার ব্যাপারটা আমরা কল্পনা করি মাত্র, বোঝার সামর্থ্য নেই। যিনি সর্ববাসনাশূন্য হতে পেরেছেন একমাত্র তিনিই এটি বুঝতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব বাসনা নির্মুক্ত, তাঁর পক্ষে সাততলায় থাকাও যা নীচের তলায় থাকাও তা। তাই তাঁর মন মত মহাকারণে পৌঁছে গেলেও জগৎ কল্যাণ বাসনাকে অবলম্বন করে ইচ্ছামত সেই দিব্য অনুভূতি থেকে নেমে আসতে পারে।

এরপর এক ধরণের তুবড়ীর কথা বলেছেন, এক একবার এক রকমের ফুল কাটে। ফুরোয় না। এই তুবড়ী ঠাকুর দেখেছেন। এখন সেই তুবড়ীর মতো অর্থাৎ সাধকের মনের ভিতরে যে শুভ

সংস্কার রয়েছে তারই ফলে এক এক ধাপে এক এক রকমের অনুভূতি হয়। এই বৈচিত্র্যের যেন শেষ নেই। আবার সব বৈচিত্র্যকে কাটিয়ে ইচ্ছে করলে সাধক সেই শেষ পর্যায়ে পৌছন যখন তুবড়ী আর কোন ফুল বার করে না। তুবড়ীর এই উপমা দিয়ে ঠাকুর ভগবৎ অনুভবের বৈচিত্র্য বোঝাচ্ছেন।

সাধারণ মানুষের ভিতর মানবিক অপূর্ণতা অশুদ্ধতা থাকার জন্য সে অত উঁচুতে উঠতে পারে না। যদি বা কেউ একটু উঁচুতে উঠল, কিছু দূর অবধি গিয়ে আবার নেমে আসে। ঠাকুর একটি বেজির উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন, বেজীর লেজে ইট বেঁধে দিয়েছে। কোনরকমে যদি বা গর্তে বসতে যায়, ইটের ভারে আবার নেমে যায়। সেইরকম যোগীর মনও যোগ অভ্যাস করতে করতে বারে বারে ধ্যেয় বস্তু থেকে নীচে নেমে পড়ে। বিষয়াকাঙ্ক্ষা হল ইট। বিষয়াকাঙ্ক্ষা আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে শুদ্ধ স্বরূপে স্থির থাকতে দেয় না। কেবল যাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রভাব বেশী তারা একবার পরমতত্ত্বে পৌছে গেলে আর ফেরে না। 'আর একরকমের তুবড়ী আছে, আগুন দেওয়ার একটু পরেই ভস্ ক'রে উঠে ভেঙে যায়!' এই তুবড়ী যেন দেহ। দেহ-মন রূপ আধারের ভিতর দিয়ে যে নানা ভাববৈচিত্র্য প্রকাশ পাচ্ছে সেগুলি ঐ তুবড়ীর ফুল কাটা। তারপর ফুলকাটা বন্ধ হলে সব শান্ত স্থির হয়ে যায়। সেইরকম সাধকও নানা অনুভূতির পরে একেবারে শান্ত স্থির হয়ে যান। ঠাকুরের জীবনে এটা সুস্পষ্ট দেখা গিয়েছে। এক এক সময় একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তাই বললেন, 'জীবকোটির সাধ্য সাধনা ক'রে সমাধি হতে পারে। কিন্তু সমাধির পর নীচে আসতে বা এসে খপর দিতে পারে না।'

সমাধি শব্দের অর্থ হচ্ছে জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সম্যকরূপে স্থাপন করা। এর নানা স্তর আছে। এক একটি ধাপের ভিতর দিয়ে মন এগোতে থাকে। শেষে যখন সহস্রারে পৌছায়, তখন পরিসমাপ্তি।

স্বামীজী বলছেন, একত্বের পর আর উন্নতি হয় না। কারণ তারপর আর কিছু কল্পনা করা যায় না। যতক্ষণ বহুত্ব আছে, **duality** আছে ততক্ষণই সেই বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে যাবার চেষ্টা চলে। একের রাজ্যে পৌছালে তার আর কোন বৈচিত্র্য থাকে না। তাই সেখানে আর জীবের পক্ষে নিজের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় না। এইজন্য বলছেন, জীবকোটি সেই সাততলায় যেতে পারে না কিন্তু রাজার ছেলে সাততলায় অবাধে ঘোরাফেরা করতে পারে। ঠাকুরের সাধনা মুক্তি অর্জন করবার জন্য নয় কারণ মুক্তি তাঁর স্বতঃসিদ্ধ, তাঁর সাধনা সমস্ত অজ্ঞানকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য। যেমন আলো যখন অন্ধকারকে নাশ করে তখন আলো এবং অন্ধকারের নাশ্য-নাশক সম্বন্ধ হয়। আলো হল নাশক, অন্ধকার নাশ্য। এখন, আলো অন্ধকারকে নাশ করে দিলে আলোকে একটি ক্রিয়াশীল বস্তু বলতে হবে। এই সমস্যা সমাধান করবার জন্য বলা হয় যতক্ষণ নাশ করবার বস্তু থাকে ততক্ষণ সে নাশ করে। আলোকের যখন নাশ করবার বস্তু থাকে না তখন সে স্বপ্রকাশ-রূপে অবস্থান করে, তখন সে আর প্রকাশক বা নাশক নয়। তাত্ত্বিক বিচারকরা বলেন, যতক্ষণ বস্তু থাকে ততক্ষণ আলো প্রকাশ করে। বস্তু না থাকলে আর কি প্রকাশ করবে? সে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করবে। কিন্তু নিজেই নিজেকে প্রকাশ করলে তর্ক বিরোধ ঘটে অর্থাৎ কর্তৃ-কর্ম বিরোধ ঘটে। যা কর্তা তা কর্ম হতে পারে না, যা কর্ম তা কর্তা হতে পারে না। কুমোর ঘট করছে কুমোর হল কর্তা, ঘট হচ্ছে তার কার্য। সে ঘট করছে মাটি দিয়ে, মাটি হল উপাদান। এখন হাঁড়িগুলো ভেঙে দিলে মাটি থাকে। মাটিটাকেও যদি কল্পনায় সরিয়ে নিতে পারি, কুমোরের আর হাঁড়ি করা হবে না। কুমোর তখন নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। তখন কি তার নাশ হয়ে গেল? তা নয়। তখন শুধু সে নিজেই রইল নিজের প্রকাশক হয়ে।

তাই বলা হল সে স্বপ্রকাশ। এইরকম কোন জায়গায় একটি স্বপ্রকাশ বস্তু যদি না মানা যায় তাহলে জগতে কোন বস্তুরই প্রকাশ সম্ভব হয় না। বিষয়কে প্রকাশ করছে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়কে মন প্রকাশ করছে। মনকে কে প্রকাশ করছে? বলছেন, মনকে প্রকাশ করছেন মনের যিনি অধিষ্ঠাতা। মনে অবস্থিত হয়ে মনকে যিনি প্রকাশ করছেন, তিনি শুদ্ধ চৈতন্য। কিন্তু মনের যদি নাশ হয়ে যায় তখন আর তার প্রকাশক কে থাকবে? যখন আর কোন প্রকাশ্য থাকে না তখন যিনি অবশিষ্ট আছেন তিনি স্বপ্রকাশ। আগেই বলা হল বিষয়কে ইন্দ্রিয় প্রকাশ করছে, ইন্দ্রিয়কে মন প্রকাশ করছে, মনকে বুদ্ধি প্রকাশ করছে, বুদ্ধিকে কে প্রকাশ করছে? বলছেন, বিজ্ঞাতা প্রকাশ করছে? বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ—বিজ্ঞাতাকে কি উপায়ে জানবে? আলো দিয়ে আমরা সব জিনিসকে দেখি, আলোকে দেখব কি দিয়ে? আলো স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ বস্তুকে না মানলে কোন বস্তুর প্রকাশ সম্ভব হবে না। এই চরম প্রকাশকের আর অন্য প্রকাশক কল্পনা করা যায় না, করলে অনবস্থা দোষ বলে। ইংরাজীতে বলে **Regressum-ad-infinitum.** কাজেই আত্মা হচ্ছে শুদ্ধচৈতন্য যা স্বপ্রকাশ।

এরপর ঠাকুর ভক্তের আর একটি শ্রেণীর কথা বলছেন, নিত্যসিদ্ধের থাক, জন্মাবধি যারা ঈশ্বরকে চায়। এরা বেদে উল্লিখিত হোমা পাখীর মতো। হোমা পাখী এত উঁচুতে ডিম পাড়ে যে সেই ডিম নীচে পড়তে পড়তেই ছানা হয়ে তার চোখ ফুটে যায়। তখন আর মাটিতে না পড়ে মায়ের দিকে ছোটে। পৃথিবীর সঙ্গে তাদের সংস্পর্শ হয় না। নিত্যসিদ্ধদেরও এইরকম। মাটির স্পর্শ তাঁদের লাগে না। যে জ্ঞানের থেকে তাঁদের উৎপত্তি, সেই জ্ঞানে তাঁরা ফিরে যান। 'অবতারের সঙ্গে যারা আসে, তারা নিত্যসিদ্ধ। কারু বা শেষ জন্ম।' খুব শুদ্ধ না হলে অবতারের সঙ্গে এইরকম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় না।

ভাবগ্রাহী ঠাকুর

এবার ভক্ত কেদার গান করছেন। তিনি বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন তাই তাঁর গানের ভাবগুলি সব ঐ রকমের। কখনও জগন্মাতার নাম হচ্ছে, কখনও শ্রীগৌরাঙ্গের নাম হচ্ছে। বিভিন্ন ভাব কিন্তু তাতে ঠাকুরের কিছু বিসদৃশ বোধ হচ্ছে না কারণ তাঁর কাছে সবই এক। গানের পর গান হচ্ছে। যাঁদের ঠাকুরের কাছে আসবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁদের কাছে এটি নিত্য দৃশ্য। যখনই ঠাকুরের কাছে কিছু ভগবদ্ ভাবের প্রসঙ্গ উঠত ঠাকুর আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন, তাঁর সেই আত্মহারা ভাবের প্রকাশ হোত কখনও গভীর সমাধিমগ্ন অবস্থায়, কখনও নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়ে। আর সেই গানের ভিতরে থাকত কি প্রবল উন্মাদনা। এটি লক্ষ করবার কোন একটি ভাব নিয়ে ঠাকুর অন্যভাবকে দূরে সরিয়ে রাখতেন না। মনে হোত বিভিন্ন ভাব যেন তাঁর মধ্যে একজায়গায় মিলেছে। এটি ঠাকুরেরই বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য ক্ষেত্রে একটি ভাব প্রকাশ করতেই হয়তো জন্মজন্মান্তর কেটে যায়। কিন্তু ঠাকুরের যন্ত্র এমন ভাবে তৈরী যে, যে সুর যখন যেদিক থেকেই বাজুক না ঠাকুর তাতেই সাড়া দিচ্ছেন এবং একেবারে তন্ময় হয়ে যাচ্ছেন। আবার সকলকে সেইভাবে ভাবিত করে দিচ্ছেন। এটি অসাধারণ বস্তু যা কোথাও দেখা যায় না। শাস্ত্রে আছে, ভাবের ব্যভিচার অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবের যে মিশ্রণ সেটা সাধকের পক্ষে সর্বদা পরিহার্য। কিন্তু ঠাকুরের শাস্ত্র একটু ভিন্ন। সকল ভাবের পরিপূর্ণ সাধনা করে তিনি তাঁর জীবন এমনভাবে তৈরী করেছেন যে, ভাবের মিশ্রণ সেখানে সাধনাকে ব্যাহত করে না, কারণ যে কোন ভাবই মুহূর্ত মধ্যে সেখানে পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হচ্ছে।

কারণানন্দ ও সহজানন্দ

এখানে সুরেন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের কথাটি অনুধাবন করবার মতো। সুরেন্দ্র অতিরিক্ত পানাসক্ত। ঠাকুর চিন্তিত কিন্তু তাঁকে পান করতে একেবারে নিষেধ করলেন না। ভগবানকে নিবেদন করে অল্প মাত্রায় পান করতে বললেন। পরে বলছেন, 'তাঁকে চিন্তা করতে করতে তোমার আর পান করতে ভাল লাগবে না। তিনি কারণানন্দদায়িণী। তাঁকে লাভ করলে সহজানন্দ হয়।' মানুষ সাধারণত দুটি কারণে নেশা করে। একটি হচ্ছে সংসারের দুঃখকষ্ট ভুলে থাকবার জন্য। অপরটি হচ্ছে একটু আনন্দ পাবার জন্য। ঠাকুর বলছেন, যদি কেউ ভগবানকে ভালবাসতে পারে তাহলে তার আর দুঃখ কষ্টকে ভুলবার চেষ্টা করতে হয় না, কারণ দুঃখ কষ্ট তখন আব তাকে ততটা বিচলিত করতে পারে না। এটি প্রথম কথা মনে রাখবার। আর আনন্দের জন্য যদি নেশা করতে হয় তাহলে ভগবদ্ আনন্দের কাছে আর সব আনন্দই পানসে। নেশার আনন্দ সেখানে তুচ্ছ। ঠাকুর কাকেও নেশা ছাড়তে বলেননি, পরিমিত রাখতে বলেছেন। এখানে সুরেন্দ্রকে ভগবানকে নিবেদন করে নেশা করতে বলেছেন। তাহলে প্রত্যেক সময় স্মরণ করার ফলে ক্রমশ মনে সহজানন্দ এসে উপস্থিত হবে-তখন আর তাঁকে নেশা করে আনন্দ পেতে হবে না। কোনো কোনো সাধুসম্প্রদায় কখনও কখনও গাঁজা খেয়ে ধ্যানে বসেন। তান্ত্রিকেরাও কারণ পান করে জপধ্যানে বসেন। তার কারণ ঐ নেশার জন্য মনের ভিতরে অবস্থিত যে বিরুদ্ধ ভাবগুলি বাধা দিচ্ছে সেগুলি কিয়ৎ পরিমাণে দূর হয়, ফলে ভগবদ্ আনন্দ মনে নির্বাধে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ মনের ভিতরে যে ভাবটা ছিল নেশার ফলে তা আরও প্রবল হয়ে ওঠে এবং বিপরীত ভাবটা দূর হয়ে যায়। তাই নেশা করবার আগে সাধক পূজাদি করে ভগবদ্ ভাবে মনকে নিবিষ্ট করবার চেষ্টা করেন, তার ফলে সেই ভগবদ্ ভাবটি তাঁর মধ্যে

উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এর দোষ হচ্ছে মনের উপর প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা শিথিল হয়ে যায়। ফলে মনের ভিতরে কোন অসৎ বৃত্তি উঠলে তাকেও সংযত করা যাবে না। সুতরাং নেশা আপাতদৃষ্টিতে হয়তো আনন্দ দেয় কিন্তু তার পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর। মানুষের ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব, মনের শৃঙ্খলা সব লুপ্ত হয়ে যায়। তাছাড়া এই কৃত্রিমভাবে মনকে উদ্দীপিত করে সাধন পথে যাওয়ার ফল স্থায়ী হয় না। নেশার মুখে মনে কোনোও মন্দভাব এসে পড়লে সে ভাবটা প্রবল হয়ে ওঠে, নিজেকে সংযত করবার মতো শক্তিও তখন থাকে না। সেইজন্য ঠাকুর এসব থেকে খুব সাবধান হতে বলেছেন। বিশেষ করে তাঁর যেসব সন্তানরা তাঁর ভাবের ধারক এবং বাহক হবেন তাঁদের বারবার বলেছেন, ওসব ভাল না। বলেছেন, সহজানন্দ এলে আর কারণানন্দের প্রয়োজন হয় না। আনন্দ যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত সেখানে কৌশলে আনন্দ উদ্দীপিত করা—এটা যেন অলৌকিক উপায়ে মনকে একটা বিকৃত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। এর দ্বারা কখনও ধর্মজীবনের কল্যাণ হয় না। এখানে মনে রাখতে হবে যাঁরা এই পথের পথিক ঠাকুর তাঁদের দেখেছেন, সঙ্গ করেছেন। তাতে তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে এঁরা সাধনের পথে না এগিয়ে প্রায়শ বিপথগামী হন।

বারো

২. ১৭. ১-৫

ঈশ্বরকোটির বিশ্বাস ও জীবকোটির বিশ্বাস

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথকে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা বলছেন, 'কি জানিস্, যারা জীবকোটি, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। ঈশ্বরকোটির বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ।' উপনিষদ্ বলছেন, সাক্ষাৎ দর্শন হলে তবে সংশয় দূর হয়—'ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'॥ (মুণ্ডক ২. ২. ৮)—কার্য ও কারণরূপী সেই পরমাত্মাকে দেখলে সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ বাসনা কামনাগুলো দূর হয়, সব সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সাক্ষাৎ অনুভব না হওয়া পর্যন্ত অজ্ঞান কিছুতেই দূর হয় না। এই জগৎটাকে আমরা সাক্ষাৎ দেখছি, পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে পদে পদে অনুভব করছি, তাহলে কি করে বিশ্বাস করি যে সব মিথ্যা। শাস্ত্র বলছেন, প্রত্যক্ষ মিথ্যা জ্ঞান দূর করতে হলে প্রত্যক্ষ সত্য জ্ঞান থাকা চাই। অনুমানের দ্বারা বা কারো কথায় জ্ঞান হবে না, শাস্ত্র পড়েও হবে না, সাক্ষাৎ অনুভব দরকার। ঠাকুরও একথা বার বার বলেছেন।

বিপরীত ভাবের কথা শুনলে ঠাকুরের মনে অত্যন্ত আঘাত লাগে। সেজন্য বিপরীত ভাবের লোকেদের তিনি কাছে রাখতে চাইতেন না। সূক্ষ্ম মনে বিপরীত ভাব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়। তাই হাজরার সম্বন্ধে মাকে জানাচ্ছেন, 'হয় ওকে বুঝিয়ে দে, নয় এখান থেকে সরিয়ে দে'। হৃদয় ঠাকুরের কাছে থাকতে চাইলেও অনুরূপ কারণে তিনি রাখতে পারেননি। চৈতন্যচরিতামৃততেও দেখা যায় বিপরীত ভাবের লোকেদের শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে যেতে দেওয়া হোত না।

এরপরে জ্ঞান অজ্ঞান সম্বন্ধে বলছেন, 'যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে এই বোধ ততক্ষণ অজ্ঞান, যতক্ষণ হেথা হেথা বোধ ততক্ষণ জ্ঞান'। উপনিষদে আছে, 'তদ্দূরে তদন্তিকে'—তিনি দূরে তিনি নিকটে, উভয়ত্রই তিনি। সর্বব্যাপী হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাঁকে দূরে দেখি, তখন সেটি অজ্ঞান, আবার যখন কাছে দেখি সেটি জ্ঞান। অর্থাৎ কাছে দেখলে দূরেও দেখা যায়। আর একটি কথা বললেন, 'যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিস চৈতন্যময় বোধ হয়।' তখন জগতের মধ্যে খানিকটা জড় আর খানিকটা চেতন এ পার্থক্য বোধ চলে যায়, সব জায়গায় চৈতন্যকে অনুভব করা যায়। তবে সাধারণ মানুষের মনে এ বিশ্বাস জাগে না, জড় ও চেতনের পার্থক্য তারা অস্বীকার করতে পারে না। সরল বিশ্বাসী মন এগুলি ধারণা করতে পারে। ঠাকুর এমনি সরল ছিলেন। তিনি কোথায় শুনেছেন, সাপে কামড়ালে সেখানে আবার যদি সাপ কামড়ায় তো বিষ উঠে যায়। তাই আবার কামড়াবে বলে গর্তে পা ঢুকিয়ে বসে আছেন। বালকের মতো যা বলা যেত তাই বিশ্বাস করতেন। অবশ্য সরল বিশ্বাস মানে এই নয় যে, তাঁদের মন যে অবস্থায় আছে তার প্রতিকূল কিছু বললেও তাঁরা সেটি বিশ্বাস করে নেন। তাঁদের যদি বলা যায় জগৎটায় চৈতন্য বলে কিছু নেই, সবই জড়ের খেলা, তাতে কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেন না। কারণ তাঁরা নিত্যসত্যকে সবসময় সর্বত্র প্রত্যক্ষ করছেন, কাজেই এই বিষয়ে তাঁদের বিশ্বাস ক্ষণভঙ্গুর নয়, একেবারে দৃঢ়। তবে সাধারণ ব্যক্তির কথায় তাঁদের মনে একটু দোলা লাগে। তাই নরেন্দ্র যখন বললেন, তুমি আমাদের ভালবাস এতে তোমার বন্ধন হবে, ঠাকুর ভয় পেয়ে জগন্মাতার কাছে ছুটে গেলেন। মা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রশ্নের সমাধান করে দিলেন, ওদের ভিতর নারায়ণকে দেখিস তাই ওদের ভালবাসিস। তখন বলছেন, দূর শালা, তোর কথা আর লব না। এই হল ঠাকুরের সহজ সরল বিশ্বাস। এইরকম বিশ্বাস থাকায় বিপরীত

কথা কেউ বললেও সমাধানও যেন তাঁর হাতের মুঠোয়। অর্থাৎ ভিতরে প্রবেশ করলেই হল, সকল সমাধান সেখানেই। সত্য সেখানে সদা প্রতিভাত রয়েছে তার উপরে আর সংশয়ের কালো ছায়া পড়ে না।

ঈশ্বরকোটির সহজ সাধন

হাজরাকে মালা জপ করতে দেখে ঠাকুর বলছেন যে, তিনি মালা জপ করতে পারতেন না। মালা হাতে নিলেই মন সমাধিস্থ হয়ে যেত কাজেই আর জপ করবেন কি করে? এটি হচ্ছে সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত যে যখন ভগবানের নামে মন আপনিই বিভোর হয় তখন আর নানা উপকরণ নিয়ে সাধন করার দরকার হয় না, সম্ভবও হয় না। বলছেন, 'বাঁ হাতে পারি, কিন্তু উদিক (নামজপ) হয় না।' একবার নাম করতে গেলেই ভাব গভীর হয়ে যায়, বার বার উচ্চারণ করে জপ করা সম্ভব হয় না।

খেলার ছলে ভবনাথ ব্রহ্মচারী সেজে ঠাকুরের সামনে এসেছেন। স্বামীজী তাই রহস্য করে বলছেন, 'ও ব্রহ্মচারী সেজেছে আমি বামাচারী সাজি।' কিন্তু ঠাকুর একথা এড়িয়ে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন।

একজন সাধু ঠাকুরের কাছে এসেছেন। সাধুটি খুব রাগী। ঠাকুর তাঁকে দেখেই সসম্ভ্রমে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সাধু দুই এক কথা বলে চলে যাবার পর ভবনাথ হেসে বললেন, আপনার সাধুর উপর কি ভক্তি। ঠাকুর বলছেন, 'যাদের তমোগুণ, তাদের এইরকম করে প্রসন্ন করতে হয়।' যেহেতু এর সাধুর বেশ সেহেতু এই বেশ যে ত্যাগের আদর্শের পরিচায়ক তাকে সম্মান দেবার জন্যই সাধুকেও সম্মান দেখাতে হয়।

গোলকধাম খেলা হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, যারা আন্তরিকভাবে ভগবানকে ডাকে তাদের খেলাতেও ভুল হয় না। 'ঈশ্বরের এমনও আছে যে, ঠিক লোকের কখনও কোথাও তিনি অপমান করেন না।'

মাতৃভাব শ্রেষ্ঠভাব

পুনরায় কর্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা উঠল। ঠাকুর বলছেন, 'কি জান, আমার ভাব মাতৃভাব। সন্তানভাব মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব, এতে কোন বিপদ নাই।' ভগবানের প্রতি এক একটা ভাব আরোপ করতে হয়। কোন জায়গায় তাঁকে মা বা পত্নীরূপে, কোন জায়গায় তাঁকে সখী বা সন্তানরূপে দেখার কথা বলা হয়েছে। এই ভাবগুলি ভগবানে আরোপ করতে হয়, এ তাঁকে লাভ করবার উপায়; কিন্তু এই আরোপ করতে গিয়ে মানুষের মন প্রাকৃতিক সুখে মগ্ন হয়ে যায়, ভগবানকে বিস্মরণ হয়। তাই বলছেন, ওসব নোংরা পথ। মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব। যতক্ষণ আমি বুদ্ধি আছে ততক্ষণ তাঁকে বাপমায়ের মতো মনে করবে।

সোঽহং

ঠাকুর ঘনিষ্ঠ ভক্তদের কাছে একান্তে বলছেন, 'শেষে এই বুঝেছি, তুমি পূর্ণ আমি অংশ; তিনি প্রভু 'আমি' তাঁর দাস। আবার এক একবার ভাবি, তিনিই আমি, আমিই তিনি!' এই যে তিনটি প্রকারের কথা বলছেন—পূর্ণ এবং অংশ, প্রভু এবং দাস আর সোঽহং—এই তিনটিই তাঁর ভাব, তবে কোন সময় কোন ভাবটি কার কাছে প্রকাশ করবেন সেটি অধিকারী ভক্তের উপরে নির্ভর করে। তবে সোঽহং ভাবটি খুব উচ্চভাব। 'আমি' বুদ্ধি থাকলে এ ভাব ভিতরে ধরে রাখা কঠিন হয়। এইজন্য ঠাকুর বলছেন, নিজেকে ভগবানের দাস, তাঁর সন্তান মনে করবে। তাহলে আর পতনের কোনো ভয়ের আশঙ্কা নেই।

ভবনাথ এখানে আর একটি দরকারী কথা তুললেন। বললেন, কারো উপর যদি মন অপ্রসন্ন থাকে তাহলে মনে বড় ব্যথা লাগে কারণ তাহলে তো সকলকে ভালবাসা হল না। ঠাকুর উত্তরে বললেন

যে, 'যদি অন্যের মন পাওয়া না গেল, ত রাতদিন কি ঐ ভাবতে হবে? যে মন তাঁকে দেব, সে মন এদিক ওদিক বাজে খরচ করব?' ভগবানকে ভালবাসা শেষ কথা! তাঁকে পেলেই সবাইকে পাওয়া হবে, তবে দেখতে হবে কারো সঙ্গে বিরোধ না হয়। আসল কথাটি মনে রাখতে হবে যে মন একটিই এবং তা তাঁকেই দেব, তার বাজে খরচ যেন না হয়)

তারপর নিজের সাধনের কথা বলছেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা বলে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছিলেন। 'তখন ভয় হলো মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন। লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য অবজ্ঞা কল্লুম। যদি খ্যাঁট বন্ধ করেন। তখন বললুম, মা তোমায় চাই, আর কিছুই চাই না;' ভবনাথ বলছেন, এ পাটোয়ারী। ঠাকুর সহাস্যে বললেন, 'হাঁ, ঐটুকু পাটোয়ারী!' দৃষ্টান্ত দিলেন, একটি ভক্ত বর চাইল যেন সোনার থালায় নাতির সঙ্গে বসে খায়। একটি বরেই ঐশ্বর্য পুত্র পৌত্র সব চাওয়া হল।

কামনা থাকতে 'তোমাকে চাই' বলা কঠিন

সাধারণ মানুষ অন্তরে যা আকাঙ্ক্ষা করে, ভগবানের কাছে তাই চায়। অনেকে বলে, আমি কিছু চাই না শুধু ভগবানকে চাই কিন্তু সে শুধু কথার কথা, অন্তরের সঙ্গে এটি ভাবা খুব কঠিন। মনের ভিতরে সহস্র বাসনা কামনা রয়েছে, যদি জানে তাঁর কাছে এগুলি চাইলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে তবে না চেয়ে থাকতে পারে? যারা চাই না বলে তাদের সম্বন্ধে আমরা ধরে নিতে পারি যে তাদের মনে সন্দেহ আছে চাইলে সত্যিই পাওয়া যাবে কি না। বাসনাশূন্য না হলে তাঁকে চাওয়া যায় না। তাঁকে যে চাইবে তার সংসারের কোন জিনিসের প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকবে না। সেরকম কি হয়েছে? মানুষ নানান বন্ধনের মধ্যে জড়িয়ে আছে আর বলছে আমি তাঁকে ছাড়া আর কিছু

চাই না। এরকম সহজ করে দেখলে হবে না তাঁকে চাইলে শত সর্বনাশকে বরণ করে নেবার মতো মনের জোর চাই। তাঁকে চাওয়া মানে যদি সর্বস্ব খোয়ানো হয় তাহলে কজন আর তাঁকে চাইবে? এইজন্য তাঁকে চাই বলা সহজ কিন্তু অন্তরের সঙ্গে এই ভাবটি পোষণ করা খুব কঠিন। তবে মনকে বোঝান ভাল যে তাঁকে ছাড়া আর কিছু চাইতে নেই। এমনি ভাবতে ভাবতে মন হয়তো কোনোদিন একমাত্র তাঁকেই চাইতে পাবে। যারা আপাতদৃষ্টিতে খুব ভক্ত তাদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। কারণ তাদেরও ভগবানকে চাওয়ার পরিণামে যদি সর্বনাশ উপস্থিত হয় তারা কি সহ্য করতে পারবে? হাজরার মুখের কথা—ঠাকুর বলেছিলেন, ভগবান সর্বঐশ্বর্যশালী। তিনি কি কেবল ভক্তি তার মুক্তি দেন? তিনি ঐশ্বর্যও দেন। ঠাকুর বলছেন ওর ঐশ্বর্যের দিকে ঝোঁক আছে কাজেই সেইরকম করে ভগবানকে ভালবাসে। এটি তার মনের স্বাভাবিক গতি, দোষ দেবার কিছু নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে কেবল ভগবানকে চায় সে আর অন্য জিনিসের প্রতি আসক্তি পোষণ করতে পারে না এবং তার ভগবানের প্রতি ভক্তিও তীব্র বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। এরকম চরম ত্যাগ বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত আমরা সনাতন গোস্বামীর জীবনে দেখতে পাই যা অন্যত্র উল্লিখিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের মনে হাজার হাজার বাসনা থাকে আর সেসব তাঁর কাছে চাইবে না তো কার কাছে চাইবে? তবে তাঁকে চাওয়াই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। অনুসরণ করা কঠিন হলেও আদর্শটিকে সামনে রাখা ভাল, এটুকু আমাদের মনে রাখতে হবে।

যোগক্ষেমং বহাম্যহম্

প্রতাপ হাজরার সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। ঠাকুর বলছেন, 'হাজরা কিছু টাকা চায়, বাড়িতে কষ্ট। দেনা কর্জ। তা, জপধ্যান করে বলে,

তিনি টাকা দেবেন!' ঠাকুরের ভাব হচ্ছে এই যে, জপধ্যান করার সঙ্গে টাকার সম্বন্ধ রাখা উচিত নয়। একজন ভক্ত বলছেন, তিনি কি বাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন না? তার উত্তরে ঠাকুর বলছেন, 'তাঁর ইচ্ছা। তবে প্রেমোন্মাদ না হলে তিনি সমস্ত ভার লন না।' গীতায় ভগবান বলছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (৯/২২)

—অনন্যচিত্ত হয়ে নিরন্তর চিন্তা দ্বারা আমাকে যারা উপাসনা করে, আমাতে যারা নিত্যযুক্ত সে সব ভক্তের যোগক্ষেম আমি বহন করি। যোগক্ষেম কথাটির অর্থ ব্যাখ্যাকারেরা বলেছেন, 'যোগ' মানে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি অর্থাৎ যা নেই তা তিনি দেন আর 'ক্ষেম' মানে প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ অর্থাৎ যা আছে তাও তিনি রক্ষা করেন। এভাবে ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় জয়দেবের জীবনের একটি ঘটনা সম্পর্কিত লোকশ্রুতি। সেখানে দেখা গিয়েছে যে, ভগবান শুধু দেন না, ভক্তের জিনিস মাথায় বহন করে এনে দেন। তিনি ভার নেন কিন্তু তাঁর উপর পূর্ণ নির্ভরতা না এলে এবং তীব্র বৈরাগ্য না হওয়া পর্যন্ত সংসারের কর্তব্যাদি থাকে। এই বিষয়ে মীমাংসক মতে সূক্ষ্ম বিচার আছে। ঐ মতানুসারে শাস্ত্রই মানুষকে কর্তব্যের বন্ধনে এমন ভাবে বেঁধে রেখেছে যে তার এক মুহূর্তের অবকাশ, স্বাধীনতা নেই। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তার দিনচর্চা একেবারে নিয়ম বাধা। এসব করে করে মানুষ হাঁপিয়ে ওঠে। কর্তব্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে কখন এ প্রশ্ন ওঠে। তার উত্তরে মীমাংসকেরা বলেন, বিশেষ কোন কারণে যদি কেউ কর্তব্য পালনে অসমর্থ হয় তাহলে সে মুক্ত হতে পারে। যেমন যদি অন্ধ মূক বধির হয়, পঙ্গু হয় তার জন্য এই বিধিগুলি প্রযোজ্য নয়। বিধান যখনই করা হচ্ছে তখনই তার দ্বারা অনুমান হচ্ছে যে, যে ইচ্ছা করলে

করতে পারে শাস্ত্র তাকেই বলছে তুমি কর। দায়িত্ব তাদেরই উপর বর্তায় যারা সেগুলি অনুষ্ঠান করতে পারে। একে বলে অধিকারবাদ, যে অধিকারী সেই করবে। এখন প্রশ্ন উঠবে যে অন্ধ খঞ্জ নয় এমন সমর্থ ব্যক্তিরা যখন সংসারের কর্তব্য উপেক্ষা করে সন্ন্যাসী হয় তখন তাদের কর্তব্য লঙ্ঘনের জন্য পাপ হয় কি না। মীমাংসক মতে হয়। কারণ তারা করতে পারে অথচ করছে না তাই তাদের কর্তব্যে ত্রুটি হল। সুতরাং মীমাংসক মতে সক্ষম ব্যক্তির সন্ন্যাস নেওয়া উচিত নয়।

আবার শঙ্কর প্রমুখ অদ্বৈতবাদী যাঁরা সন্ন্যাসের সমর্থক তাঁরা বলছেন, মীমাংসক মতে যে বলছে যারা করতে পারে তাদের জন্যই বিধান, আমরাও তাই বলছি। যারা এইসব বিধানকে অতিক্রম করার জন্য ব্যাকুল হয়েছে তাদের কর্ম করবার সামর্থ্য চলে গিয়েছে কাজেই তাদের আর এই কর্মবন্ধনের আওতায় আনা যায় না। দুটি উপায় বলছেন, এক হচ্ছে মন যখন ভগবানের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল তখন এই বিধিগুলি তার প্রতি প্রযুক্ত হয় না। আর যে বুঝেছে আমি কর্তা নই তার কাছে তুমি কর এই বাক্যের কোন সার্থকতা নেই। তাই শাস্ত্রকার বলছেন যে, যখন বৈরাগ্য তীব্র হবে তখন সংসারের বন্ধন আর বদ্ধ করতে পারবে না। তবে বৈরাগ্যটি আন্তরিক হওয়া চাই, মর্কট বৈরাগ্য হলে হবে না। এই মর্কট বৈরাগ্যের দৃষ্টান্তও ঠাকুর দিয়েছেন, একজন কিছু কাজকর্ম না পেয়ে বিরক্ত হয়ে সংসার ছেড়ে চলে গেল। কিছুদিন পরে কাশী থেকে চিঠি লিখছে, এখানে এসেছি তোমরা ভেব না, আমার একটি কর্ম হয়েছে। এইরকম বৈরাগ্য হলে চলবে না। অথবা যে জ্ঞানী, যে নিজেকে অকর্তা বলে মনে করছে সেক্ষেত্রে তার উপর কর্মের বন্ধন আসে না। গীতায় এই কথাই বললেন, অনন্য হয়ে যারা আমাকে চিন্তা করে অর্থাৎ ভগবান ছাড়া আর কিছু যারা ভাবতে পারে না তাদের কর্তব্য নেই। যেমন রামপ্রসাদের জীবনে আছে, মাতৃনামে

তিনি এত বিভোর যে জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী করতে এসে হিসাবের খাতায় শ্যামাসঙ্গীত লিখে রেখেছেন, 'আমায় দে মা তবিলদারী' ইত্যাদি। জমিদার তাঁকে কর্ম থেকে অবসর দিয়ে মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন। অর্থাৎ ভগবানের নামে পাগল হলে ভগবান তাঁকে কর্ম থেকে রেহাই দেন, কর্তব্যের বোঝা তার আর থাকে না। আর তা যদি না হয় তাহলে কর্তব্য না করলে ত্রুটি হয়। ঠাকুরও এখানে হাজরার কথায় বলছেন, মা খেতে পায় না, ছেলেদের অর্থাভাব, তারা বাবাকে বাড়ী যাবার জন্য মিনতি করছে অথচ হাজরা যেতে চায় না। ঠাকুর বলছেন, মনে বৈরাগ্য তেমন তীব্র নয় অথচ হাজরা সংসারের দায়িত্ব নিতে চাইছে না তাতে তার কর্তব্যের হানি হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুর স্বামীজীকে তো কখনো বলেননি যে, রোজগার করে সংসারে দে। তার কারণ স্বামীজীর মন ভগবানের জন্য এত ব্যাকুল যে কর্তব্য করবার চেষ্টা করছেন, মায়ের এবং ভাইবোনের কষ্ট দেখে তাঁর মন পীড়িত হচ্ছে কিন্তু কাজ করতে পারছেন না। তাই স্বামীজীকে ঠাকুর রেহাই দিচ্ছেন। স্বামীজীর জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন, বলেছেন, মায়ের ইচ্ছায় তোদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না। কিন্তু অপরের জন্য সেকথা বলছেন না—তার কারণ তারা নিজেরাই করে নিতে পারবে। (অনেকে বলেন, তিনিই দেখবেন। কথাটি যে কত কঠিন কথা তা সবসময় মানুষ ভেবে দেখে না। তিনি তখনই দেখবেন যখন আমি দেখব না। কিন্তু আমরা কি কর্তৃত্ববোধ থেকে মুক্ত হতে পারি? কাজেই মুখে যতই বলি যা হবার হবে, তিনি দেখবেন, মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করব। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হওয়া পর্যন্ত কর্তব্যের বোঝা বইতেই হবে, এই কথাটি বিশেষ করে মনে রাখবার।)

কর্তব্য কর্ম ও সাধনা

এই প্রসঙ্গে বাপমায়ের উপর কর্তব্যের কথাও বলছেন, 'মা কি কম জিনিস গা?' ঠাকুরের বৃন্দাবনে থাকার সব ঠিক এমন সময় মায়ের কথা মনে হল অমনি সব বদলে গেল। বৃন্দাবন ছেড়ে চলে আসতে হল। বলছেন, মায়ের এমনই মাহাত্ম্য যে শ্রীচৈতন্য সংসার ত্যাগ করবার আগে মাকে কত রকমে বোঝাচ্ছেন। বলেছিলেন, 'আমাকে যদি সংসারে রাখ আমার শরীর থাকবে না।' এইভাবে মায়ের অনুমতি নিচ্ছেন। অনুমতি না পেলে যেতে পারছেন না। কথাটি আর একদিক দিয়ে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। অবতার যে উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর দেহের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়, অন্য কোনো ভাবে দেহের ব্যবহার হয় না। হরিনাম বিতরণের যে উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রীচৈতন্যের অবতার গ্রহণ সংসারে থাকলে তা সিদ্ধ হবে না। তাই বলছেন, দেহ থাকবে না। মায়ের অনুমতি নেবার এইরকম দৃষ্টান্ত শঙ্করাচার্যের জীবনেও আছে।

এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, বাপ মা খুব পূজ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু দরকার হলে তাঁদেরও পরিহার করতে হবে। শাস্ত্রেরও এই সিদ্ধান্ত। শ্রীচৈতন্য বা শঙ্করাচার্য যদি মায়ের সেবা করবার জন্য সংসারেই থেকে যেতেন, তাহলে জগতে যে সব কাজ তাঁরা করেছেন সে কাজ কে করত? সুতরাং মহামায়া যাঁদের দ্বারা তাঁর বিশেষ কাজ সিদ্ধ কবতে চান তাঁদের তিনি অন্য দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দেন। সংসারের দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় ছেলেকে অব্যাহতি দেবেন এমন বাপ মা বিরল। শাস্ত্র বলছেন, সন্ন্যাসীর আদর্শ নিয়ে কেউ সংসার ত্যাগ করলে তার দ্বারা সংসারের কল্যাণই হয়—'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'।—তার বংশ পবিত্র হয়, যে মা এই সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন তিনি কৃতার্থ হন। এভাবে সংসার ত্যাগ না করলে কোথা থেকে আসতেন বুদ্ধদেব বা শঙ্কর,

শ্রীচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণ? কাজেই মনে রাখতে হবে সংসারের কিছুটা দায়িত্ব কর্তব্য মানুষের আছে সত্য কিন্তু যখন একটা বৃহত্তর দায়িত্বের জন্য আহ্বান আসে তখন সে আর ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তবে সেই আহ্বানটি ঠিক ঠিক অন্তরের সঙ্গে সে বোধ করছে কি না এটুকু তাকে যাচাই করে দেখে নিতে হবে। শুধু একটা ছুতা করে সংসারের হাঙ্গামা থেকে দূরে সরে থাকবার জন্য সংসার ত্যাগ করলে কর্তব্যে অবহেলা করা হয়।

এ বিষয়ে আর একটি কথা আছে। মানুষ গতানুগতিক ভাবে যে পথে চলে তার বিপরীত কিছু দেখলেই সে আর এগোতে চায় না। তাই স্বেচ্ছায় কেউ নিজের ছেলেকে ছেড়ে দিতে চায় না। কিন্তু কোন বাপমা-ই যদি সন্তানকে না ছাড়ে তাহলে এই যে দেশরক্ষার জন্য বিপুল সেনাবাহিনী দরকার তারা কোথা থেকে আসবে? এসব কথা বিচার বিশ্লেষণ করে মানুষ দেখে না। আসলে গাঁতে যাতে ঘা না লাগে সে সেইভাবে চলতে চায়। অনেক সময় মুখে সন্ন্যাস ধর্মের প্রশংসা করল, সেবার কাজ খুব ভাল কাজ, বড় আদর্শ ইত্যাদি। কিন্তু যেই বলা, আপনার ছেলেটিকে দেবেন কি? তখন ইতস্তত করে। এত খ্যাতি, এত প্রশংসা সব কোথায় উবে যায়। অবশ্য এর বিপরীত দৃষ্টান্তও দেখা যায়। কোনো কোনো বাপমা নিজেরাই সন্ন্যাসের পথে যেতে ছেলেকে উৎসাহিত করেছেন। তবে সেরকম দৃষ্টান্ত আজও বিরল।

পরিবেশ বিশুদ্ধীকরণ—নামগুণগান

এরপরে ঠাকুর বলছেন, 'আজ ঘোষপাড়া ফোষপাড়া কিসব কথা হ'ল। গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ! এখন হরিনাম একটু বল। কড়ার ডাল টড়ার ডালের পর পায়েস মুণ্ডি হয়ে যাক্।' কথা প্রসঙ্গে ঘোষপাড়া নবরসিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা উঠেছিল। তাই বলছেন,

ওসব আলোচনা করলে মন নীচে নেমে যায়, একটু ভগবানের নাম করলে মন শুদ্ধ হবে। কথা হল, তিনি যদি এসব কথা না বলতেন তাহলে আমাদের এ সম্বন্ধে চেতনা জাগত কি করে? মন্দকে একটু জানতে হয়। তবে সর্বদাই তাঁর সাবধান বাণী ওসব বড় নোংরা পথ, ওসব পথে এত ভোগের ভিতর দিয়ে ভগবানের দিকে যেতে হয় যে পদস্খলন পদে পদেই ঘটে। তাই যে পথ শুদ্ধ, যে পথ ত্যাগের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সেই পথ দিয়ে যেতেই ঠাকুর তাঁর সন্তানদের উৎসাহিত করেছেন।

এবার তিনি নেচে নেচে কীর্তন করে সেই কলুষিত হাওয়াটাকে যেন সরিয়ে দিয়ে নির্মল আনন্দের প্রবাহ বইয়ে দিলেন। এটি হল ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য। ঠাকুর কখনও কোন বিষয়ের কেবল সমালোচনা করে ক্ষান্ত হতেন না। যাদের সমালোচনা করতেন তাদের ভিতরের গুণগুলিও সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দিতেন। তাঁর ভক্তদের ভিতর কেদার নবরসিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কেদারকে ঠাকুর যথেষ্ট ভালবাসতেন তা বলে তার ঐসব দিকের আকর্ষণকে সমর্থন করেননি। ঠাকুরের এই বহুমুখী ভাবটি মনে রাখা দরকার। তিনি যোগ্যতার যেমন সমাদর করতেন তেমনি অকল্যাণকর বস্তু থেকে সাবধান করে দিতেন।

তের

২.১৮.১-৩

জপধ্যান ও কীর্তন

ঠাকুর অধরের বাড়ী গিয়েছেন। মাঝে মাঝেই যেতেন আর তিনি গেলে অন্যান্য জায়গার মতো সেখানেও আনন্দের হাট বসে যেত। অধরের বাড়ী রোজ বৈষ্ণবচরণের কীর্তন হয়। ঠাকুর অধরকে বলেছেন, তুমি একটু করে কীর্তন শুনবে। কথাটির তাৎপর্য হল, সাধারণত আমরা যেসব প্রণালী অনুসরণ করে চলি জপধ্যান, পূজাপাঠ, ভগবানের নাম কীর্তন বা শ্রবণ সবগুলিই সাধন পথে এগিয়ে যাবার পক্ষে অনুকূল। এর মধ্যে কীর্তনে মনটা সরস হয়। ভিতরে যখন তাঁর নামে আনন্দ হয়, তখন আর বাহ্য উপকরণের প্রয়োজন হয় না। তার আগে পর্যন্ত নানা উপায় অবলম্বন করতে হয়। নামে রুচি না হলে সাধন বড় নীরস হয়ে পড়ে। ঠাকুর যেমন বলতেন, বড় একঘেয়ে লাগে। সাধন করতে গেলে অনেকেরই মনে হয় জপ করে যাচ্ছি কিন্তু ভিতরে যেন রসাস্বাদন করতে পারছি না। এইরকম সাধনের অন্যান্য প্রণালীগুলিও উপায় বটে কিন্তু তার ভিতর দিয়ে মনকে একাগ্র করা সহজ নয়। কীর্তনে সহজে মানুষের মন আকৃষ্ট হয়। সুর স্বভাবতই মানুষকে মুগ্ধ করে বিশেষ করে ভক্তি-রসাত্মক সঙ্গীতে সহজেই ভগবৎ আনন্দ লাভ হয়। তাই বৈষ্ণবধর্মে কীর্তনের উপরে এত জোর দেওয়া হয়েছে। ঠাকুরও এখানে অধরকে রোজ কীর্তন শুনতে বলছেন তাতে সাধনের নীরস ভাবটি কেটে যাবে।

তবে শুধু কীর্তন নয় তার সঙ্গে সঙ্গে জপধ্যানও করতে হবে। কেবল কীর্তন করলে মনটা বহির্মুখী হয়ে যায়। মন আস্বাদন করে বটে কিন্তু গভীর স্তরে যেতে পারে না। তাই বৈষ্ণব ধর্মেও কীর্তনের সঙ্গে একাগ্রভাবে জপধ্যান করতে বলা হয়েছে।

এরপর অনেকগুলি কীর্তন গান হল। সেগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক গানের পর দুর্গার মহিমাও কীর্তিত হচ্ছে, 'তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল।' গোঁড়া বৈষ্ণবরা এসব তত্ত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু এখানে বৈষ্ণবচরণ সেই তত্ত্বই প্রকাশ করলেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তিনি কিরকম উদার-ভাবাপন্ন হয়েছেন।

এসব গানের মধ্য দিয়ে ষট্‌চক্রের কথাও বলা হয়েছে। অনুভব ছাড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা এগুলি বোঝান যায় না। এসব যোগীদের ধ্যানগম্য, সাধারণের বোধগম্য নয়। অনেকে অনেক সময় মনে করে তাদের ঐরকম বিভিন্ন অনুভূতি হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐসব অনুভূতি হওয়া সহজ নয় এবং যার হয়েছে তার জীবনের ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। তার সমস্ত মন তখন সেই এক পরমেশ্বরে কেন্দ্রিত হয়ে থাকে। তা না হলে এসব অনুভূতির কোন তাৎপর্য থাকবে না।

ভক্তের অন্ন শুদ্ধ অন্ন

এখানে কেদার প্রভৃতি ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। ঠাকুর এইসব বিশেষ ভক্তদের জন্য মায়ের কাছে ঐশী শক্তি প্রার্থনা করতেন যেন তাঁদের ভিতর দিয়ে সাধারণ ভক্তদের কাছে সেই তত্ত্ব পৌঁছায়। কেদারের সম্বন্ধে ঠাকুর উচ্চ প্রশংসা করতেন। তিনি বিনয়ী, অত্যন্ত ভগবৎপরায়ণ, ভগবৎ প্রসঙ্গে তাঁর চোখে ধারা বইত। এখানে কেদার বলছেন যে, তাঁর কাছে আগত ব্যক্তিরা অনেকে মিষ্টান্নাদি আনেন, সেসব তিনি গ্রহণ করবেন কি না। ঠাকুর বলছেন, 'ভক্ত হলে চণ্ডালের অন্ন খাওয়া যায়।' ভগবানে আন্তরিক মন থাকলে কোন দোষ হয় না। নিজের প্রসঙ্গে বলছেন যে, একসময় তিনি গণিকার হাতেও খেয়েছেন, দ্বিধা হয় নি। বলাবাহুল্য ঠাকুর সব অবস্থায় এরকম আচরণ করতে

পারতেন না। ভাবমুখে থাকলে পাত্রাপাত্র বিচার থাকত না, আবার অন্যসময় ব্রাহ্মণশরীর ছাড়া অন্য কারো প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করতে পারতেন না। ভক্তেরা অনেক সময় এসে আমাদের প্রশ্ন করেন, আমরা রান্না করে দিলে ঠাকুর খাবেন কি? তার উত্তর হল, ঠাকুর খাবেন কি খাবেন না তা তিনি জানেন। তবে মনে রাখতে হবে যে, তাঁর ভক্তেরা তাঁর সন্তান। সন্তানের হাতে বাপ-মা খাবেন কি না এই প্রশ্ন যদি না ওঠে তাহলে ঠাকুর খাবেন কি না এ প্রশ্নও ওঠে না। যে কেউ তাঁকে আপনজন মনে করে, শ্রদ্ধা সহকারে দিলে নিশ্চয় তিনি গ্রহণ করবেন। সাধারণত ঠাকুর বংশানুক্রমিক প্রথা অনুসারে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অন্ন খেতেন না আবার ধনী কামারনীকে তিনি তাঁর ভিক্ষা মা করেছিলেন এবং তাঁর হাতে খেয়েছেনও। এটা তাঁর অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভর করত। এ ব্যাপারে কোন সাধারণ নজির টানা যায় না।

বেলুড় মঠে একজন অভিনেত্রী আসতেন ঠাকুরের জন্য প্রচুর ফল, মিষ্টি নিয়ে। তখন কার দিনে যেসব মেয়েরা অভিনয় করতেন তাঁদের অনেকেরই চরিত্র ভাল থাকত না। আমাদের মনে সংশয় হল তাঁর আনা ফলমূল ঠাকুরকে নিবেদন করা যাবে কি না। স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, দেখ বাপু, ভক্ত এনেছেন। ঠাকুর খাবেন কিনা তিনি নিজে বুঝবেন। তোমাদের কাজ হচ্ছে ভক্তেরা যা আনেন, তা তাঁর সামনে ধরে দেওয়া। কাজেই পৃথক পাত্রে তোমরা ঠাকুরের সামনে রাখবে। আর সাধুদের বললেন, তোমাদের ইচ্ছা হলে প্রসাদ হিসাবে নিতে পার, ইচ্ছা না হলে নিও না। এর কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম করে দিতে চাই না। যদি কারো বিশ্বাস থাকে ভগবানকে নিবেদিত বস্তু অপবিত্র হতে পারে না, তার পক্ষে গ্রহণ করায় বাধা নেই, কিন্তু যদি কারো মনে হয় অপবিত্র হাতে অর্পিত বস্তু ঠাকুর গ্রহণ করতে পারবেন না, তাহলে প্রসাদ গ্রহণ কোরো না। কোনটি তিনি গ্রহণ

করবেন আর কোনটি করবেন না সে তিনিই জানেন। আমাদের মনে যদি প্রশ্ন ওঠে আমরা ঠাকুরকে নিবেদন করব কি না, তার উত্তর, তাঁকে আপনার বলে মনে করলে নিবেদন করতে কোনো বাধা নেই। তবে মনে দ্বিধা থাকলে মন যেমন বলছে তেমনি কর। আজ তিনি স্থূল শরীরে সীমিত নন, সকলের অন্তরে থেকে সকলের পূজাই গ্রহণ করছেন। তাঁকে আপনার বলে যে মনে করে তার নিশ্চয় সেবা করবার পূর্ণ অধিকার আছে।

কেদার ঠাকুরের কাছে শক্তি প্রার্থনা করছেন। অনেক ভক্ত তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য আসেন। তিনি যাতে তাদের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারেন তাই প্রার্থনা জানাচ্ছেন। ঠাকুর আশ্বাস দিচ্ছেন, 'হয়ে যাবে গো! আন্তরিক ঈশ্বরে মতি থাকলে হ'য়ে যায়।' এখানে দেখবার জিনিস কেদার শুধু নিজের ভক্তির কথা বলছেন না, নিজেকে ঠাকুরের হাতের যন্ত্ররূপে তৈরী করতে চাইছেন যাতে তাঁর ভিতর দিয়ে অপরের কল্যাণ হয়।

ভগবানের স্বরূপের বৈচিত্র্য

সাকার নিরাকার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'তিনি সাকার, নিরাকার আবার কত কি',—ঠাকুরের কথা ভগবানের কখনো ইতি করতে নেই। আমরা বলি, আমি যেরকম ভাবে ভাবছি তিনি সেরকম ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেন না। যেমন বেদান্তী বলছেন, তিনি নিরাকার ছাড়া কিছু হতে পারেন না। সাকারবাদী বলেন, নিরাকার একটা তত্ত্বই হল না। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে, সূর্যলোকের যারা অধিবাসী তাদের বিচিত্র রূপ, বিচিত্র বর্ণ ও প্রকার। যারা দূর থেকে সূর্যকে দেখে তারা দেখে মাত্র একটা অগ্নিপিণ্ড জ্বলছে, বৈচিত্র্য কিছু দেখতে পায় না। সেইরকম জ্ঞানীরা জ্ঞানদৃষ্টি দিয়ে ভগবানের

ভিতর কোন বৈচিত্র্য দেখতে পায় না, ভগবানের উজ্জ্বল রূপে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তারা বলেন, ভক্ত যে ভগবানের ভিতরে নানা বৈচিত্র্য দেখেন ওগুলি মায়ার সৃষ্টি। বৈচিত্র্য তাঁর নয়। কারণ বিচিত্র হলেই তিনি পরিবর্তনশীল পরিণামী হবেন অতএব অনিত্য, নশ্বর হবেন। কিন্তু তাঁকে তা বলা যায় না। সুতরাং ভগবানের বৈচিত্র্য কল্পনা। মিথ্যা কল্পনা, পক্ষান্তরে ভক্তেরা বলছেন, তোমরা দূর থেকে দেখে মনে করছ ভগবানেব বৈচিত্র্য নেই, তোমরা তাঁর স্বরূপ জান না। এমনি চলে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ। আসল কথা আমরা আমাদের যে বুদ্ধি দিয়ে ভগবানকে বুঝতে চেষ্টা করি সেই বুদ্ধিই সীমিত। এ সম্পর্কে ঠাকুরের যথোপযুক্ত দৃষ্টান্ত অন্ধদের হাতী দেখার। কেউ পা, কেউ লেজ, কেউ পেট ছুঁয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হাতীর বর্ণনা দিচ্ছে। ঠাকুর কারোরটাই ভুল বলছেন না, বলছেন, তাদের অনুভবগুলি সীমিত। ভগবানের স্বরূপ বহু বিচিত্র, যার যেমন অনুভব হয়েছে সে তেমন বলে, তাতে দোষ নেই। তবে এমন সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, আমরা যতটুকু জানি তিনি ততটুকুই।

চৌদ্দ

২.১৯.১৭

সাধনপথে বিঘ্ন—শঠতা

শ্রীরামকৃষ্ণ কথার ছলে নানা উপদেশ দিতেন। এখানে সংসারী-লোকের কিরকমভাব তা বোঝাতে যদু মল্লিকের কথা বলছেন। সে গাড়ীভাড়া তিনটাকা দুআনা শুনে কতজনকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিচ্ছে। তারপর তিনটাকা দিল, দুআনা আর দিল না। দালাল এসেছে কোথায় বাড়ী জমি বিক্রী আছে তার খবর নিয়ে। যদু মল্লিক কিনবে না তবু বলে, কত দাম? কিছু কমায় না? ঠাকুর বললেন, 'তুমি নেবে না শুধু শুধু দর করছ'? তখন হাসে। সত্যিই নেবে না। তবু চায় পাঁচটা লোক যাওয়া আসা করুক। যদু মল্লিকের বাড়ীতে আগত জনৈক ব্যক্তিকে দেখে ঠাকুর বুঝেছিলেন সে খুব চতুর আর শঠ প্রকৃতির। তাকে বলেছিলেন, 'চতুর হওয়া ভাল নয়, কাক বড় সেয়ানা, চতুর, কিন্তু পরের গু খেয়ে মরে!' ঠাকুরের মুখে কিছু আটকাত না, স্পষ্ট কথা সামনেই বলে দিতেন। তবে সকলে জানত ঠাকুরের ভিতর কোনো দ্বেষভাব নেই। তাই এরকম সোজাসুজি কথায় কারো মনে একটু লাগলেও পরক্ষণে ভুলে যেত। কারণ তিনি যে সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, স্নেহ-সম্পন্ন, করুণাময় এটা সকলেই অনুভব করত।

নারায়ণের মুখে, হরি—পরিবারকে মা বলেছে শুনে ঠাকুর বললেন, 'সে কি! আমিই বলতে পারি না, আর সে মা বলেছে! কি জান, ছেলেটি বেশ শান্ত, ঈশ্বরের দিকে মন আছে'। সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশে মুখে অনেক কিছু বলা যায় কিন্তু সেই ভাবটিতে দৃঢ় হয়ে থাকা বড় কঠিন। এরপর বললেন, 'হেম কি বলেছিল জান? বাবুরামকে বললে, ঈশ্বরই এক সত্য আর সব মিথ্যা।' আমরা অনেকেই কথায় কথায়

এরকম বলে থাকি, কিন্তু সেটি ধারণা করা খুব কঠিন। এক্ষেত্রে বলছেন, হেম আন্তরিকই বলেছে। তবে সব কথাই যে আন্তরিকভাবে বলে তা নয়, কারণ সে ঠাকুরকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কীর্তন শোনাবে বলেছিল কিন্তু নিয়ে যায়নি। হয়তো সেটা আন্তরিক ভাবে বলেনি। পরে বলেছিল, লোকলজ্জায় সে এটা করেনি।

সাধনপথে সাবধানতা

পরের কথাগুলি মেয়েদের কাছ থেকে পুরুষদের দূরে থাকবার জন্য সাবধান বাণী। এখানে সমবেত শ্রোতারা সবাই পুরুষ, সুতরাং কারো প্রসঙ্গে রেখে ঢেকে কথা বলার প্রয়োজন ছিল না। যখন মেয়েদের কাছে বলতেন এমনি কঠোরভাবেই পুরুষদের সম্বন্ধে সাবধান করে দিতেন। আধ্যাত্মিক পথে চলা বড় সহজ নয়, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে চলতে হয়। পদস্খলনের ভয় প্রতি পদে। তাই ঠাকুর উভয়কেই এত সাবধান করে দিচ্ছেন। এমন কি আপাতদৃষ্টিতে যেখানে খুব ভক্তিভাব শুদ্ধ সম্বন্ধ বলে মনে হয় সেই সম্বন্ধের ভিতরেও অশুদ্ধির স্পর্শ লাগতে বেশী সময় লাগে না। তাছাড়া উচ্চভাব থেকে নীচে পড়ে যেতে বেশী সময় লাগে না। উপরে ওঠা কঠিন, নামা যায় অনায়াসে। ঠাকুর বলতেন, নীচে নামার রাস্তা যেন কলম-বাড়া রাস্তা, ঢালু রাস্তা। দৃষ্টান্ত দিতেন, কেল্লায় যাবার সময় বুঝতে পারিনি কখন নেমে যাচ্ছি, পৌঁছলে দেখলাম কত নীচে নেমে গিয়েছি। সাধারণ মনের এই অবস্থা। এইজন্য সর্বদা সতর্কতার প্রয়োজন। এমন কি শুদ্ধা ভক্তির ভিতরেও হয়তো কামনার বীজ লুকিয়ে থাকে তাই সাবধানে চলতে হয়। (ব্যবহারিক শুদ্ধিও প্রয়োজন, কেবল মন শুদ্ধ থাকলেই হয় না। মনকে অনুরূপ পরিবেশের ভিতর রাখতে হয়। পরিবেশ সম্বন্ধে সাবধান না হলে শুদ্ধমনের ভিতরও অশুদ্ধি প্রবেশ করতে সময় লাগে না।)

শ্রীশ্রীমা যখন যেখানে থাকতেন, আত্মীয় স্বজন ছাড়া ভক্ত মেয়েরাও তাঁর কাছে কাছে থাকতেন। প্রয়োজনেও সেখানে সাধুদের বার বার আসা মা পছন্দ করতেন না। তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত, কত বড় একটা আধ্যাত্মিক বিভূতি পরিবেশকে উচ্চ সুরে বেঁধে রেখেছে তবু মা বারণ করছেন, বাবা, তোমরা এস না। মা তাঁর সন্তানদের পর্যন্ত বলতেন, এটা স্ত্রী-শরীর কিনা তাই একটু পার্থক্য রাখতেই হয়।

শ্রীচৈতন্যের ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ করবার কারণ তিনি বিধবা স্ত্রীলোকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজীও তাঁর সন্তান শুদ্ধানন্দ স্বামীকে মেয়েদের আশ্রমে যেতে পর্যন্ত নিষেধ করেছেন। যাঁকে বারণ করেছিলেন তিনি অতি শুদ্ধস্বভাব নামই শুদ্ধানন্দ, স্বামীজীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। এত সাবধানতা কেন? না, একটি সমুচ্চ আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। যেখানে আদর্শ যত বড় সেখানে এই সাবধান বাণী, তত আপোসহীন। আদর্শ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হলে তার উপর মানুষের শ্রদ্ধা কমে যায়। ঠাকুর তাঁর সন্তানদের নিষ্কলঙ্ক রাখবার জন্য সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। একজন ঠাকুরের সন্তানদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে খাবে, তাকে বললেন, হবে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ঠাকুরের মতো উদার ব্যক্তি এমন রূঢ় ব্যবহার করলেন! কিন্তু এখানে ঠাকুরের কঠোর হওয়া প্রয়োজন ছিল। ভাগবতে আছে—'পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্নস্পৃশেৎ দারবিমপি'

—কাঠের পুতুল যদি মেয়ে হয়, যে সন্ন্যাসী সে তাকে পা দিয়েও স্পর্শ করবে না। পদে পদে ভয় এইজন্য এসব সতর্কবাণী। তবে ভয় আছে বলে কি লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে থাকবে? তা নয়, সেটা সম্ভবও নয়। তাহলে কি করতে হবে? (ঠাকুরের কথা, পুরুষেরা মেয়েদের মাতৃভাবে আর মেয়েরা পুরুষদের সন্তানভাবে দেখবে। এই আদর্শকে ধরে থাকতে হবে এবং ব্যবহারও যতটা সম্ভব তদনুযায়ী করবে)

যিনি বলছেন তিনি লোকোত্তর পুরুষ। তিনি মথুরবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একখাটে শুয়েছেন, তাঁর পত্নীকে কতদিন তার সঙ্গে এক শয্যায় স্থান দিয়েছেন। যখন ঐভাবে ছিলেন তখন একভাব, আবার যখন উপদেষ্টারূপে এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁর অন্যভাব, ব্যবহারও অন্যরকম। ঠাকুরের জীবনে নানাভাবের প্রকাশ হয়েছে তাই তাঁর আচরণও নানা প্রকারের। সবসময় তাঁর আচরণকে অনুকরণ করা আমাদের সাধ্যের অতীত, করা উচিতও নয়। ভাগবতে আছে,

ঈশ্বরাণাং বচঃ কার্যং তেষামচরণং ক্বচিৎ'

—লোকোত্তর পুরুষদের উপদেশ অনুসরণ করতে হয়, আচরণের অনুকরণ কোথাও কোথাও করতে হয়। সবজায়গায় তাঁদের আচরণ অনুকরণ করতে গেলে আমাদের পক্ষে তা কল্যাণকর হবে না, কারণ তা আমাদের শক্তির বাইরে। তবে তাঁদের উপদেশ, তাঁদের বাণী চিরকাল আমাদের অনুসরণীয় এটি মনে রাখতে হবে। ঠাকুর অনেক সময় হয়তো উলঙ্গ হয়ে একটি শিশুর মতো গোপালের মার কোলে গিয়ে বসতেন, সাধারণের পক্ষে তা কি সম্ভব।

শুকদেবের কাহিনীতে আছে—শুকদেব যাচ্ছেন নগ্নমূর্তি, বয়সে যুবক। অপ্সরারা সরোবরে স্নান করছিলেন শুকদেব তাঁদের সামনে দিয়ে চলে গেলেন তাঁরা ভ্রূক্ষেপ করলেন না, সংকুচিতও হলেন না। পশ্চাতে আসছিলেন পিতা ব্যাসদেব। তাঁকে দেখে অপ্সরারা লজ্জিত ত্রস্ত, তাড়াতাড়ি নিজেদের বস্ত্রাবৃত করলেন। ব্যাসদেব বিস্মিত, তিনি বৃদ্ধ তাঁকে দেখে অপ্সরাদের এত লজ্জা আর তরুণ শুকদেবকে দেখে লজ্জা হল না! অপ্সরাবৃন্দ বললেন, ঠাকুর, আপনি বৃদ্ধ হলেও বাসনা-রহিত নন কিন্তু শুকদেব নির্বাসনা দেহজ্ঞানরহিত, তাঁর নারী-পুরুষ জ্ঞান লোপ পেয়েছে তাঁকে দেখলে তিনি যুবক কি বৃদ্ধ, স্ত্রী কি পুরুষ এ ভাব মনে ওঠে না।

ঠাকুরের স্ত্রীভক্তেরা বলতেন, ঠাকুর যখন তাঁদের সঙ্গে মিশতেন তাঁরা তাঁকে কখনও পুরুষ বলে ভাবতেন না, অসংকোচে তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতেন। আবার পুরুষদের কাছে এই ঠাকুরই পুরুষসিংহ। এসব আচরণ লোকোত্তর পুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। তাই সাধারণের জন্য ঠাকুরের এত সাবধান বাণী উচ্চারণ। বারবার বলেছেন, জগতের যত অকল্যাণ তার মূলে আছে কামিনী আর কাঞ্চন—অর্থাৎ নারী অথবা অর্থের প্রতি আকর্ষণ, দুটিই মূলতঃ মনের ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত। মানুষের জীবনের এই দুটি মৌলিক আকর্ষণ থেকে ঠাকুর কেবলই সকলকে সাবধান করে দিয়েছেন। শালীনতার মুখ রক্ষা করে কোন আবরণ দিয়ে বলেননি, সুস্পষ্ট অনাবৃত ভাষায় বলেছেন, যা অনেক সময় সভ্য সমাজে অচল। ঠাকুরের বলবার এই ভঙ্গিটি লক্ষ্য করবার। তবে এখানে এটা যেন মনে না করি যে, ঠাকুর স্ত্রীবিদ্বেষী। আদৌ তা নন। 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'—যিনি সর্বভূতে মাতৃরূপে রয়েছেন প্রত্যেক নারীতে তিনি সেই মাতৃরূপ দেখতেন, ব্যবহারও সেভাবে করতেন।

ঠাকুর বলছেন, প্রথম অবস্থায় এই সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন, সিদ্ধ হলে ভয় নেই। তবে যদি তিনি আচার্য হন তাহলে সিদ্ধ হলেও তাঁকে অন্তরে-বাইরে ত্যাগ করতে হয়। তাঁর নিজের পড়বার ভয় না থাকলেও আদর্শকে অম্লান রাখতে তাঁকেও ব্যবহারে সতর্ক হতে হয়। দেহবুদ্ধি থাকলেই ভয়, দেহবুদ্ধি চলে গেলে ভয় নেই কিন্তু দেহবুদ্ধি আর যায় কজনের? গীতায় বলছেন—

'শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥' (৫/২৩)

—শরীর ত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত সংসারে থেকেই যিনি কাম ক্রোধাদির বেগ ধারণ করতে পারেন তিনিই যথার্থ যোগী এবং তিনিই সুখী। অর্থাৎ

যতদিন দেহ আছে ততদিন এসব উপদ্রব থেকে মানুষের রক্ষা নেই কাজেই সাবধান থাকতে হয়। ঠাকুর বলছেন, 'ছাদে উঠ্বার সময় হেল্তে দুল্তে নাই, হেল্লে দুল্লে পড়বার খুব সম্ভাবনা। যারা দুর্বল, তাদের ধ'রে ধ'রে উঠতে হয়)। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। ভগবানকে দর্শনের পর বেশী ভয় নাই; অনেকটা নির্ভয়। ছাদে একবার উঠ্তে পারলে হয়। উঠবার পর ছাদে নাচাও যায়।' যখন মনের উত্থান পতনের অবস্থাব অবসান হয়েছে, মন স্থায়ীভাবে পরমতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন আর ভয় নেই। এই দৃষ্টিতে উপনিষৎ এক জায়গায় বলেছেন, ব্রহ্মজ্ঞের ব্যবহার কিরকম? না, ব্যবহার যেমনই হোক তিনি ব্রহ্মজ্ঞ অর্থাৎ তখন তাঁর আচরণের দ্বারা তিনি ব্রহ্মজ্ঞ কি না বিচার করতে হবে না। যিনি সত্যকে জেনেছেন, যার দৃষ্টি চিরতরে নিমোহ তাঁর আর পতনের ভয় নেই। তা নাহলে জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে কিছু থাকত না। সাধনের সাহায্যে সিদ্ধিলাভের পরে যখন দেহ-বুদ্ধির, অহংকারের নাশ হবে তখন নিশ্চিন্ত। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় একটা দড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে তখন যদিও সেটা দড়ির মতোই দেখায় কিন্তু সেই দড়ি দিয়ে বাঁধার কাজ চলে না। ঠিক সেইরকম দেহ-বুদ্ধি পুড়ে ছাই হয়ে গেলে ব্যবহারে দেহবুদ্ধি আছে বলে মনে হবে কিন্তু সেই দেহবুদ্ধি আর তার বন্ধনের কারণ হবে না। তখন মায়ার উৎপত্তি আর হবে না। তত্ত্বকে জানলে সমস্ত অবিদ্যা এবং অবিদ্যার ফলরূপ বন্ধন, অজ্ঞান, মোহ সব চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হয়ে যায়। কিন্তু (সাধন পথে চলবার সময় যতই উঁচুতে সে উঠুক, তাকে অসাবধান হলে চলবে না, বরং আরও বেশী করে সতর্ক থাকতে হয় কারণ মন যখন সূক্ষ্ম-রাজ্যে বিচরণ করে তখন সেখানে সংগ্রাম সূক্ষ্ম এবং আরও কঠোর। তখনকার শুদ্ধ মনে এতটুকু অশুদ্ধির আঁচ লাগলে অসহ্য বেদনা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের লেখক দেখিয়েছেন যে, সাধকেরা যখন উচ্চস্তরে ওঠেন তখন মনে হয় তাঁদের বুঝি আর সংগ্রামের দরকার নেই। আসলে

তা নয়। সাধন কালে যত এগোতে থাকে সংগ্রাম তত কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে। প্রথমে সংগ্রাম স্থূল বস্তুর সঙ্গে, পরে সূক্ষ্ম বিষয়ে সংগ্রাম শুরু হয়। ভোগবাসনার সঙ্গে এই যে সংগ্রাম সেই সংগ্রাম মনকে চঞ্চল করতে পারে। যেমন বুদ্ধদেবের জীবনে বোধিলাভের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মারের আক্রমণের কথা আছে। 'মার' মানে এই বাসনা। অর্থাৎ অন্যান্য জড়বস্তুর সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে তখনও মারের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছে। এর মতো ভয়ঙ্কর অবস্থা আর নেই। যখন সে যুদ্ধতেও জয় হল তখনই তিনি হলেন মুক্তপুরুষ, বাসনার আর কোন প্রভাব তাঁর উপর থাকে না। বাইরের ব্যবহার দিয়ে এই মুক্ত পুরুষদের বিচার করা চলে না। তবে আচার্যদের ব্যবহারেও খুব সাবধান থাকতে হয় নাহলে লোকের মনে অযথা নানারূপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

সাধনার ধাপ

এরপর যে বাহ্যলক্ষণগুলি দেখে ধ্যানের গভীরতার অনুমান করা যায় সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ঠাকুর বিভিন্ন কোষের কথা বলেছেন। শঙ্কর এই কোষের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ যেন তলোয়ারের খাপ। খাপ যেমন তলোয়ারকে ঢেকে রাখে এই কোষগুলি তেমনি আত্মাকে ঢেকে রাখে। কোষগুলিকে লোকে দেখতে পায় আত্মাকে দেখতে পায় না। স্থূল শরীরটা হল অন্নময়, তারপর প্রাণময়, মনোময় তারপর বিজ্ঞানময় কোষ, তারও পরে আনন্দময় কোষ। এই আনন্দময় কোষ সম্বন্ধে দুটি মত আছে, দুটিই আচার্য শঙ্কর-কর্তৃক স্বীকৃত। একটি মতে বলছেন, আনন্দময় কোষটি কোষ নয়, কারণ আত্মা তার দ্বারা ঢাকা পড়ে না। আবার যে মতে একে কোষ বলা হয় সেখানে বলা হয়েছে বিভিন্ন কোষের পরে এই আনন্দময় কোষটি। তারও পরে আছে যা আনন্দের পারে। ঠাকুর যেমন বলেছেন সুখদুঃখের পারেও আছে। তবে সেই

আনন্দটি যে সাধারণ আনন্দ নয় তা বেশ বোঝা যায়। সাধারণ আনন্দের অবলম্বন কোনো বিষয় কিন্তু আনন্দময় কোষের আনন্দ নির্বিষয়। তার আর কোন হেতু নেই। আনন্দ সেখানে আত্মার স্বরূপ হিসাবে অভিব্যক্ত হয়। একে কোষ বলে বলা হচ্ছে না। আপাতদৃষ্টিতে দুটি ব্যাখ্যায় অসংগতি রয়েছে বলে মনে হলেও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দু-এর মধ্যে সমতা দেখা যায়।

তারপর বলছেন, 'মনের নাশ হলে আর খবর নাই। এইটি চৈতন্যদেবের অর্ধবাহ্যদশা।' বাহ্য, অর্ধবাহ্য আর অন্তর্দশা বলে তিনটি অবস্থার কথা বলা হয়। যেখানে মনের নাশ হয়, অর্থাৎ মহাকারণে মন বিলীন হয়ে যায়, সেখানে অন্তর্দশা।

সুষুপ্তি ও সমাধি

সমাধিতে গিয়েই মনের এইভাবে নাশ হয়, আর হয় সুষুপ্তি কালে। সেটি হচ্ছে মন যেখানে ঘুমিয়ে থাকে। ঘুমিয়ে থাকা আর নাশ হওয়া দুটি ভিন্ন বস্তু। ঘুম ভাঙলে আবার সে সক্রিয় হয়, কিন্তু একবার মনের নাশ হলে সেই মনের আর পুনরায় ক্রিয়া হয় না। মন তারপরেও ক্রিয়া করে বলে দেখা গেলেও সেটিকে শাস্ত্র বলেছেন, এ ক্রিয়া বাহ্যদৃষ্টিতে, অন্তর্দৃষ্টিতে তার ক্রিয়া নেই। পূর্বকথিত পোড়া দড়ির মতো দড়ির আকার বলে থাকে দড়ি বলা হচ্ছে তা দিয়ে কিন্তু আর বন্ধন কার্য হয় না। সেইরকম দেখে মনে হয় যেন মনের ক্রিয়া হচ্ছে, প্রকৃতই তার কোনো ক্রিয়া হচ্ছে না। 'করোতি ইব'—যেন সে করছে কিন্তু কিছুই করে না, সে সেই নিষ্ক্রিয় স্বস্বরূপে অবস্থিত থাকে। গীতার ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য ভগবানের কথা যেমন বলেছেন, 'জাত ইব দেহবান্ ইব লোকানুগ্রহংকুর্বন্'—লোকানুগ্রহংকুর্বন্ ইব আর বলা হয়নি। লোকের প্রতি তাঁর কৃপা স্বরূপে অবস্থান থেকেই হয়।

'অন্তর্মুখ অবস্থা কিরকম জান? দয়ানন্দ বলেছিল, অন্তরে এসো, কপাট বন্ধ ক'রে'। অর্থাৎ জাগ্রতে বাহ্য যে আকারাদি আমরা দেখছি স্বপ্নে তারই সূক্ষ্ম অনুবৃত্তি, আর সুষুপ্তি অবস্থায় আর স্বপ্ন থাকে না, কোনো অনুবৃত্তিপূর্বক স্মৃতিও তার থাকে না। সে অবস্থাটির সঙ্গে অন্তর্দশার তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সুষুপ্তিতে মনের একেবারে নাশ হয় না, মন সেখানে সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়েছে। মন যখন তুরীয়তে পৌছয় তখন জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিনেরই অতীত সত্তায় অবস্থান করে। এই তিনটিই তার কাছে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যায়। মিথ্যা হয়ে যায় বলছি এইজন্য যে আপাতদৃষ্টিতে তার দ্বারা ব্যবহার হলেও প্রকৃত পক্ষে সেই ব্যবহারগুলি তার নয়।

জীবন্মুক্তির স্বরূপটি বর্ণনা করতে গিয়ে শাস্ত্রকারেরাও বিব্রত হয়েছেন। কারণ তাঁরা দেখছেন জ্ঞানী পুরুষও সাধারণের মতো ব্যবহার করেন, তখন তাঁর ব্যবহার হয় না এ কথা কি করে বলা যায়? আর যদি ব্যবহারই হয় তাহলে তাঁর সঙ্গে সাধারণ লোকের পার্থক্য কোথায় রইল? তাহলে সমাধির যে জ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান তাও অনিত্য হয়ে গেল, নিষ্ফল হয়ে গেল। জীবন্মুক্তি আছে বললে এই দোষ হচ্ছে।

জীবন্মুক্তি শাস্ত্রে নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। যেমন ছিন্নমূল লতার সঙ্গে উপমিত হয়েছে। লতার মূলটা কেটে দেওয়া হয়েছে, ভিতরে আর রসের সঞ্চার হবে না, বলতে গেলে লতাটার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ তার ভিতরে পূর্বসঞ্চিত রস থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে একটি জীবন্ত লতার মতো দেখা যাবে। এই অবশিষ্ট রসের মতো অবিদ্যার একটুখানি লেশ বা আঁশ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ব্যবহার তার দ্বারা হবে। প্রারব্ধের জন্য যে সংস্কার সেটি ঐ লেশ-অবিদ্যা রূপে থাকে, জ্ঞানের দ্বারা তা নষ্ট হল না, ভোগের দ্বারা আপনিই নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে, **logic** অনুসারে কোন জিনিস নিজে

নিজেই নষ্ট হতে পারে না। ন্যায়শাস্ত্র মতে নাশ্য ও নাশক দুটি বস্তু। নিজেই নিজের নাশ্য বা নাশক হতে পারে না। সুতরাং অন্য কোনো কারণ থাকা চাই যে কারণে তার নাশ হবে। কাজেই জ্ঞানের পরেও যার নাশ হল না তার আর কোন কারণে নাশ হবে? সুতরাং তার আর নাশ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ব্যাখ্যাকারেরা বলেছেন, ভোগের ফলে ছিন্নমূল লতার মতো অবশিষ্ট রসটুকু শুকিয়ে গেলে আপনি নাশ হয়ে যাবে। কোথাও দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে নির্মলীফলের—ফটকিরির মতো। ফটকিরি জলে দিলে তা গলে গিয়ে ময়লাটাকে নিয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। ফটকিরিটা থাকে না, তার নাশ হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, নাশ হবে কেন? সে তো জলের সঙ্গে মিশে রয়েছে। তবে তার আকার আমরা দেখতে পাই না বটে। যেমন ফটকিরিটার আকার থাকে না সেইরকম অবিদ্যার আর কোন কার্য থাকে না। কথাগুলির কোনোটাই মনকে খুব স্পর্শ করে এরকম নয়। এইসব ব্যাখ্যা খুব সুষ্ঠুভাবে হয় না বলেই শঙ্কর 'জীবন্মুক্তি অসিদ্ধ', প্রতিপক্ষের এই মতবাদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে সমস্ত যুক্তি শেষ করে বলছেন, 'দৃষ্টে ন অনুপন্নং নাম'—যা দেখা যাচ্ছে তাকে অযৌক্তিক বলার অর্থই হয় না। কারণ যুক্তি অনুভবকে অনুসরণ করে, অনুভব যুক্তিকে অনুসরণ করে না। সুতরাং জীবন্মুক্ত অবস্থাকে যখন অনুভব করা যায় তখন অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি? তবে একমাত্র যিনি জীবন্মুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত তিনিই কেবল তা বলতে পারেন। অপরের কাছে এটি অনুমানমাত্র। অনুমান এক একজন এক একরকম করবে কিন্তু যিনি অনুভবের দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত তিনি বলেন, দেখছি জগৎটা লয় হয়ে গিয়েছে, আবার তা কোথা থেকে আসে? এইভাবে শঙ্কর অনুভবের উপরে জোর দিয়েছেন, যুক্তির উপরে নয়। অনুভবের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন, জীবন্মুক্তি অনুভব সিদ্ধ।

তারপর ঠাকুর বিভিন্ন অবস্থার কথা বলছেন, 'আমি দীপশিখাকে নিয়ে আরোপ করতুম। লাল্‌চে রংটাকে বলতুম স্থূল, তার ভিতরের সাদা সাদা ভাগটাকে বলতুম সূক্ষ্ম, সব ভিতরে কাল খড়কের মত ভাগটাকে বলতুম কারণশরীর।' যাঁরা দীপশিখাকে লক্ষ্য করেছেন তাঁরা এ কথাটি বুঝতে পারবেন। অর্থাৎ এইভাবে তিনটি বলেছেন, বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্যদশা, অন্তর্দশা। অথবা উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন প্রথমে থাকে স্থূল শরীর, তারপর সূক্ষ্ম শরীর তারপরে কারণ শরীর।

ধ্যান সম্পর্কে নির্দেশ

এরপর প্রসঙ্গক্রমে বললেন, 'ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে, তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ—মাথায় পাখী বসবে জড় মনে করে।' ভাব হচ্ছে এই যে, ধ্যানরত ব্যক্তির দেহবুদ্ধি এমন রহিত হবে যে তাকে একটি জড়বস্তু বলে মনে হবে। দেহবুদ্ধি থাকলে সাবধান হলেও একটু আধটু চঞ্চলতা থাকবেই। এই চঞ্চলতার অবস্থাটি সূক্ষ্মশরীরের দৃষ্টান্ত। তারপরে যখন সম্পূর্ণ দেহবুদ্ধি তিরোহিত হয়ে যায় তখন সেটি কারণ শরীর। কারণ শরীর বলার তাৎপর্য এই যে, কারণ শরীর থেকে আবার কার্যের উৎপত্তি হয়। তার ভিতরে অভিব্যক্তির বীজ লুকানো রয়েছে, নিঃশেষে নাশ হয়ে যায়নি। যখন নিঃশেষে নাশ হয়ে যাবে তখন তাকে বলা হয় তুরীয় অবস্থা। সুষুপ্তির ভিতরে জাগ্রৎ স্বপ্নে ফিরে আসার বীজ রয়েছে, নির্বীজ অবস্থা যখন হবে সেটি হল সুষুপ্তির পারে—তুরীয়।

তারপরে কেশব সেনের ধ্যানতন্ময়তার উল্লেখ করে বললেন, 'যে ভক্ত ঐরকম ধ্যানতন্ময় তার কোন বাসনা অপূর্ণ থাকে না। এই ধ্যানটুকু ছিল বলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যেগুলো মনে করেছিল (মানটান গুলো) হয়ে গেল।' তারপরে বলছেন, 'চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়।' এটি ভাববার জিনিস। আমরা সাধারণত চোখ বন্ধ করে ধ্যান করি।

তাতে বাইরের যে সব দৃশ্য মনকে আকর্ষণ করে সেগুলো আর থাকে না। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় মনকে আকর্ষণ করছে। মনকে সরিয়ে নিলে বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের যোগ থাকলেও অনুভব হবে না। ঠাকুর যেমন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, একজন মাছ ধরছে। পাশ দিয়ে বর যাচ্ছে বাজনা বাজিয়ে, তার হুঁশই নেই। তার কান ছিল, চোখ ছিল, সে দেখেছে, শুনেছে কিন্তু মনের উপরে রেখাপাত হয়নি কারণ মন সেখানে ছিল না। মন সংযুক্ত না হলে ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়কে প্রকাশ করতে পারে না। এখানে মনের যোগ ছিল না বলে অনুভব হল না।

দৃষ্টান্ত আছে, 'অন্যত্রমনা অভূবম্ ন শ্রুতং অন্যত্রমনা অভূবম্ ন দৃষ্টং' —আমার মন অন্যদিকে ছিল তাই আমি দেখিনি, তাই শুনিনি। শাস্ত্র মনকে বলেছেন অনু, সূক্ষ্ম বস্তু। সে এককালে বহু বিষয়কে গ্রহণ করতে পারে না কিন্তু মনে হয় যেন একসঙ্গে গ্রহণ করে। আমরা চোখে দেখছি, কানে শুনছি, এগুলি সমকালীন ঘটনা ঘটে যায়। শাস্ত্র বলেন যে এগুলি খুব দ্রুত ঘটছে এইজন্য সমকালীন বলে মনে হয়, সিনেমাতে ছবি দেখার মতো। সিনেমার প্রত্যেকটা ছবি কাটা হলেও চোখের সামনে দ্রুত পরিবর্তিত হওয়ার ফলে একটা নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপার বলে মনে হয়। মনের ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরকম ঘটে। দেখা শোনা প্রভৃতি কাজগুলি মনে হয় এককালে ঘটছে। যাই হোক চোখ চেয়ে ধ্যান তখনই হয় যখন মনকে বিষয় থেকে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। তাহলে কোনো বিষয়ই মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সাধারণ ক্ষেত্রে কিন্তু উপদেশ হচ্ছে চোখ বুঁজে ধ্যান করা, কেন না সাধারণ মানুষের মনকে তত নির্বিষয় করার সামর্থ্য নেই। এ কেবল খুব উচ্চ স্তরের সাধকদের পক্ষেই সম্ভব, সাধারণ মানুষের পক্ষে চোখ বুঁজে ধ্যান করাই শ্রেয়। (গীতায় ধ্যানের নির্দেশ দিয়েছেন, 'সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্' ॥ (৬।১৩) অন্য কোনদিকে দৃষ্টি

না দিয়ে কেবল নাসিকার অগ্রভাগের দিকে দৃষ্টি রাখবে। এর অর্থ এমন নয় যে নাসিকার অগ্রভাগই দেখতে হবে। কারণ তাহলে সেই জিনিসটিরই মনে বৃত্তি উঠবে। কাজেই এর অর্থ পরের শ্লোকার্ধে স্পষ্ট যে—কোনদিকেই দেখবে না। তাছাড়া আমরা গোড়াতেই সাবধান করে দিই যে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে যোগীরাই পারেন, সাধারণ মানুষ পারে না। করতে গেলে চোখের অসুখ হয়ে যাবে। এইজন্য ইন্দ্রিয়-গুলি যেমন স্বাভাবিক ভাবে কাজ করে তাই করতে দিতে হয়। তাই ওসব না করে সাধারণ নিয়ম মতো চোখ বন্ধ করে ধ্যান করাই ভাল। অনেক সময় বলা হয় চোখ বন্ধ করে ধ্যান করলে ঘুম আসতে পারে, তাতে দোষ হয়। তার উত্তরে বলা যায়, হ্যাঁ ঘুম আসতে পারে ঠিকই কিন্তু জেগে থাকলেও তো মন ঘুমিয়ে পড়তে পারে, অর্থাৎ খেই হারিয়ে ফেলতে পারে। এটিকে শাস্ত্রমতে 'লয়' বলে। এটিও ভাল নয়, এ থেকেও সাধনার বিঘ্ন ঘটে। তখন বলছেন, 'লয়ে প্রবোধয়েৎ চিত্তং'—তখন মনকে জাগাতে হবে। ঘুমিয়ে পড়লে হবে না মনকে ধ্যেয় বস্তুতে কেন্দ্রিত করে রাখতে হবে।

এই বিষয়টি বিশদ করার কারণ এই যে, সাধন পথে এরকম একটা অনুভব অনেকের আসে, মনে করে আমি এমন ধ্যান করছিলাম যে কিছু জানি না। কিন্তু তারপর ফল কি হল? শূন্য। কারণ ধ্যান করলে ফল হবে, কিছুই হচ্ছিল না তো ফল কি হবে? এই অবস্থাটিকেই লয় বলা হয়েছে, মন যে চেষ্টা করছিল সেই চেষ্টা থেকে বিরত হয়েছে।

যাই হোক ধ্যান চোখ চেয়ে হয়, কথা কইতে কইতে হয়, ঠাকুরের এই কথাগুলি গভীরভাবে চিন্তা করে বুঝতে হবে। কথা বলতে গেলে মনের একটা অংশ ব্যবহার না করলে বলা যায় না। তার ভিতরেও ধ্যান হয়। কেমন করে হয়? না, মনের ভিতর যখন ভগবৎ চিন্তার একটা স্রোত বইতে থাকে তখন অন্য কথা বললেও তাতে সম্পূর্ণ নিয়োজিত

থাকে না। মন তার চিন্তায় ডুবে থাকে, তখনই ধ্যান হয়। যেমন দাঁতের ব্যাথার দৃষ্টান্ত দিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে মনটা ছড়িয়ে থাকলেও অনেকটা অংশ যেন ঐ ব্যথার দিক থেকে যায়, সব কাজের ভিতরে ব্যথার অনুভব থাকে। সেইরকম ভগবানে একেবারে একনিষ্ঠ হতে পারলে তখন অন্য কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে মনের যোগ বা ধ্যান, জপ যাই বলি সেটা অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলতে থাকে। এটি দীর্ঘ অভ্যাসের পরিপক্ক ফল, সহসা হয় না। যাঁরা এই অভ্যাস করেছেন তাঁদের অন্তরে একটা অন্তঃসলিলা ধারা একটানা চলতে থাকে। যেমন নদীর স্রোত একদিকে চলছে। বিপরীত দিক থেকে হাওয়া হলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জলকে বিপরীত দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভিতরের ধারাটা একমুখেই চলে। এইরকম মনের ধারাটা ভগবদ্ অভিমুখে এক টানা চলবে তার উপরে আবার বিষয়ের তরঙ্গও হতে থাকবে, কিন্তু সে তরঙ্গ মনকে তার লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করতে পারবে না। একেই বলছেন কথা কইতে কইতেও ধ্যান হয়। তবে অনেক সময় কথা বলতে গেলে বাহ্যত একটু অন্যমনস্কতা দেখা যায়। যখন মন বেশী গভীরে চলে যায় তখন আর বাইরের কাজ সম্ভব হয় না, একেই বলে তন্ময় অবস্থা।

এরপর অন্য প্রসঙ্গে গেলেন। বললেন, 'শিখরাও বলেছিল, তিনি দয়াময়। ......আমাদের মানুষ করেছেন, আমাদের পদে পদে বিপদ থেকে রক্ষা করছেন। তা আমি বললুম, তিনি আমাদের জন্ম দিয়ে দেখছেন, খাওয়াচ্ছেন, তা কি এতো বাহাদুরী ? তোমার যদি ছেলে হয়, তাকে কি আবার বামুনপাড়ার লোক এসে মানুষ করবে ?' ভাব হচ্ছে, ভগবানের সঙ্গে এতদূর আপন বোধ হওয়া দরকার। আমরা যে কৃতজ্ঞ হই তার মানে ভগবানের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ হয়নি, হলে আর কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন আসে না, তখন অধিকার বোধ আসে। রামপ্রসাদ যেমন ব্রহ্মময়ীর চরণ লুটে নেব বলেছেন, অর্থাৎ আমার সে অধিকার

আছে। ঠাকুরও বলেছেন, ভগবানের সঙ্গে ঐরকম নিবিড় সম্বন্ধ করতে হয় তাহলে দাবী জানাতে পারা যায় যে, তাঁর সম্পত্তি আমারও সম্পত্তি। ভক্তের পক্ষে এটা অনুকূল সম্বন্ধ।

জন্মান্তরের সাধনা ও পরিণতি

একজন প্রশ্ন করছেন, 'আজ্ঞে কারু ফস্ করে হয়, কারু হয় না, এর মানে কি? এই প্রশ্ন অনেকেরই মনে ওঠে। আমি এতদিন ধরে সাধন করছি কিন্তু কিছুই হচ্ছে না আর অমুক লোক একটু সাধন করল অমনি হয়ে গেল। ঠাকুর এখানে তার একটি কারণ বলছেন, 'কি জান? অনেকটা পূর্বজন্মের সংস্কারেতে হয়। লোকে মনে করে হঠাৎ হচ্ছে।' ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন, তার আগে যে সব কর্ম করা ছিল সেগুলি আমরা তো দেখতে পাই না, যা প্রত্যক্ষ তাই দেখি। এখানে উদাহরণ দিয়েছেন, মাত্র একপাত্র মদ খেয়ে বেহুঁশ হবার, হনুমানের নিমেষে স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ করবার। উদাহরণ দিয়েছেন, লালাবাবুর ও রাণী ভবানীর। অন্যত্র একজনের শবের উপর বসবার সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আবার বলেছেন, বাগানে জলের পাইপ আছে, মালী এটা ওটা খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ জলের পাইপটা খুলে গিয়েছে কুলকুল করে জল বেরোচ্ছে। আগে জল ছিল না, হঠাৎই তখন বেরিয়ে এল তা তো নয়। জল ছিল—যে প্রতিবন্ধক থাকায় জলটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না, তা যেই দূর হয়ে গেল অমনি জলের স্রোত দেখা গেল। এইরকম সাধন পথে চলতে চলতে হয়তো কারো কোন জায়গায় একটু প্রতিবন্ধক সাধনার গতিকে রুদ্ধ করে রেখেছিল সেটা দূর হয়ে যেতেই সে সাধনপথে এগিয়ে যায়। আমাদের কাছে তার সাধনার আগের অংশটুকু অজ্ঞাত তাই আমরা বলছি হঠাৎ হল। আবার ঠাকুরেরই ভিন্ন কথা অন্য জায়গায় আছে, তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি

দিতে পারেন, দেওয়া না দেওয়া তাঁর খুশী। একজন ছেলে একটা সুন্দর কাপড় পরেছে, একজন তাকে বললে, দেবে ওটা? বলে, না, দেব না। আবার ছেলেটা কখনও একটা একপয়সার পুতুল দেখে কাপড়টা দিয়ে পুতুলটা নিয়ে নিলে। ছোট ছেলের এই যেমন খামখেয়ালী ভাব ভগবানেরও তেমনি শিশুস্বভাব।

এই প্রসঙ্গে বাইবেলের একটি গল্প মনে পড়ছে। একজন তার জমিতে চাষ করাবার জন্য মজুর লাগিয়েছে। একদল মজুর সকাল থেকে কাজ আরম্ভ করেছে, দুপুরে এসেছে একদল, বিকেলে এসেছে আর একদল, সন্ধ্যা হয় হয় সেই সময়েও একদল এসেছে। দিনের শেষে কাজ শেষ হয়ে গেলে জমির মালিক প্রত্যেককে সমানভাবে মজুরী দিলেন। যারা প্রথমে এসেছিল তারা বললে, আমরা এই দিনভোর কাজ করে যা পেলাম এরা শেষকালে এসেও সেই একই মজুরী পেয়ে গেল! মালিক তার উত্তরে বললেন, তোমাদের যা দেবার কথা তার চেয়ে তো কম দিই নি। আমি যদি কাকেও এমনিই দিই তাতে তোমাদের বলবার কি আছে? এখনকার মতো তখন মজুরেরা সংঘবদ্ধ ছিল না কাজেই বলবার কিছুই ছিল না।

এই যে আমরা সব জিনিস ব্যাখ্যা করতে পারি না তার কারণ তিনি কার্য-কারণের বশ নন। ঠাকুরের কথা, যাঁর নিয়ম, তিনি ইচ্ছা করলে বদলাতে পারেন। লাল জবাফুলের গাছে তিনি সাদা জবাফুল ফোটাতে পারেন। কিন্তু আমরা যখন তাঁর পথে চলতে আরম্ভ করি, নিয়ম অনুসরণ করেই চলি। এখন কখন তাঁর দয়া হবে অথবা কাকে দয়া করবেন আর কাকে করবেন না সে তিনিই জানেন। অনেকেরই অনুযোগ, আমরা এতদিন করছি, তবু তাঁর দয়া হচ্ছে না। আমরা তাদের বলি, তোমাদের যা করবার তোমরা কর, তাঁর যা করবার তিনি করবেন। তাঁকে দয়া করবার জন্য বাধ্য করতে পারি না। আমাদের

সাধনা করবার কথা কিন্তু কতটুকু তা করেছি, যার পরিণামে আমরা সিদ্ধি দাবী করতে পারি? নিজেকে এ প্রশ্ন করতে হবে। মূল্য দিয়ে তাঁর কৃপাকে কি কেনা যায়? তাহলে তো সেটা কৃপা হত না।

এ সম্পর্কে বেদে দৃষ্টান্ত আছে সোমযাগের জন্য সোমরস দরকার। তখন সোমলতা দুষ্প্রাপ্য ছিল। একজন লোক একগাড়ী সোমলতা নিয়ে এসেছে, যজ্ঞ যিনি করছেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কত দাম? যথারীতি দরদস্তুর চলতে লাগল। ক্রেতা যতই দাম বাড়ান বিক্রেতা ততই বলে, 'রাজাসোম তত এব ভূয়ান'—সোম তার চেয়েও বেশী মূল্যবান। এইরকম করে করে ক্রেতা তাঁর সর্বস্ব দিতে স্বীকার করলেন সোমের জন্য। তখনও বিক্রেতা বলছে, 'রাজাসোম তত এব ভূয়ান'। দর কষাকষির পরও যখন সোমের মূল্য নিরূপিত হল না তখন বিক্রেতার কাছ থেকে তা লুঠ করে নিতে হল। তখন তো আর দাম দিয়ে নেবার কোন উপায় নেই। আসল কথা হচ্ছে এই যে, এ জিনিস মূল্য দিয়ে কেনা যায় না। আধ্যাত্মিক সম্পদও সাধনভজনরূপ মূল্য দিয়ে কেনা যায় না, তাঁর কৃপার উপর নির্ভর করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই। কৃপার উপর নির্ভরতা তখনই ঠিক ঠিক আসে যখন আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি কিন্তু সফলতা আসেনি। অনেক সময় বলি, তাঁর দয়া যখন হবে তখন হবে। এটি অলসের কথা। দয়া কখন হবে জানি না কিন্তু নিজেদের শক্তি যতক্ষণ না প্রয়োগ করতে পারছি ততক্ষণ অবধি আমরা দয়ার আশা করতে পারি না। যতক্ষণ 'আমি' বুদ্ধি আছে ততক্ষণ হাল শক্ত করে ধরতে হবে তা না হলে নৌকা ভেসে যাবে। খুব চেষ্টা করে যেতে হবে, যখন দেখা যাবে আর পারছি না তখন তাঁর হাতে হাল ছেড়ে দিতে হবে। এই হল শাস্ত্রের কথা, ব্যবহারিক কথাও। নিজের অহংকার পরিপূর্ণরূপে চূর্ণ হলেই হাল

ছাড়ব আর তখনই তিনি এসে হাল ধরবেন। এইটুকু বিশেষ করে মনে রাখতে হবে।’)

ভাব অনুসারে ব্যবহার

কারও সহসা জ্ঞানবৈরাগ্য হয় কারও হয় না। এর মানে কি, জনৈক ভক্তের এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলছেন, ‘অনেকটা পূর্বজন্মের সংস্কারে হয়।’ যেমন লালাবাবুর ভিতরে পূর্ণ বৈরাগ্য ছিল কিন্তু একটু তাকে উসকে দেওয়ার দরকার ছিল। আগুন ভিতরে জ্বলছিল তবে দেখা যাচ্ছিল না। ধোপানীর একটা সামান্য কথায় তাঁর বৈরাগ্য এল, তিনি সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন। ঠাকুর বলছেন, তাঁর বৈরাগ্যের উপর একটা আবরণ ছিল সেই আবরণটা সরে যেতেই বৈরাগ্যের পূর্ণ প্রকাশ ঘটল।

তারপরে বলছেন, ‘শেষজন্মে সত্ত্বগুণ থাকে, ভগবানে মন হয়।’ কোন ভাল কাজও যদি অহংকার বশে করা হয় ঠাকুর তার বিরোধী ছিলেন। যারা ভাবে জগতের উপকার করবে তারা নিজেদের সামর্থ্য বিচার করে দেখে না। তাই ঠাকুর বলছেন, জগৎ কতটুকু, আর তোমার সামর্থ্যই বা কতটুকু যে তুমি জগতের উপকার করবে? নিজের ক্ষুদ্রত্ব, অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্পর্কে যদি মানুষের ধারণা থাকে তাহলে সে আর জগতের উপকার করবার জন্য ব্যস্ত হবে না। তাহলে লোককল্যাণকর কাজগুলি কি কেউ করবে না? এর উত্তর ঠাকুর নিজেই দিয়েছেন, শিবজ্ঞানে জীবসেবা করবে। তা যদি কর তাতে দোষ নেই, তা না হলে আমি জগতের উপকার করছি এটা আত্মাভিমানের পরিচয়। এতে না জগতের কল্যাণ হয় না নিজের কল্যাণ হয়। জগতের সমস্ত ব্যক্তির ভিতরে ভগবান আছেন এই বোধ অথবা সেবাবুদ্ধি নিয়ে জগতের কল্যাণকর কিছু করা গেলে তার ফল

অন্যরকম। যে সেবা করছে তার ভিতরে অভিমান অহংকার আসার সম্ভাবনা থাকে না আর যাদের সেবা করছে তাদের ভিতরে যে সুপ্ত ভগবত্তা আছে সেটি ফুটে ওঠা সহজ হয়। তাদের আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে যে আমাদের ভিতরেও সেই ভগবান আছেন।

নারাণ এসেছেন ঠাকুর সাদরে তাঁকে খাটে নিজের পাশে বসালেন। ঠাকুরের কাছে অনেক ভক্ত আসেন অধিকারী বিশেষে ব্যবহার একটু ভিন্ন ধরণের করেন, যদিও কেউ তার কম স্নেহের পাত্র নন। এখন নারাণকে খাটে বসালেন, স্বামীজীকে বসিয়েছেন। কিন্তু মাস্টার-মশাইকে কখনও বসাননি। যদিও মাস্টারমশাই তাঁর বিশেষ স্নেহাস্পদ। আসলে যার যেমন ভাব সেই অনুসারে তার সঙ্গে ব্যবহার করতেন। কারো ভাব বিঘ্নিত হয় এমন ব্যবহার করতেন না। যেমন কারো যদি দাস আর প্রভু এইভাব থাকে তার কাছে এই ব্যবধানটি বজায় রাখতেন যেন তার ভাবের ব্যভিচার না হয়। রামবাবু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত এঁরা, তিনি এঁদের কত প্রশংসা করেছেন কিন্তু ব্যবহার পৃথক রেখেছেন।

ভক্তিই সার

একবার ঠাকুর ভাবস্থ অবস্থায় নানা দেবদেবীর পটগুলি দেখছেন। তারপর বলছেন, 'যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে, সেরূপ স্বভাব হয়ে যাবে। তাই ছবিতেও দোষ।' রজোগুণ বিষয়ক ছবি ঘরে রাখলে মনও রজোগুণী হয়ে যাবে। বলছেন, 'গাছ দেখলে তপোবন মনে পড়ে—ঋষি তপস্যা করছে, উদ্দীপন হয়।'

সিঁথির ব্রাহ্মণ এসেছেন। তিনি কাশীতে থেকে বেদান্ত পড়েছিলেন। ঠাকুর তাঁর কাছে দয়ানন্দের কথা জানতে চাইলেন। দয়ানন্দ দেবতা মানতেন কিন্তু আমাদের মতো করে মানা নয়।

সাধারণভাবে দেবতা যাঁদের বলা হয় তাঁরা একটু উচ্চ শ্রেণীর জীবমাত্র, তাঁরা স্বর্গে ভোগসুখে থাকেন এবং ভোগের আকাঙ্ক্ষাও আছে। তাই ত্যাগী পুরুষেরা ঐসব দেবতাদের প্রতি আকৃষ্ট হন না। যারা ঐসমস্ত দেবতাদের চায় তারা স্বর্গসুখ চায় কিন্তু স্বর্গসুখই এ জগতে চরম কাম্য নয়।

কথায় কথায় সিঁথির পণ্ডিত কর্ণেল অলকাটের প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি থিওজফির একজন প্রধান প্রচারক ছিলেন। পণ্ডিত বলছেন, 'ওরা বলে সব মহাত্মা আছে। আর চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক এই সব আছে। সূক্ষ্ম শরীরে সেইসব জায়গায় যায়।' ঠাকুর একটু বিরক্ত হলেন আর ওসব আলোচনায় গেলেন না। তিনি বললেন, 'ভক্তিই একমাত্র সার।' ঠাকুরের কোন বিশেষ মতবাদের প্রতি পক্ষপাত বা বিরূপতা নেই, যে কোনো মতবাদের যদি উদ্দেশ্য হয় ভগবানের উপর ভক্তিলাভ তাহলে তা ভাল। উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে হবে।

ঠাকুর রামপ্রসাদের একটি গান করলেন তার ভাব হচ্ছে যে কেবল বুদ্ধির সাহায্যে তাঁকে জানা যায় না। শাস্ত্র বলছেন, 'নৈষাতর্কেন মাতিরাপনেয়া'—বিচারের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না, 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'—বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেও না। শুদ্ধ বুদ্ধি অর্থাৎ বাসনাশূন্য পবিত্র যে বুদ্ধি সে বুদ্ধির দ্বারাই ভগবানের স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

তারপরে বললেন, 'সাধনের খুব দরকার, ফস্ করে কি আর ঈশ্বর-দর্শন হয়?' ভাব হচ্ছে, সাধন করব না, চেষ্টা করব না অথচ একটা বড় জিনিস আশা করব, বলব ঈশ্বর দর্শন করব একি সম্ভব? তাঁকে দর্শন করতে হলে তার জন্য যা করণীয় সেগুলি আমরা করেছি কি? অনেকে বলেন, ঈশ্বর যে আছেনই তার প্রমাণ কি? প্রমাণ দেবে কে? তিনি কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রমাণ করা যাবে? যায় না। উপনিষদ্ বলছেন যে, সেই বস্তু চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কান দিয়ে

শোনা যায় না, মন দিয়ে মনন করা যায় না। যিনি ইন্দ্রিয়াতীত তাঁকে চক্ষুকর্ণের বিষয় করে দেখতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোনও দিন তাঁকে সাক্ষাৎ করা যাবে না। অর্জুনকে ভগবান বিশ্বরূপ দর্শন করালেন কিন্তু সাধারণ চোখে নয়, ভগবান তাঁকে দিব্যচক্ষু দিলেন তবে অর্জুন দেখতে পেলেন। সব জায়গাতেই এইরকম দিব্যচক্ষু মানে যে চোখের উপর মায়ার আবরণ নেই অজ্ঞানের দ্বারা যে চোখ আবৃত নয়, সেই চোখ দিয়েই আত্মবস্তুকে দর্শন করা যায়।

ব্রহ্ম ও শক্তি

এরপর বলছেন, 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি, চিচ্ছক্তি, আদ্যাশক্তি। রাধা প্রকৃতি, ত্রিগুণময়ী! এঁর ভিতরে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণ। যেমন পেঁয়াজ ছাড়িয়ে যাও, প্রথমে লাল কালোর আমেজ, তারপর লাল, তারপর সাদা বেরুতে থাকে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে, কামরাধা, প্রেমরাধা, নিত্যরাধা। কামরাধা চন্দ্রাবলী; প্রেমরাধা শ্রীমতী; নিত্যরাধা নন্দ দেখেছিলেন—গোপাল কোলে।

এই চিচ্ছক্তি আর বেদান্তের ব্রহ্ম (পুরুষ) অভেদ।' তারপরে আর একটু পরিষ্কার করে বলছেন, সীতা বলছেন, 'আমিই একরূপে রাম, একরূপে সীতা হয়ে আছি' অর্থাৎ যিনি একরূপে পুরুষ হয়েছেন তিনিই আর একরূপে প্রকৃতি হয়েছেন। একরূপে তিনি জগৎকারণ আর একরূপে তিনি আদ্যাশক্তি যা থেকে জগৎ-বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। সবই শক্তির এলাকা।

এই সম্বন্ধে আলোচনা করে একবার উদ্বোধনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের যে অদ্বৈত অর্থাৎ কালী ব্রহ্ম অভিন্ন সেটি হচ্ছে শাক্তাদ্বৈত। নির্বিশেষ অদ্বৈত যা বেদান্তের সিদ্ধান্ত এটি তা নয়। সেখানে ব্রহ্ম হলেন একমাত্র সত্য, আর তাঁর শক্তি হলেন মায়া

সেটি মিথ্যা। মিথ্যা মানে তার অস্তিত্বই নেই। শাক্তমতে মায়ার অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া হয় না। বলা হয় মায়া আছে কিন্তু তার ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক সত্তা নেই। এই বিষয়টি কথার মারপ্যাঁচ বলে মনে হয়। নির্বিশেষ ব্রহ্ম গীতায় যাঁকে পুরুষোত্তম বলেছেন তিনি ঈশ্বর নন, ঈশ্বর থেকে ভিন্ন। ঈশ্বর জগৎকারণ, একরূপে জগৎ কতৃত্ব, নিয়ন্ত্রিত্ব তাঁতে রয়েছে কিন্তু ব্রহ্মে জগৎ কর্তৃত্বাদি নেই। বোঝবার জন্য আমরা জগৎকে ধরে জগতের কারণে পৌছই, তাঁকেই বলি ব্রহ্ম। যেমন 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।' তৈ. উ. ৩. ১.—যাঁর থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, যাঁর দ্বারা সমস্ত প্রাণী জীবিত থাকে এবং অন্তে যাঁতে এই সকলের লয় হয়, তাঁকে বিশেষ করে জানতে চাও, তিনিই ব্রহ্ম। এখন সেই বস্তুটি পরিবর্তনশীল কি না এ প্রশ্ন ওঠে। পরিবর্তনশীল জগৎকে দেখে যখন আমরা ব্রহ্মকে বুঝতে যাই, তখন পরিবর্তনের অতীত সেই বস্তুকে ধরতে পারি না। এইটুকু বুঝতে পারি যে এর পিছনে কোন একটি অপরিবর্তনশীল তত্ত্ব না থাকলে পরিবর্তন ঘটতে পারে না। সেই তত্ত্বটি কিন্তু পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে এ সব সূক্ষ্ম বিচারের কথা, সাধারণ মানুষের বুদ্ধি অতদূর যায় না। ঠাকুর বলছেন, মন যতক্ষণ না শুদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ সেই তত্ত্বকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আর শুদ্ধ হলে তখন আর প্রকাশ করবার প্রয়োজনই হয় না, কারণ কার কাছে প্রকাশ করবে? জগৎ-বোধই তো তখন নেই।

সংসার ত্যাগ কি সম্ভব ?

(সংসারত্যাগের প্রসঙ্গে ঠাকুর পণ্ডিতকে বলছেন, না, ত্যাগ করতে হবে কেন? সব জিনিস তাঁর এই বোধ নিয়ে সংসারে থাকলে সংসার বন্ধনের কারণ হয় না। এমন কোনো জায়গা আছে কি যা সংসারের

বাইরে? যতক্ষণ 'আমি' বুদ্ধি থাকে, দেহাদিতে 'আমার' বুদ্ধি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কারো পক্ষেই সংসার ত্যাগ সম্ভব নয়। সংসার ত্যাগ করা মানে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া নয়। দেহটি নিয়ে যেখানে যাব দেহরূপ সংসার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। কাজেই যদি কেউ 'আমার দেহ' এই বুদ্ধি ত্যাগ করতে পারে তাহলে আর কোন ভয় নেই। সে সংসারেও থাকতে পারে, জঙ্গলে থাকতেও পারে সর্বত্রই সে নির্লিপ্ত। দেহ-বুদ্ধি নিয়ে সংসার ত্যাগ করলে অহংকারই বাড়ে প্রকৃত সংসারত্যাগ হয় না। সেইজন্য ঠাকুর শুধু সংসার ত্যাগের নির্দেশ কোথাও দেন নি।

বিচার ও ভক্তি

তারপরে বললেন, 'আর দেখ, শুধু বিচার কল্লে কি হবে? তাঁর জন্য ব্যাকুল হও, তাঁকে ভালবাসতে শেখ।' অর্থাৎ বিচার হচ্ছে বৌদ্ধিক স্তরের কথা। বিচার না হয় করলাম কিন্তু করে যে সিদ্ধান্ত হল তা কি গ্রহণ করতে পারছি? না পারলে সে বিচারের কি মূল্য আছে? এই বিচার করলাম জগৎটা মিথ্যা, অনিত্য, আবার ষোলআনা মন সংসারে পড়ে রইল, সংসারাসক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অতএব বিচার কোনও কাজে লাগল না। আসল কথা এই প্রকার বিচার আমাদের মনের একটা বিলাস মাত্র, মন শুদ্ধ না হলে সেই মনে প্রকৃত বৈরাগ্য আসবে না, বিচার অন্তঃস্থলে পৌছবে না। তাই বলছেন, তাঁর জন্য ব্যাকুল হও। তাঁকেই একমাত্র সৎ বস্তু বলে সিদ্ধান্ত করলে ব্যবহারেও এমন হতে হবে যে একমাত্র তাঁকেই চাই আর কিছু নয়।

অবশ্য ঠাকুর জ্ঞান নিষ্ফল বলেননি। সাধারণ শুষ্ক বিচার যে অর্থহীন সে কথাই বলছেন। কারণ প্রকৃত জ্ঞানী জ্ঞান বিচারের দ্বারা যে তত্ত্ব উপলব্ধি করেন সেটা নিরানন্দময় নয়, আনন্দময় স্বরূপই উপলব্ধি করেন।

সুতরাং সে জ্ঞানবিচারের কথা ঠাকুর এখানে বলছেন না, বাহ্য বিচারের কথাই বলছেন। তেমনি বাহ্য ভক্তি যা ভাবালুতা মাত্র তা সাময়িকভাবে ভগবৎ-বিষয়ে তন্ময়তা বা ক্ষণিক উচ্ছ্বাস এনে দিলেও স্থায়ীভাবে হৃদয়ের কোন পরিবর্তন করে দিতে পারে না। সেই ভক্তি স্থায়ী ফল দেয় না। সুতরাং বাহ্য ভক্তি এবং বাহ্য জ্ঞান দুই-ই নিরর্থক। তবে পার্থক্য এই যে ভক্তি অন্তত খানিকটা সময়ের জন্যও মনকে সরস করে।

পরের কথাটি বললেন, 'একটা কোনরকম ভাব আশ্রয় করতে হয়।' বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত পাঁচটি ভাবের উল্লেখ করে বলছেন, সাধারণ সাধকের পক্ষে দাস ভাবটি ভাল। অন্যান্য ভাবগুলি গভীরভাবে ধারণা করা খুব উচ্চ থাকের সাধক না হলে হয় না। এখন কোন ভাবটি বড় কোন ভাবটি ছোট তা বলা যায় না। হনুমান দাস্যভাবের সাধক আর সুদামা সখ্যভাবের সাধক কিন্তু হনুমান বড় না সুদামা বড় তা বলা যাবে না। যে কোন একটি ভাবকে ধরে তাতে ডুবে যাওয়াই মূল উদ্দেশ্য।

যার যেই ভাব হয় তার সেই উত্তম।
তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তদোত্তম॥

অর্থাৎ যার যেটি ভাব তার পক্ষে সেটি উত্তম। নিজের ভাবে নিষ্ঠা না থাকলে সাধনে অগ্রসর হওয়া যায় না, এটি মনে রাখতে হবে।

সংসারধর্ম ও ঈশ্বরলাভের পথ

সিঁথির পণ্ডিত মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে আসেন। সাধুসঙ্গের প্রভাবে ভিতরের বৈরাগ্য উদ্দীপিত হয়, বলছেন, 'এখানে এলে সেদিন পূর্ণ বৈরাগ্য হয়। ইচ্ছা করে—সংসার ত্যাগ করে চলে যাই।' ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন, 'আপনারা মনে ত্যাগ করো। সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাক।' ত্যাগের ইচ্ছা হলেই ত্যাগ করে যাওয়া সম্ভব হয় না, নানারকম কর্তব্যের বন্ধন আছে সেগুলিকে এক কথায় কাটা যায়

না। তাই ঠাকুর সংসারীদের অন্তরে ত্যাগ করবার উপদেশ দিচ্ছেন। তাঁর এইরকম উপদেশের কারণ এই যে, আমাদের মনে অনেক সময় অনেক কিছু করবার ইচ্ছা হয় কিন্তু সব ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। যেটা সম্ভব নয় সেটা করতে চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হয় কারণ কাজটিও সিদ্ধ হয় না অথচ মনের ভিতরে একটা তীব্র অসন্তোষ থাকে, যে অসন্তোষ কল্যাণকারী হয় না। এইজন্য যে যা করছে তাতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া দরকার। যাঁরা সংসারে আছেন বৈরাগ্যের জীবন দেখলে নিজেদের অনধিকারী ভেবে তাঁদের মনে অনেক সময় অশান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাতে সংসারও যে একটা পথ, এর ভিতর দিয়েও যে ভগবান লাভ করা যায়—এই বিশ্বাস থাকে না। এই অবস্থাটা অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ সংসারকে শ্রদ্ধাও করতে পারছি না আবার ছাড়তেও পারছি না আবার এইরকম পরিস্থিতি সাধনপথকে বিঘ্নিত করে। ঠাকুর এটা চাইতেন না, বলতেন, যে যে পথের অধিকারী সেই পথের প্রতি তার শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকা দরকার। এখানে যে বলছেন অন্তরে ত্যাগ করলেই হবে এটা আপোসের কথা নয়। মনে রাখতে হবে সাধন বিষয়ে তিনি কখনও আপোস করেননি বা মিথ্যা স্তোকবাক্যও দেননি। তিনি যখন বলছেন সংসারে থাকলে হবে তখন কথাগুলি ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিয়ে সাধনপথে এগোতে হবে। অনেকসময় ঠাকুরের কথা সম্বন্ধে কারো মনে সংশয় আসত, যেমন আগে একজন ঠাকুরের সামনে বলেছিলেন, মশায়, ইনি এখন বলছেন দুই করো তারপর একদিন কুটুস করে কামড়াবেন। অর্থাৎ তখন বলবেন যে না, সংসার ছাড়তে হবে। ঠাকুরের ত্যাগবৈরাগ্যময় কথাগুলি শুনলে অনেক সময় মনে হোত যে বৈরাগ্যই হচ্ছে সার বস্তু, সংসার তুচ্ছ একে ছাড়তে হবে। এভাবে বুঝলে ঠাকুরের কথার আংশিক সত্য নেওয়া হবে। তিনি যখন বলছেন, সংসারে থাকলেও হয় তখন কথাটিকে দৃঢ়ভাবে নিতে হবে এবং

নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে হবে। এখন নির্লিপ্ত হওয়াটা কঠিন হয়ে উঠলে মনে হয় সংসার ছাড়লেই ভাল হবে। কিন্তু সেটাই কি সহজ! সংসার ছেড়ে ভিক্ষাজীবী হলেই কি ধর্মজীবন পুষ্ট হয়? সংসার ছেড়ে যাব অথচ সংসার মন থেকে ছাড়ছে না, সে অবস্থায় সংসার ত্যাগ করা আরও খারাপ, এ কথাটা ঠাকুর বহুবার বলেছেন। এক জায়গায় বলছেন, মনের ভিতরে বাসনা গজগজ করছে আবার গেরুয়া পরা অর্থাৎ মন না রাঙিয়ে বসন রাঙান হল। শাস্ত্রমতে এটা মিথ্যাচার।

অবশ্য তার মানে এ নয় যে, যাঁরাই গেরুয়া পরবেন তাঁদের মন থেকে সবই ত্যাগ হয়ে গিয়েছে। তাঁরা সরাসরি ত্যাগের পথ গ্রহণ করে সেই পথ ধরে চলতে চেষ্টা করছেন। যাঁরা আন্তরিক ভাবে সে চেষ্টা করতে পারবেন না তাঁদের সে পথে পা বাড়ান উচিত নয়। ত্যাগ সকলকেই করতে হবে, কারো পক্ষে অন্তরে এবং বাইরে করতে হয়, কারো পক্ষে কেবল অন্তরে ত্যাগ করলেই কাজ হয়। অন্তরে ত্যাগই হল প্রধান তবে কার কোনটি প্রয়োজন সেটা ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে। কোনটাকেই সর্বজনীন সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করলে হবে না। উপদেশ সবসময় অধিকারী অনুসারে হতে হবে। এখানে অধিকারী বলতে যে সন্ন্যাসের অধিকারী তার জন্য সন্ন্যাস ধর্ম আবার যে গার্হস্থ্যের অধিকারী তার জন্য গার্হস্থ্যর ধর্ম। এর ভিতরে ছোট বড় এ হিসাব করা উচিত নয়, উচিত ভেবে দেখা আমার পক্ষে কোনটি উপযোগী। ভগবান অর্জুনকে উপদেশ দেবার সময় বলেন—

'যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥' (৫/৫)

—জ্ঞানী যে মোক্ষলাভ করেন কর্মযোগীও তাই প্রাপ্ত হন। যিনি জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্মযোগ একই ফলদায়ক এরকম দেখেন তিনিই সম্যকদর্শী। অর্জুন বিমূঢ় হয়ে বলেছিলেন,

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ (৩/২)

কখনও জ্ঞানের আবার কখনও কর্মের প্রশংসায় অর্জুনের চিত্ত সংশয়াপন্ন হয়েছে, তাঁর পক্ষে কোন পথ গ্রহণীয় কোন পথ ত্যাজ্য স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট —তার নির্দেশ দেবার জন্য ভগবানকে বলছেন, যাতে আমার কল্যাণ হয় তেমন একটি পথ আমায় নিশ্চিত করে বলে দাও। অর্জুন নিজে সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছেন না। এই হল মুস্কিল। আমাদের পক্ষেও সিদ্ধান্তে পৌছন অনেক সময় কঠিন হয়। আমাদের পক্ষে কি করণীয়, কোনটি উপযোগী তা আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না। এইজন্যই এমন একজনের কাছে উপদেশ চাই যিনি শুদ্ধদৃষ্টি, যাঁর দৃষ্টিতে সত্য এবং অসত্য স্পষ্ট পৃথকরূপে প্রতিভাত হয়। ওষুধ নানারকম আছে, কেউ যদি বলে কোনটি সবচেয়ে ভাল ওষুধ? তার উত্তর দেবার আগে কোন রোগীর জন্য ওষুধ সেটা আগে জানতে হবে তারপর তার পক্ষে কোন ওষুধ ভাল সে নির্দেশ দেওয়া যাবে। এজন্য চাই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ। তাই ঠাকুর যখন যে ভাবের কথা বলেছেন তাতে যেন সমস্ত জোর দিয়ে বলেছেন। স্বামীজীর বক্তৃতাবলীতেও দেখা যায় যে তিনি যখন যে বিষয়ে বলতেন মনে হোত যেন এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। যখন জ্ঞানযোগের কথা বলতেন তখন মনে হোত এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই। আবার যখন কর্মযোগের কথা বলেছেন তখন কর্মযোগকে একেবারে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেছেন। ভক্তিযোগের কথাও কখনও বলছেন সেখানে দেখাচ্ছেন ভক্তিই সার। এজন্য মানুষের মনে অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হোত। একদিন স্বামীজীর শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামীজীকে বললেন, আপনি এক একসময় এক একরকম বলেন, কোনটা ঠিক সিদ্ধান্ত বুঝতে পারছি না। তাতে তিনি বললেন, যখন এরকম সন্দেহ হবে আমাকে জিজ্ঞাসা করবি।' কারণ উপদেশ

ব্যক্তিসাপেক্ষ। এমন কোনো উপদেশ নেই যা সকলের পক্ষেই শ্রেষ্ঠ।

ঠাকুরের দৃষ্টি সর্বাবগাহী। তবু তিনি তাঁর সন্তানদের কোনো কোনো পথ অনুসরণ করতে নিষেধ করতেন। তন্ত্রশাস্ত্রে যে বামাচার প্রথা আছে সেগুলি সমাজবিরোধী। কিন্তু তা বলে সেগুলি যে পথ নয় একথা ঠাকুর বলেননি। বলেছেন, ও পথে তোমরা যাবে না, ও পথ নোংরা পথ। যে পথ নিন্দিত ঘৃণিত, সে পথকেও ঠাকুর পথ বলে বুঝেছেন। তিনি নিজে সে পথের অনুসরণ না করলেও যাঁরা অনুসরণ করছেন তাঁদের দেখে তাঁদের ভিতরেও যে বড় বড় সাধক ছিলেন এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন। তবু সকলের জন্য যে সে পথ অনুসরণীয় তা বলেননি।

জ্ঞান বিচারের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলছেন নিত্য অনিত্য বিচার পূর্বক অনিত্যকে ত্যাগ করে নিত্যকে গ্রহণ করতে হয়। তা না করলে জীবনে সে বিচারের সার্থকতা নেই। বলছেন, 'জ্ঞানবিচার পুরুষ মানুষ, বার বাড়ী পর্যন্ত যায়, ভক্তি মেয়েমানুষ অন্তঃপুর পর্যন্ত যায়' অর্থাৎ জ্ঞান বহিরঙ্গ সাধন, অন্তরঙ্গ সাধন হল ভক্তি। জ্ঞানপথ ভগবানের ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করে যায়। আর ভক্তিপথ ভগবানকে ব্যক্তিরূপে নিয়ে ভক্তকে তাঁর সঙ্গে নানাভাবে লীলাবিলাস করায়। তবে একটি ভাব আশ্রয় করলে অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ করে নিলে সহজে মনকে তাতে নিবিষ্ট করা যায়। এইজন্য বিভিন্ন ভাবের কথা বললেন।

এর পরের পরিচ্ছেদে মাস্টারমশাই কতকগুলি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। ঈশান মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের কাছে এসে প্রণাম করে বসলেন। পুরশ্চরণাদি শাস্ত্রোল্লিখিত কর্মে ঈশানের খুব অনুরাগ। তিনি ছিলেন কর্মযোগী। কর্মযোগ বলতে ঠাকুর স্বামীজীর বা গীতার

নিষ্কাম কর্মকে বোঝাননি। ঠাকুর এখানে শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্মগুলি যিনি নিষ্ঠা সহকারে অনুষ্ঠান করেন তাঁকেই কর্মযোগী বলেছেন। যাগযজ্ঞাদি কর্মও একরকমের কর্মযোগ। আবার গীতায় কর্মযোগ বলতে যাগযজ্ঞাদির কথা বলা হয়নি, নিষ্কাম কর্মের কথাই বলা হয়েছে। স্বামীজীও তাই বলেছেন। ঈশানের যাগযজ্ঞ পুরশ্চরণ প্রভৃতিতে আগ্রহ আছে তাই এখানে ঠাকুর বলছেন, ঈশান কর্মযোগী।

কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ও ভক্তিযোগ

ঠাকুর বলছেন, 'জ্ঞান জ্ঞান বললেই কি হয়? জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে। দুটি লক্ষণ—প্রথম অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা। আর একটি লক্ষণ কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ।' জ্ঞানীর লক্ষণ সম্পর্কে বলছেন যার ঈশ্বরে ভালবাসা এসেছে এবং যার কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ঘটেছে তিনিই জ্ঞানী। এখানে জ্ঞানী বলতে যিনি শুধু বেদান্ত বিচার করেন তাঁর কথা বলা হচ্ছে না। যিনি ভগবানকে জেনে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন, তিনিই জ্ঞানী। তাঁর আরাধ্য যে ভগবান তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় হতে পারেন অথবা তা নাও হতে পারেন। ঈশ্বর যেমনই হোন তাঁকেই সারবস্তু জেনে যিনি সংসারের অন্য সব বস্তুকে উপেক্ষা করে ভগবানে মনকে নিবিষ্ট করবেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। তাঁর অন্যতম লক্ষণ কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ঘটা। 'কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ বলতে মনের ভিতর একটা প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হওয়া বুঝিয়েছেন। আমাদের ভিতরে যে শক্তি আছে সেই শক্তির একটা খুব সূক্ষ্ম বা কেন্দ্রীভূত রূপকে যোগশাস্ত্রে কুণ্ডলিনী বলা হয়। সেই কুণ্ডলিনী যখন জেগে ওঠেন তখন তার পরিণামে তত্ত্বকে লাভ করবার জন্য একটা প্রবল আবেগ উৎপন্ন হয়। সেই শক্তি সাধারণের ভিতর সুপ্ত আছে। ভক্তি বা জ্ঞানের দ্বারা অথবা যোগের দ্বারা সেই শক্তিকে

জাগান যায়। জাগলে তত্ত্বে পৌঁছবার জন্য আমাদের ভিতরে একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, মন ভগবন্-মুখী হয়। এই হল কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ বা প্রকাশ।

সাধারণ মানুষ অনেকে ধ্যান করতে বসেই ভাবে যে কুণ্ডলিনী জেগে উঠছে। ঐ বুঝি সাপটাপের মতো কি যেন একটা নীচের দিক থেকে সড় সড় করে উপরে উঠছে। এইসব চিন্তা করে অনেকে নানারকম বিভ্রান্তি মনের মধ্যে পোষণ করেন। আসলে মানুষের অলৌকিকের দিকে এত বেশী ঝোঁক যে জীবনের অন্য দিকগুলোর বিচার করবার ধৈর্য নেই বা করবার চেষ্টাও নেই। তার একটা কারণ হল সে মনে করে হঠাৎ একটা কিছু হয়ে যাবে। তাই ওসব দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে নিজেদেরই ক্ষতি করে। ঐসব বিভ্রান্তি মনে যাতে না ওঠে তারই চেষ্টা করা উচিত। সব সময় বিচার করতে হবে ভগবানের জন্য আমার মনে কতখানি ব্যাকুলতা হল এবং ভগবান ছাড়া অন্য সব জিনিসের প্রতি মনের টান কতখানি কমল এবং ভগবান সম্বন্ধে আমার মন কতটা নিঃসংশয় হল—এগুলি বিশেষ করে ভাববার বিষয়। আমাদের সকলেরই মনে ভগবান সম্বন্ধে একটা সংশয়পূর্ণ ভাব থাকে। যত তাঁর দিকে এগোন যাবে ক্রমশঃ একটু একটু করে সংশয় কেটে গিয়ে ধারণা স্পষ্ট হবে।

সুতরাং কুণ্ডলিনী বিচার করতে গিয়ে মাথা খারাপ হওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না। এইজন্য গোড়া থেকেই এই কৌতূহল থেকে মনকে মুক্ত রাখা উচিত। কুলকুণ্ডলিনী যখন জাগবার আপনিই জাগবেন আর কাকেও বলে দিতে হবে না। আসলকথা কি করে তাঁর জন্য মন ব্যাকুল হয় তারই চেষ্টা করা, একথা ঠাকুর বার বার বলেছেন। এখানে বললেন, 'এই কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হলে ভাব ভক্তি প্রেম এই সব হয়, এরই নাম ভক্তিযোগ।'

সাধনা ও সিদ্ধাই

এরপরে বলছেন, 'কর্মযোগ বড় কঠিন। কর্মযোগে কতগুলি শক্তি হয়—সিদ্ধাই হয়'। তার মানে কর্মযোগের উপর বেশি জোর দিলেন না। ঈশানের একথা মনোমত হল না তাই তিনি হাজরার কাছে চলে গেলেন। ঠাকুরের ভাবটি হচ্ছে এই, নিয়ম করে আনুষ্ঠানিক জপ পুরশ্চরণ ইত্যাদি করার দিকে যদি মন যায় এবং তার পরিণামে যদি ভক্তি লাভ হয় তাহলে তো খুবই ভাল। তা না হলে কেবল সিদ্ধাই লাভ হয়। সিদ্ধাই মানে অলৌকিক শক্তি যা সাধনপথে প্রতিবন্ধক রূপে এসে দাঁড়ায়। এর দ্বারা সাধকের মনে অহংকার এসে পড়ে ফলে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তাই সিদ্ধাই সম্বন্ধে ঠাকুর বারবার সাবধান করে দিয়েছেন।

ষট্‌চক্র

এবার ঠাকুরের সম্বন্ধে মাস্টারমশায় স্বগতোক্তি করছেন, 'হাত একবার মাথার উপর রাখিলেন, তারপরে কপালে, তারপর কণ্ঠে, তারপর হৃদয়ে তারপরে নাভিদেশে'। কেন দিচ্ছেন তা তিনি কাকেও খুলে বলেননি। মাস্টারমশাই ভাবছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ কি ষট্‌চক্রে আদ্যাশক্তির ধ্যান করিতেছেন? শিবসংহিতাদি শাস্ত্রে যে যোগের কথা আছে, এ কি তাই!' তন্ত্রশাস্ত্রে চক্রের স্থান এইগুলি—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা। এই ছয়টি চক্রের উপরে সপ্তম হল সহস্রার। সেখানে গেলে আদ্যাশক্তি পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হন অর্থাৎ সেখানে ব্রহ্ম আর শক্তি দুই-ই এক হয়ে যান, এটিই হচ্ছে চরম সমাধিস্থান। সেখানে শক্তির আর পৃথক কোনো প্রকাশ, কোনো ক্রিয়া নেই।

মনে রাখতে হবে এই চক্রগুলি শারীরিক কোনো সংস্থান নয়,

শরীরের অংশ কেটে সেই চক্রগুলিকে দেখা যাবে না। এগুলি যোগীর অনুভবগম্য। যোগীরাই ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ী দেখতে পান। তবে দেহবিজ্ঞানীরা বলেন, শাস্ত্রে যে ভাবে চক্রের বর্ণনা আছে সেভাবে না দেখা গেলেও ঐ সব জায়গায় স্নায়ুগুলি গিয়ে যেন জটপাকান অবস্থায় আছে দেখা যায়। Spinal ganglia-র সঙ্গে চক্রগুলির একটু সাদৃশ্য আছে এইমাত্র। আসল চক্রগুলি যোগীর ধ্যানগম্য স্থূল শরীরের এদের সত্তা নেই। যাইহোক এই কুলকুণ্ডলিনী বা ষাট্‌চক্র সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন বলে এই প্রসঙ্গে একটু বিশদ ব্যাখ্যা করা গেল। তবে ওসব চিন্তা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের চেষ্টা করতে হবে কি করে ভগবানের উপর ভক্তি বাড়ে, কি করে সংসারের আকর্ষণ কমে, আচার শুদ্ধ হয়। ব্যবহারিক জীবনে সত্যনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয় সংযম, সন্তোষ প্রভৃতি সৎ ভাবগুলি কেমন করে উৎকর্ষ সাধন করা যায় সেই দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি ঈশ্বরলাভের পথ

ঠাকুর ঈশান মুখুজ্যের সঙ্গে কথা বলছেন। ঈশান খুব জাপক, পুরশ্চরণ করেন, আনুষ্ঠানিক ধর্মের উপর প্রবল অনুরাগ। সেই প্রসঙ্গে ঠাকুর তাঁকে বলছেন, এই আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণগুলি প্রথম প্রবর্তকের পক্ষে উপযোগী বটে কিন্তু ভগবানের উপর প্রবল আকর্ষণ এলে এসব আর ভালো লাগে না। তখন আর এসব করতেও হয় না। ঐ আনুষ্ঠানিক ধর্মে আবদ্ধ না থেকে ভগবানের উপর যাতে তীব্র অনুরাগ হয় তার চেষ্টা করতে ঠাকুর ঈশানকে অনেকবার বলেছেন। আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ততদিন, যতদিন না তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হয়। 'যখন ফল হয়, তখন ফুল ঝরে যায়।' এইসব বৈধীভক্তিগুলি উপায়, উদ্দেশ্য নয়। ভগবানের উপর যাতে আকর্ষণ অনুরাগ হয় সেজন্য এইগুলি করতে হয়। যতদিন আমরা সংসারে কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত

থাকি ততদিন বুঝতে হবে যে, ভগবানের উপরে আমাদের অনুরাগ আসেনি। তাঁর উপরে অনুরাগ এলে সংসারের কাজকর্ম আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন বলছেন, বৌ সন্তান-সম্ভবা হলে শাশুড়ী কাজকর্ম কমিয়ে দেয় আর সন্তান হলে কোন কাজই থাকে না। সন্তানের লালন পালনই তখন একমাত্র কাজ। ভগবানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা না নিয়ে কেবল জপধ্যান এবং আনুষ্ঠানিক পূজা পুরশ্চরণাদি করা—এগুলি উপযোগী বটে কিন্তু এগুলিতে বদ্ধ থাকলে চলবে না। বলছেন, 'এরকম করে ঢিমে তেতালা বাজালে চল্‌বে না। ···হরিষে লাগি রহরে ভাই ; তেরা বনত বনত বনি যাই'—ধীরে ধীরে তাঁর উপর অনুরাগ আসবে, ঠাকুর বলছেন, এ আমার ভাল লাগে না। এই মুহূর্তেই এমন তীব্র বৈরাগ্য চাই যে সমস্ত তুচ্ছ হয়ে যাবে, সব কাজ ভুল হয়ে যাবে। যেমন গোপীদের কথা বলেছেন, 'ইতররাগবিস্মারণাং নৃণান্'—ভগবান ছাড়া অন্য জিনিসের প্রতি আসক্তি চলে যাবে, ভগবানের প্রতি অনুরাগ হলে এমন হয়।

তারপর ঠাকুর নিজেই প্রশ্ন করছেন, কেন তীব্র বৈরাগ্য হয় না ? তার মানে আছে। কি মানে ? না, বিষয় বাসনা মনে ভরা রয়েছে, কাজেই বৈরাগ্য কি করে হবে ? উপমা দিয়েছেন, জমির আলের গর্ত দিয়ে সব জল চলে যাচ্ছে। সেইরকম সাধন ভজনের যে শক্তি তাও অপব্যয়িত হয়ে যাচ্ছে বিষয় বাসনার ফলে। তাই বলছেন, ওগুলো বন্ধ করতে হবে। আরও উপমা দিলেন, শট্‌কা কলের বাঁশটা মাছ ধরবার জন্য যেমন নোয়ান থাকে তেমনি বিষয় বাসনার জন্য মন নীচের দিকে নুয়ে থাকে, ভগবানের দিকে ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে না। আর দৃষ্টান্ত দিলেন, নিক্তির পাল্লা দুটো সমভার হলে নিক্তি কাঁটা এক হয়। তা না হয়ে বিষয়-বাসনা একটা দিকের পাল্লাকে ভারী করছে কাজেই ভগবান আর মন দুটি এক হচ্ছে না।

ঐ প্রসঙ্গে আরও বলছেন, 'মনটি পড়েছে ছড়িয়ে—কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে কুচবিহার—সেই মনকে কুড়ুতে হবে।' যদি ষোল আনা মনটি ভগবানের দিকে না দিতে পারা যায় তাহলে তাঁর দর্শন, তাঁর অনুভব কেমন করে হবে? 'তুমি যদি ষোল আনার কাপড় চাও, তাহলে কাপড়ওয়ালাকে ষোল আনা তো দিতে হবে।' কীর্তনে আছে গোপীরা যমুনা পার হবেন, কাণ্ডারী শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, পার আমি এমনি করি না, 'এক লক্ষ দেবে কড়ি তবে আমি পার করি।' কীর্তনীয়া আখর যুক্ত করছেন, 'লক্ষ লক্ষ ছেড়ে এক লক্ষ্য হওয়া চাই।' এমনি লক্ষ লক্ষ লক্ষ্যে আমাদের মন ছুটছে তাই ভগবানের দিকে স্থির হচ্ছে না। তিনিই হলেন আমাদের একমাত্র গন্তব্যস্থল, এই বুদ্ধিটি যদি দৃঢ় করতে পারি তাহলে আর অন্যদিকে মন যায় না এবং সেই মনের শক্তি হবে দুর্বার। সুতোর ভিতরে একটুও ফেঁসো থাকলে ছুঁচে গলবে না। ভগবানের দিকে মন নিতে হলে বিষয়-বাসনা একটুও থাকলে চলবে না।

কর্মফল সমর্পণ

(তারপরে বলছেন, 'তা সংসারে আছ, থাকলেই বা কিন্তু কর্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে হবে। নিজে কোন ফল কামনা করতে নাই।') ঈশানের সকাম কর্মে খুব প্রীতি। তাই ঠাকুর বলছেন, সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে হবে। সাধারণ পূজাবিধিতে আছে পূজা শেষ করে কর্মফল ভগবানকে অর্পণ করতে হয়। এটা শুধু মুখে বললে হবে না অন্তরের সঙ্গে বলতে হয়। কিন্তু মানুষের মন এমন ব্যবসাদার যে এভাবে দেওয়ার পরও চিন্তা করে, সব দিয়ে দিলে আমার থাকল কি? তার উত্তর বলছেন, নষ্ট কিছুই হবে না। চাষী যেমন জমিতে ধান বপন করে লক্ষগুণ ধান ফিরে পাবে বলে, তেমনি

সমস্ত কর্মফলও ভগবানকে দিলে তার থেকে লক্ষগুণে ফিরে আসে। মানুষের ব্যবসাদার মন, তাঁকে বলেছে 'কর্মণাম বপনম্'। আসলে তাঁকে কর্মফল অর্পণ করবার জন্য এইভাবে আমাদের প্ররোচিত করা হচ্ছে। কর্মফল তাঁকে অর্পণ করলে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কর্মফলই আমাদের জন্ম জন্মান্তরের বন্ধনের কারণ—'কুর্বতে কর্মভোগায় কর্মকর্তুম চ ভুঞ্জতে'—কর্ম করে ভোগ করবার জন্য, আবার ভোগ করে কর্ম করার জন্যই। অর্থাৎ ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন কর্ম সঞ্চয় করতে থাকেন। পরপর এই পরম্পরা চলে। কর্ম না করে কারো থাকবার উপায় নেই, সর্বদাই মানুষ কর্ম করছে, যে কোন রকমের কর্মই হোক। সুতরাং কর্ম যখন করছে তার ফলও সঞ্চিত হচ্ছে, জমা হচ্ছে। 'না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্মকল্পকোটিশতৈরপি' —ভোগ না করে শতকোটি কল্পেও কর্মের ক্ষয় হয় না। জন্মে জন্মে এই কর্মের বোঝা আমাদের বেড়েই চলেছে, অনন্তকাল ধরে তা বহন করে নিয়ে চলেছি। এর থেকে মুক্তির দুটি উপায় আছে। একটি উপায় হচ্ছে—সমস্ত কর্মের ফল ভগবানকে সমর্পণ করে দেওয়া, তাহলে আর নিজেকে কর্মের বোঝা বইতে হয় না। আর দ্বিতীয় উপায়—নিজেকে অকর্তা মনে করা, তাহলে আর কর্মের ফল ভোগ করতে হবে না। আমি কর্তা নই এই হল জ্ঞান। এই জ্ঞানরূপ অগ্নিই সমস্ত কর্মফলকে ভস্মসাৎ করে দেয়। গীতায় বলছেন,

'যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥' (৪.৩৭)

—প্রজ্বলিত আগুন যেমন সমস্ত কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে দেয়, তেমনি আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্মফলকে ভস্মীভূত করে। সমস্ত কর্মফল বলতে এখানে ব্যাখ্যাকারেরা মানুষের সঞ্চিত এবং আগামী কর্ম

বলছেন। কিন্তু যে কর্ম প্রারব্ধ, যা ফল দিতে আরম্ভ করেছে তা ভোগ করতেই হবে, তাকে জ্ঞানাগ্নিও দহন করতে পারে না। এটা এক মত। বলছেন, পূর্বকর্মফলে একজন অন্ধ হয়ে জন্মাল তারপর যদি তার জ্ঞান হয়, কর্মফল সব ভস্ম হয়ে যায় তাহলে কি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে? তা তো হয় না। কতগুলি কর্ম আছে যার পরিণামে এই দেহটার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি ভোগ করতেই হবে।

আর এক মত হল, যার জ্ঞান হয়েছে সে নিজেকে শুধু অকর্তা বলে জানে না, অভোক্তা বলেও জানে। সুতরাং জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তার কর্তৃত্ববোধ, ভোক্তৃত্ববোধ চলে গিয়েছে। গীতায় এ কথা খুব ভাল করে বলেছেন—'গুণাগুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥' (৩,২৮) —গুণসমূহ গুণেতে অবস্থিত থাকে। গুণের ফলে হল ইন্দ্রিয়, সত্ত্ব, রজঃ, তম এই তিন গুণ। তিনগুণের পরিণাম হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ইন্দ্রিয় যে বিষয়ভোগ করছে, গুণের সঙ্গে গুণের যোগ হচ্ছে। আত্মা এই তিন গুণের অতীত, সুতরাং আত্মার সঙ্গে এই বিষয়ভোগের কোন সম্বন্ধ নেই। তাহলে আমরা যে দেখছি জ্ঞানী কর্ম করছে ও ভোগ করছে। তার উত্তর হচ্ছে এটা আরোপিত ভোগ। আমরা আরোপ করছি যে জ্ঞানী ভোগ করছে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন— 'দৈহতে গুঞ্জাপুঞ্জং অন্যারোপিত বহ্নিনা'—পঞ্চদশীতে আছে বনে কুঁচ-ফল পেকেছে, গুচ্ছ গুচ্ছ লাল লাল ফল এত ধরেছে যে, দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে আগুন লেগেছে কিন্তু ঐ আগুনে কি ফলগুলি বা গাছ পুড়ে যায়? পোড়ে না। কারণ ওটা সত্যি সত্যি আগুন নয়, আরোপিত আগুন। সে আরোপিত আগুনে যেমন গাছ পোড়ে না তেমনি অন্যের আরোপিত কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব জ্ঞানীকে স্পর্শ করে না। তিনি এ সবেতে লিপ্ত নন, তা হলে প্রারব্ধ কোথায় যাবে? তার উত্তরে বলছেন—

'প্রারব্ধং সিধ্যতি তদা যদা দেহাত্মনাস্থিতিঃ।

দেহাত্মভাবো নৈবেষ্টঃ প্রারব্ধং ত্যজতামতঃ।' বিবেকচূড়ামণি ঃ ৪৬০
প্রারব্ধ তখনই সিদ্ধ হয় যখন দেহে আত্মভ্রম করে। দেহটা কর্মের অধিষ্ঠান, তাকে আত্মার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে আমরা মনে করছি আত্মা কর্ম করছে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন সুতরাং জ্ঞানী কোনো কর্ম করেন না ভোগও করেন না। ভগবান অর্জুনকে বলছেন—

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥' (৯.২৭)

—তুমি যা কিছু কর সব আমাকে অর্পণ কর। যা কিছু কর বলতে কেবল পূজা পাঠ নয়, যৎ করোষি—যা কিছু কর, তারপরে তা বিশ্লেষণ করে বলছেন, যদ্ অশ্নাষি—যা কিছু খাও, যৎ জুহোষি—যে হোম কর, যে দান ও তপশ্চর্যা কর অর্থাৎ লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সমস্ত কর্মের ফল তুমি আমাকে অর্পণ কর। সমস্ত ফল যদি ভগবানকে অর্পণ করে দেওয়া যায় তাহলে আমাদের আর কর্মফল বইবার দায়িত্ব থাকে না, ভোগও করতে হয় না।

ঠাকুরও এই কথাটি ঈশানকে বলছেন, 'তা সংসারে আছ, থাকলেই বা কিন্তু কর্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে হবে। নিজে কোন ফল কামনা করতে নাই।' আবার একটু সাবধান করে বলছেন, 'তবে একটা কথা আছে। ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়। ভক্তি কামনা, ভক্তি প্রার্থনা—করতে পার।' তারপরে ভক্তি প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, ম্যাদাটে ভক্তি নয়, 'ভক্তির তমঃ আনবে। মার কাছে জোর কর। মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে, তখন শান্ত হব ক্ষান্ত হয়ে আমায় যখন করবি কোলে'—এইরকম জোর করে আবদার করতে হবে। শুধু মিউ মিউ করলে হবে না। 'ত্রৈলোক্য

বলেছিল, আমি যেকালে ওদের ঘরে জন্মেছি তখন আমার হিস্যে আছে।' রাসমণির দৌহিত্র সে, সম্পত্তির উপরে তার দাবী আছে। এমনি জোর করে নিতে হবে। ঠাকুর বলছেন, 'তোমার যে আপনার মা, গো! একি পাতান মা, এ কি ধম মা! এতে জোর চলবে না ত কিসে জোর চলবে?···যার যাতে সত্তা থাকে তার তাতে টানও থাকে। মার সত্তা আমার ভিতরে আছে বলে তাই তো মার দিকে টান হয়।' অনন্ত শক্তিশালিনী মা, তাঁর শক্তি আমার ভিতরে রয়েছে, এ আমারই সম্পত্তি এই কথা ভাবলে মনে কত জোর আসে।

তারপর ঈশানকে বিশেষ করে বলছেন, 'আর এ সময় তো তোমায় বিষয়কর্ম করতে হয় না। এখন দিনকতক তাঁর চিন্তা কর। দেখ্‌লে তো সংসারে কিছু নাই।' সংসারে কোন সার নেই। এখন ওতে নিবিষ্ট না থেকে ভগবানে পরিপূর্ণভাবে মন দেবার চেষ্টা কর, এই বলছেন।

তারপরে আবার বলছেন. 'তুমি সালিসী, মোড়লী ওসব কি কচ্ছো? লোকের ঝগড়া বিবাদ মিটাও—তোমাকে সালিসী ধরে, শুনতে পাই। ও তো অনেকদিন ক'রে আস্‌ছো। যারা করবে তারা করুক। তুমি এখন তাঁর পাদপদ্মে বেশী ক'রে মন দেও।' নানানভাবে ঠাকুর ঈশানকে বোঝাচ্ছেন। এক বিধবা সম্বন্ধে বলছেন, সে ভাই-এর সংসারে থাকে আর বলে আমার ভাইপোটিকে আমি না দেখলে হয় না। ঠাকুর বলছেন, মর মাগী, তোর কি এখনও সময় হয়নি ভগবানের দিকে সমস্ত মনটা দেবার? ঠাকুর বিরক্ত। ভগবান তার কোনোরকম দায়দায়িত্ব রাখেননি, এই সুযোগ নিয়ে কোথায় সমস্ত মনটা ভগবানে দেবে তা নয়, নানান রকমের ঝামেলা জোটাচ্ছে।

এরপর বলছেন, 'তা শম্ভুও বলেছিল। বলে হাসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারি করবো। লোকটা ভক্ত ছিল। তাই আমি বললুম,

ভগবানের সাক্ষাৎকার হ'লে কি হাসপাতাল ডিস্‌পেনসারি চাইবে!' এ কথাটি বিশেষ চিন্তার বিষয়। কারণ শুভকর্ম, লোকোপকার হয় এমন কর্ম তো স্বামীজী করতে বলেছেন। ভাল লোকেরা তো এরকম কর্ম করাকে ভাল বলেন। তবে ঠাকুর কেন নিষেধ করছেন? কারণ ঠাকুর আর এক দৃষ্টিতে দেখে বলছেন, যে কর্তৃত্ববুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হয়ে লোকের কল্যাণ করব বলে ভাবছ সেই কর্তৃত্ব ত্যাগ কর। ডাক্তারখানা, হাসপাতাল করবে কি না সে প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে তোমার মনটাকে ভগবানে দেবে কি না। ভগবানের কাছে ডিসপেনসারী, হাসপাতাল চাইবে না জ্ঞান ভক্তি চাইবে? জীবনের মুখ্য জিনিস না চেয়ে গৌণ জিনিস নিয়ে বসে থাকবে? লোকের কল্যাণ করতেও অনেক বলেছেন, স্বামীজীকে তো করতে বাধ্য করেছেন কিন্তু সে অন্যভাবে। সর্বজীবের ভিতরে তাঁকে দেখে তাঁর সেবা কর। তাহলে আর সেগুলি কর্ম হবে না এবং তা-ও নিষ্কাম ভাবে করতে বলেছেন। যা কিছু কর্ম তা তখন পূজা হয়ে উঠবে। 'যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্'—যা কিছু করি, সব তোমারই পূজা।

এবার ঠাকুর কেশব সেনের কথা বললেন, 'কেশব সেন বললে, ঈশ্বর দর্শন কেন হয় না। তা বললুম যে, লোকমান্য, বিদ্যা এসব নিয়ে তুমি আছ কি না, তাই হয় না।' বিষয়াসক্ত মনের গতি বিষয়ের দিকে থাকে ভগবানের দিকে যায় না। ঈশান ঠাকুরের এই উপদেশে অভিভূত হয়ে বলছেন, 'আমি যে ইচ্ছা ক'রে এসব করি তা নয়।' ঠাকুর বলছেন, ('তা জানি। সে মায়েরি খেলা!' মা ইচ্ছে করলে কাকেও দিয়ে কর্ম করান আবার ইচ্ছে করলে সমস্ত কর্মবন্ধন কেটে দিতে, মুক্তি দিতেও পারেন। মা করাচ্ছেন, এইরকমই যদি মনে হয় তাহলে নিশ্চিন্ত। 'ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'—হে হৃষিকেশ, তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে যেমন

করাও তেমনি করি। তা যদি হয় তাহলে তার কর্তৃত্বও নেই, ভোক্তৃত্বও নেই।

'জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হিংসা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥' (চণ্ডী ১.৫৫)

—মহামায়া জ্ঞানীদের মনকেও বলপূর্বক আকর্ষণ করেন, মোহগ্রস্ত করেন। কিন্তু কেমন মা তিনি যে সন্তানদের মোহগ্রস্ত করছেন? ঠাকুর বলছেন এই তো তাঁর খেলা। তিনি কাকেও মুক্ত করছেন, কাকেও বদ্ধ করছেন।

'সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥' (চণ্ডী ১.৫৭-৫৮)

—তিনিই সেই পরমা বিদ্যা যা সংসারের মুক্তির কারণ। আবার তিনিই সেই অবিদ্যা যিনি বন্ধনেরও হেতু, তিনি সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর হাতের যন্ত্ররূপে দেখতে পারলে আর কোন চিন্তা নেই। তখন আমাদের আর ভুগতে হয় না। অনেকে বলেন, 'তিনি যেমন করাচ্ছেন তেমনি করি' প্রকৃতই এই বোধ আছে কি? যদি কারো থাকে তাহলে সে দুঃখেও বিহ্বল হবে না, সুখেও আত্মহারা হবে না। সুখে দুঃখে অচঞ্চল থাকবে কারণ সে তখন জেনেছে সুখ দুঃখ তাকে স্পর্শ করছে না, যিনি করছেন তিনিই ভোগ করবেন।

সবই তাঁর খেলা

তারপরে বলছেন, সবই তাঁর খেলা। তিনিই বদ্ধ করছেন, তিনিই মুক্ত করছেন। চোর চোর খেলায় তিনি বুড়ি হয়ে বসে আছেন। 'বুড়ির ইচ্ছা যে খেলাটা চলে। সবাই যদি বুড়িকে ছুঁয়ে ফেলে তা হ'লে খেলা আর চলে না।' যখন বুড়ি দেখে যে একজন কিছুতেই আর তাঁকে ছুঁতে পারছে না তখন বুড়ির দয়া হয়, তার দিকে হাতটা বাড়িয়ে

দেয়। কেন দেয় তার যুক্তি কিছু নেই। কেন করছেন তিনি তা তিনিই জানেন। 'সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।' আমরা যতক্ষণ না তাঁর উপরে পরিপূর্ণ নির্ভর করতে পারছি ততক্ষণ আমাদের এই খেলাতে আটকে থাকতে হচ্ছে।

এরপর দোকানদারের কৌশলের কথায় বলছেন, দোকানে বড় বড় ঠেকে চাল ডাল থাকে, 'কিন্তু পাছে ইঁদুরে খায়, তাই দোকানদার কুলোয় করে অল্প খই মুড়কি রেখে দেয়। মিষ্টি লাগে আর সোঁদা গন্ধ—তাই যত ইঁদুর সেই কুলোতে গিয়ে পড়ে, বড় বড় ঠেকের সন্ধান পায় না।' ঠিক সেইরকম সংসারে ছোটখাট ক্ষণস্থায়ী আনন্দে আমরা এমন মেতে থাকি যে অসীম আনন্দের খবর পাই না, সেদিকে দৃষ্টি যায় না। সে আনন্দলাভ করতে হলে মনকে ছোট ছোট আনন্দ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে। বিষয় ভোগও করব আবার ভগবৎ আনন্দও পাব—এ দুটো একসঙ্গে হয় না। একটাকে ছাড়তে হবে। ছাড়তে হবে মানে সংসার ত্যাগ করতে হবে না, নির্লিপ্ত হতে হবে। পাঁকাল মাছের মতো থাকতে হবে। পাঁকাল মাছ পাঁকে আছে কিন্তু গায়ে পাঁক লাগে না। সাধনা করলে, চেষ্টা করলে নির্লিপ্ততা আসবে তখন আর এই সংসারের সুখদুঃখ স্পর্শ করতে পারবে না। আমরা তো তা চাই না, আমরা চাই দুঃখকে এড়িয়ে কেবল সুখকে পেতে। যখন তা না পাই তখন বলি, হে ভগবান, তুমি এ কি করলে? যেন ভগবান আমার হুকুম তামিল করবার জন্য বসে আছেন। উপনিষদ বলছেন—

'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥' (কঠ. ২.১.১)

ভগবান আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সব বহির্মুখ করে সৃষ্টি করেছেন। তাই ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যবস্তুকে দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। বিরল কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনকে সংযত করে তাকে বিপরীত দিকে অর্থাৎ

অন্তরের দিকে পরিচালিত করেন। তখন তিনি অন্তরাত্মাকে উপলব্ধি করেন। কেন করেন? না অমৃতত্ব আকাঙ্ক্ষা করে। তিনি জানেন বিষয় আকাঙ্ক্ষা হল মৃত্যু। আর বিষয় বৈরাগ্য, আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা এই হল মুক্তি, এই হল অমরত্ব। এছাড়া অন্য পথ নেই। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন

ঈশানকে ঠাকুর আরও বলছেন, রাম নারদকে বর চাইতে বললেন। নারদ বললেন, 'এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই'। রাম আরও কিছু বর দিতে চাইলে নারদ বললেন, 'রাম! আর কিছু আমি চাই না।' এই বলে ঠাকুর বললেন, তিনিও শুদ্ধা ভক্তি ছাড়া আর কিছু চাননি। তারপরে বললেন, অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে, 'লক্ষ্মণ রামকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাম! তুমি কতভাবে কতরূপে থাক, কিরূপে তোমায় চিন্তে পারবো? রাম বললেন, যেখানে উর্জ্জিতা (উর্জিতা) ভক্তি, সেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি।' উর্জিতা ভক্তিতে ভক্ত হাসে কাঁদে নাচে গায়! যদি কারো এরকম হয় নিশ্চয়ই সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং বর্তমান। 'চৈতন্যদেবের ঐরূপ হয়েছিল।' মাস্টারমশায় ভাবছেন, শুধু চৈতন্যদেবের নয়, ঠাকুরেরও তো এইরকম অবস্থা। তবে কি এইখানে স্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষাৎ বর্তমান?

ঈশ্বরবুদ্ধিতে পরোপকার ও কর্তৃত্ববুদ্ধি ত্যাগ

ঈশানকে এবার নিবৃত্তিমার্গের কথা বলছেন, 'তুমি খোসামুদের কথায় ভুলো না।' ঈশান বিত্তশালী, তার চারপাশে চাটুকারের দল আছে, তাই ঠাকুর সাবধান করে দিচ্ছেন। তারপরে বলছেন, তুমি সালিসী, মোড়লী লোকহিতকর কাজ এসব তো অনেক করলে। এখন

সব ছেড়ে মায়ের পাদপদ্মে যাতে ভক্তি হয় তাই কর। ভক্তি গভীর হলে অন্য কাজকর্মে আর মন যায় না। এখানে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ঠাকুর যেন বলছেন যে, লোকহিতকর কাজগুলি তত প্রয়োজনীয় নয় কিন্তু আসল ভাব হচ্ছে লোকহিতর কাজটি কি উদ্দেশ্য নিয়ে করা হচ্ছে তার উপরে এর প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করছে। যদি লোকমান্য হবার ইচ্ছা থাকে তাহলে এগুলি মানুষের বন্ধনের কারণ হয়। ঈশানের সেরকম ইচ্ছা ছিল। তাই ঈশানকে বলছেন, সব ছেড়ে ভগবানকে ডাক। যিনি সমগ্র মন ভগবানে অর্পণ করেছেন তিনি আর কি কম করবেন? ঠাকুর বলছেন, জেল থেকে যে কেরানী ছাড়া পেয়েছে সে কি ধেই ধেই করে নাচবে না কেরানীগিরিই করবে? অর্থাৎ সাধন করতে করতে কারো ভগবৎ সাক্ষাৎকার হবার পর সে কি করবে? সে যা করছিল তাই-ই করবে। সমস্ত মনপ্রাণ ভগবানে অর্পণ করে থাকবে। গীতায় আছে, এমনি ভগবানে মনপ্রাণ সমর্পণ করা জ্ঞানী কি সব সময় চোখ বুঁজে বসে থাকেন? তা নয়। তিনি তখন সর্বভূতের হিতে রত। স্বভাবতই তিনি এই কর্ম করেন, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। উদ্দেশ্য নিয়ে করলে তাতে অভিমান অহংকার থাকে। ঠাকুর বলছেন, এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর তুমি কতটুকু যে তুমি জগতের উপকার করবে? তবে এক তিনিই সর্বভূতে রয়েছেন এই বুদ্ধিতে যদি কেউ জগতের সেবা করে তাহলে দোষ নেই। দোষ হয় তখনই যখন আমরা আমাদের ভিতরে কর্তৃত্ববুদ্ধি রেখে অপরের থেকে আমাদের প্রাধান্য চিন্তা করে আত্মাভিমানে স্ফীত হয়ে পরোপকার করি। তাতে অধ্যাত্মজীবনে অবনতি আসে। কিন্তু যেখানে 'জগতের সেবা, তাঁরই সেবা' এই বুদ্ধিতে কাজ হচ্ছে সেখানে কিন্তু এইরকম কোনো আশঙ্কা নেই। সেখানে কর্তৃত্ববোধ থাকে না এবং ফলে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় না।

গীতায় বলছেন, ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ (৩।৫)

কেউ কখনও একমুহূর্তও কর্ম না করে থাকতে পারে না। কর্ম করা ছাড়া মানুষের উপায় নেই। কিন্তু কেন সে করবে? কোন একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য করবে। কি করবে? না, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যা সহায়ক তাই করবে। তারপরে হল করণ অর্থাৎ কি হবে—কি প্রণালীতে করবে?' 'কিম্ কুর্যাৎ, কেন কুর্যাৎ, কথং কুর্যাৎ'—এই হল বেদের কর্মকাণ্ডের কথা। এখন ভগবান বলছেন, মানুষের কামনা পরবশ হয়ে এই যে কর্ম করা এর যেমন শুভফল তেমনি অশুভ ফলও আছে। সুতরাং শুভফলটি নিলে অশুভ ফলটিও নিতে হয়। কিন্তু কেউ যদি নিষ্কাম হয় তাহলে শুভফলের দিকে তার যেমন আকাঙ্ক্ষা থাকে না তেমনি অশুভফলও তাকে স্পর্শ করে না। গীতায় বললেন, এই নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, সুতরাং চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করবে—এই হল এক উপায়। দ্বিতীয় কথা হল যার কোন বাসনা নেই সে কর্মে প্রবৃত্ত হবে কেন? তার উত্তর ঠাকুর ঐ যে বলেছেন, কেরানী জেল থেকে মুক্ত হলে কি ধেই ধেই করে নাচবে? অর্থাৎ বাসনামুক্ত হলে সে ব্যক্তি কি জড় হয়ে যাবে? না, তার মৃত্যু হবে? তা নয়। বাসনামুক্ত হলেও সে কর্ম করে যাবে, তফাৎ হল এখন বাসনা প্রেরিত হয়ে নয় স্বভাববশত করবে। তার স্বভাবই হচ্ছে জগতের কল্যাণ করা, যেমন বলেছেন, 'সর্বভূত হিতে রতাঃ'—এটি তার অনুষ্ঠান বিশেষ নয়, স্ব-স্বভাব। শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার মতো স্বভাবতই হয়ে যাচ্ছে। অপরের পক্ষে যেগুলি বাসনাপ্রেরিত কর্ম, জ্ঞানীর পক্ষে সেটি স্বাভাবিক কর্ম। জগতের কল্যাণ তাঁর দ্বারা স্বভাবতই হয়, তিনি যে ইচ্ছে করে জগতের কল্যাণ করেন তা নয়। গীতায় যেমন আছে—

'সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥' (৩।২৫)

—বলছেন, অজ্ঞানিগণ বাসনাপ্রেরিত হয়ে যেমন কর্ম করেন,

জ্ঞানিগণ অনাসক্ত হয়ে সেইরকম কর্ম করেন। এখানে আরও একটু বলা আছে লোকসংগ্রহ—কর্মদ্বারা লোকের কল্যাণ হবে এই বুদ্ধিতে তিনি কর্ম করেন। আর এই বুদ্ধিও তাঁর চেষ্টা করে আনতে হয় না। তিনি যা করেন তাতেই লোকের কল্যাণ হয়।

এখন, এই জগৎ কল্যাণ করা, এটির একটি বিশেষ সাধন রূপেও প্রয়োগ হতে পারে। জগৎ কল্যাণ কর, কাজ্ করতে করতে বাসনা ক্ষয় হবে, কল্যাণ হবে। এটিও একটি কথা। এ পথের বিধান শাস্ত্রে আছে এবং যুক্তিযুক্তও বটে। তবে একটা কথা। মানুষকে যখন এরও পারে যেতে হবে তখন 'চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করতে হবে' এ ভাবও থাকবে না। ঠাকুর ঈশানকে তাঁর জনহিতকর কাজের পারে যেতে বলছেন। বলছেন, সব ছেড়ে ভগবানের চিন্তা কর। শাস্ত্রে বহু প্রকারে এই কর্মত্যাগের উল্লেখ আছে। ব্যাখ্যাকারেরা পরিষ্কার করে বলেছেন যে, সকাম কর্ম ত্যাগ করতে হবে, একেবারে কর্মত্যাগ সম্ভব নয়. শাস্ত্র কখনও তা বলেন না। কর্মের অত বড় বিরোধী শঙ্কর গীতার ব্যাখ্যায় বলেছেন, কর্মমাত্রেই যে হেয় তা নয়। যেখানে কর্ম বাসনাপ্রেরিত হয়ে হচ্ছে না শঙ্করের ভাষায় তা কর্ম নয়। যেমন একটি উদাহরণ, একজন যজ্ঞ করছে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। করতে করতে তার মনে বৈরাগ্য এলে কামনা চলে গেল। কিন্তু তবু সে যজ্ঞ করা ছেড়ে দিল না সম্পূর্ণ করল। সেটা আর কর্ম হল না, 'ন তৎ কর্ম'। শঙ্করের মতে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত যে কর্ম তা কর্মই নয়। তাঁর কর্মের এই সংজ্ঞাটি মনে রাখতে হবে। অনেকসময় শঙ্করের দোহাই দিয়ে আমরা নিষ্কর্মা হতে চাই, পরিহাস করে বলি নৈষ্কর্মসিদ্ধি। তার মানে এই নয় যে আমি সমস্ত কর্ম ছেড়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব। একবার আমাদের একজন সাধু স্বামী তুরীয়ানন্দকে জানালেন যে, কর্ম করতে গেলে অভিমান এসে যায় সুতরাং আমি ভেবেছি আর কর্ম করব না। তার উত্তরে তিনি

লিখলেন, আর তুমি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেই তোমার অভিমান ত্যাগ হয়ে যাবে!

'ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে' (গী. ৩।৪)—কর্মানুষ্ঠান না করে কেউ কর্মবন্ধন বা দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। শঙ্কর বলছেন, চুপ করে বসে থাকা সে-ও কর্ম। শরীরটা চুপ করে বসে আছে আর ভাবছে আমি চুপ করে বসে আছি। এই শরীরের উপর আত্মার অভিন্নতা আরোপও একটি কর্ম এবং তাও বন্ধনের কারণ। সুতরাং নৈষ্কর্ম মানে কর্ম থেকে বিরত হওয়া নয় নৈষ্কর্ম্য মানে এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে আমি কর্তা নই। 'নাহং কিঞ্চিৎ করোমি'—আমি কিছুই করছি না। এই বুদ্ধি থাকলে সহস্র কর্মের মধ্যে থেকেও সে নিষ্কর্ম। গীতার এইটিই উপদেশ, বিশেষ করে মনে রাখতে হবে এবং শঙ্করও পরিষ্কার বলেছেন, নৈষ্কর্ম্যের অর্থ এই।

কেউ কেউ অনেক সময় স্বামীজীর সঙ্গে ঠাকুরের এইসব মতের বিরোধ কল্পনা করেন আর বলেন, ঠাকুর কর্মত্যাগ করতে বলেছেন কিন্তু স্বামীজী বলেছেন, খুব কর্ম কর। এক্ষেত্রে তাঁদের কথার প্রকৃত অর্থ না বুঝে আমরা বিরোধী বলে মনে করি। ঠাকুর শুভাশুভ সব কর্মই কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হয়ে করতে বলেছেন। আর স্বামীজী নিষ্কাম কর্ম করতে বলেছেন। স্বামীজী বহু জায়গায় গীতার কথা বলেছেন, 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' (২।৫০)—কর্মযোগ মানে কর্ম অনুষ্ঠান বিষয়ে কুশলতা, নৈপুণ্য। অন্যত্র যে কর্ম বন্ধনের কারণ হয়, কৌশল পূর্বক করলে সেই কর্মই মুক্তির কারণ হবে। গীতায় এই কথা পরিষ্কার করে বলেছেন। আসল কর্মত্যাগ হবে যখন নিজেকে আমি অকর্তা বলে জানব। ঠাকুরও বার বার সেই কথা বলেছেন, তুমি অকর্তা এই বুদ্ধিটি রাখ। আমি নিজেকে তাঁর থেকে ভিন্ন রূপে দেখে নিজেকে কর্তা

মনে করে ভাবছি, এই কর্ম করে এই ফল লাভ করব বা আমি জগতের কল্যাণ করব। এই পর্যায়ের সব কর্মই বন্ধনের কারণ। নিজেকে অকর্তা বলে বোধ করলে অথবা যা কিছু করছি তার দ্বারা তাঁরই পূজা করছি এই বুদ্ধিতে কর্ম করলে কোন দোষ হবে না। ঠাকুর বলেছেন, কিভাবে কর্ম করব এই কথা ভাবতে হবে, কর্ম করব কি না একথা ভাবতে হবে না। অর্জুনকে ভগবান বলছেন,

'যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ (২।৫২)

—যখন তোমার বুদ্ধি নির্মোহ হবে তখনই শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয় তোমার কাছে নিষ্ফল নিরর্থক মনে হবে। এখন নিজেকে অকর্তা বলে বোধ করতে না পেরে তুমি মনে করছ আমি কর্ম করব কিংবা করব না। এই সিদ্ধান্তে আসবার তুমি কে? এই কর্তৃত্ববুদ্ধিকে বিসর্জন না দিলে কেউ ভক্ত বা জ্ঞানী হতে পারে না। মনে রাখতে হবে, কর্ম অথবা জ্ঞান যে পথেই হোক আমরা অকর্তা এই বুদ্ধি আমাদের আসা দরকার। তা এলে আমরা কর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে পারি। গীতায় যেমন বলেছেন,

'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥' (৩।১৭)

—যিনি আত্মাতেই আনন্দিত, যিনি আত্মাতেই তৃপ্ত এবং কেবল আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁর কোনো কর্তব্য নেই। তিনি অর্জুনকে আরও বলছেন,

'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥' (৩।২২)

—এই ত্রিলোকের মধ্যে আমার কোন কর্তব্য নেই এবং আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও কিছুই নেই তবু আমি সর্বদা কর্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছি।

আমার না পাওয়া কিছু নেই বা এমন কিছু নেই যা আমাকে পেতে হবে তবু আমি কর্ম করি জগতের কল্যাণ করবার জন্য। তা-ও আমাকে চেষ্টা করে করতে হয় না স্বভাবতই হয়। জ্ঞানীর এবং ভক্তেরও এই স্বভাববশতঃ কর্ম হয়ে যায় এবং তার দ্বারা জগতের কল্যাণ হয় কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে করতে গেলে ঐ কর্মের চক্রে, কর্মের বন্ধনে পড়ে যেতে হবে। ঠাকুর বলছেন, শুভকর্ম, বৈধীভক্তি বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম ঈশ্বরের পথে যেতে একসময় আমাদের খানিকটা সাহায্য করে বটে কিন্তু এরও পারে যেতে হবে। ছাদে যেতে গেলে ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙতে হবে। সিঁড়িরই একটা ধাপে আটকে থাকলে ছাদে পৌঁছান হবে না। তেমনি কর্ম শুভ হলেও তাতে আটকে থাকলে কর্মত্যাগে পৌঁছান যাবে না। এইজন্য প্রথমে শুভকর্মের দ্বারা অশুভ কর্মকে ত্যাগ করতে হবে। তারপরে বলছেন, তাকেও ত্যাগ কর। অর্থাৎ যে অভিমান দিয়ে আমরা শুভকর্ম করি সেই অভিমানকে ত্যাগ করতে বলছেন। কেবল তখনই বলা যায় যে, 'যেমন করাও তেমন করি, যেমন বলাও তেমন বলি।'

তারপরে আর একটি কথা বললেন, 'মানুষ গুরু হতে পারে না ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে।' এইটি ঈশানকে লক্ষ্য করে বলছেন। মনে করেছ অপরকে শেখাবে, লোকশিক্ষা দেবে। কিন্তু যখন ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে এই বুদ্ধি আসে তখন 'আমি শিক্ষা দেব' এই কর্তৃত্ব-বোধ থাকে না। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন যে, দেখছি তিনিই সব হয়েছেন, তাই কাকে বলব, কি বলব।

তারপর বলছেন, 'মহাপাতক—অনেকদিনের পাতক, অনেক দিনের অজ্ঞান, তাঁর কৃপা হলে একক্ষণে পালিয়ে যায়।' তাঁর কৃপা হলে মানুষ এক মুহূর্তেই শুদ্ধ, পবিত্র হয়ে যায়। 'হাজার বছরের অন্ধকার ঘরের ভিতর যদি হঠাৎ আলো আসে, তা হলে সেই হাজার

বছরের অন্ধকার কি একটু একটু ক'রে যায়, না একক্ষণে যায়? অবশ্য আলো দেখলেই সমস্ত অন্ধকার পালিয়ে যায়।' একথারও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ নিজেকে অকর্তা বলে বুঝতে পারলে তার জ্ঞান হয়। তখন তার যে অজ্ঞান ছিল সে কি একটু একটু করে দূর হয়? তা নয়। এক মুহূর্তে সে বুঝতে পারে যে সে সম্পূর্ণ অকর্তা। 'মানুষ কি ক'রবে। মানুষ অনেক কথা বলে দিতে পারে, কিন্তু শেষে সব ঈশ্বরের হাত। উকিল বলে, আমি যা বলবার সব বলেছি, এখন হাকিমের হাত।'

এই আর একটি কথা। অনেক সময় শুভ কর্মের প্রয়াস সফল সার্থক হয় না। তখন মানুষ বলে, এত করলাম কিছুই হল না, মনে একটা অবসাদ আসে। (কিন্তু যে মানুষ সব ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে বলে করে তার আর অবসাদের কারণ থাকে না। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে মানুষ জগৎকে বদলে দিতে পারবে না। কত চেষ্টা কতবার হয়েছে, সার্থক হয়েছে কি? জগৎনিয়ন্তার নিয়ন্ত্রণে সমস্ত জগৎ চলছে আমরা তা বুঝতে না পেরে অভিমানবশতঃ ভাবি আমরা এই করব, ঐ করব। ঠাকুর উপমা দিয়েছেন, পুতুল নাচের পুতুলকে দেখে সকলে মনে করছে পুতুলটা নাচছে আসলে তো পিছনে একজন দড়ি ধরে তাকে নাচাচ্ছে। আসল কর্তা যিনি তিনিই করাচ্ছেন আমরা মনে করছি আমরাই করছি। এই কর্তৃত্ববোধ থেকেই মনে অশান্তি আসে। কাজ করে আশানুরূপ ফল না পেলে মনের ভিতরে একটা দুঃখ আসে)। এজন্যই গীতায় আকাঙ্ক্ষারহিত হয়ে কর্ম করতে বলেছেন। সেটাই কর্মযোগ। আমি অকর্তা, তাঁর ইচ্ছায় সব হচ্ছে এই বুদ্ধিটি আনতে হবে—এখানে ঠাকুরের সার কথা এই। উপনিষদে আছে যে, দেবতারা একবার অসুরদের উপর জয়লাভ করে গর্বিত হয়ে ভাবলেন যে, 'অস্মাকম্ এব অয়ং অস্মাকম্ এব অয়ং মহিমা বিজয়ঃ'—এ আমাদের বিজয়, আমাদের মহিমা, গৌরব। ব্রহ্ম তাদের বুঝিয়ে দিলেন ব্রহ্ম যিনি এ তাঁরই

বিজয়। আমরাও সফল হলে ভাবি এ সাফল্য আমাদের। আবার ব্যর্থ হলে অবসন্ন মনে ভাবি হেরে গেলাম কিন্তু তিনিই করছেন এই বুদ্ধি রাখলে সফল হলেও অভিভূত হব না, নিষ্ফল হলেও বিচলিত হব না। গীতায় নানাভাবে এ তত্ত্বটি বোঝান হয়েছে।

কর্ম ও ভক্তি

এরপর ঠাকুর মাস্টারমশায়ের সঙ্গে ধর্মাধর্ম প্রসঙ্গে কথা বলছেন। রামপ্রসাদ বলছেন, 'আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি!' এখন অধর্ম ছাড়তে হবে বোঝা যায় কিন্তু ধর্মকেও ছাড়তে বলছেন কি উদ্দেশ্যে? সেই কথাটি পরিষ্কার করবার জন্য ঠাকুর বলছেন, 'এখানে ধর্ম মানে বৈধী ধর্ম। যেমন দান করতে হবে, শ্রাদ্ধ, কাঙালী ভোজন এইসব। এই ধর্মকেই বলে কর্মকাণ্ড। এ পথ বড় কঠিন। নিষ্কাম কর্ম করা বড় কঠিন! তাই ভক্তিপথ আশ্রয় ক'রতে বলেছে।' মীমাংসা শাস্ত্রে ধর্ম মানে হল বেদবিহিত কর্ম, কিন্তু ধর্মের ভিতরে আবার দুটি ভাগ আছে তার একটি হল বৈধী কর্ম। আর একরকম ধর্ম আছে ব্যাপক অর্থে যা মানুষকে ক্রমশঃ ধর্মাধর্মের পারে নিয়ে যায়। কিন্তু বেদবিহিত বৈধকর্মকে ছাড়তে হবে কেন? তার উত্তর মীমাংসা শাস্ত্রে বলে যে, বেদে কর্ম করতে বলছে অধিকারী দেখে। অধিকারী কাকে বলব? না, বিশেষ কোন কর্মের দ্বারা যে ফল লাভ হয় সেই ফল যে আকাঙ্ক্ষা করে সেই অধিকারী। যেমন স্বর্গ যে আকাঙ্ক্ষা করে তার জন্য সোমযাগ হ'ল বিহিত। তাঁদের মতে বেদনির্দিষ্ট সব কর্মই সকাম। এমন কি সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম, যা করলে কি ফললাভ হবে বেদে তা স্পষ্ট করে বলা নেই মীমাংসকদের মতে তাও একেবারে নিষ্কাম নয়। কেন নয়? যদি ওগুলি না কর তাহলে পাপ হবে। সুতরাং পাপকে পরিহার করবার যে ইচ্ছা সেটাও একটা কামনার মধ্যে পড়ে। তাঁরা

বলেন, কর্মের দ্বারা যদি কোন ফল না হয় তাহলে কর্ম করবার প্রবৃত্তি আসবে কেন? আমরা যাকে **motiveless action** বলি কোনো **motive** বা উদ্দেশ্য নেই অথচ কর্ম হচ্ছে এ যুক্তি বিরোধী কথা। উদ্দেশ্য ছাড়া কর্ম হয় না। অতএব মীমাংসকদের সিদ্ধান্ত নিষ্কাম কর্ম হয় না, প্রত্যেক কর্মই সকাম।

ঠাকুর বলছেন, সকাম কর্ম বড় কঠিন। কারণ কর্ম করতে গেলেই ভাল ফলের সঙ্গে সঙ্গে মন্দ ফলও প্রচুর এসে যায় সেগুলি কি হবে? মীমাংসকেরা তখন প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিচ্ছেন। যেমন বলা আছে—'পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং তৎ প্রসাদাৎ মহেশ্বরী'—যে কর্ম অসাঙ্গপূর্ণ হল না ভগবানের নাম করে তা পূর্ণ হোক। কিন্তু যাঁরা কর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তাঁরা বলেন, যে এরকম বিধানের দ্বারা কর্মের ত্রুটিগুলিকে খণ্ডন করা যায় না। অবশ্য মীমাংসকরা খুব সাবধান করে দিয়েছেন যে কর্ম করতে গেলে তার বাধাবিঘ্ন যেগুলি আছে সেগুলিকে পরিহার করে করতে হবে। যেমন প্রত্যেকটি মন্ত্র আবৃত্তি করবার সময় খুব সাবধানে যেখানে উচ্চারণ করা প্রয়োজন ঠিক তেমনি ভাবে, ব্যাকরণ সম্মত ভাবে আবৃত্তি করতে হবে।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। দেবতারা অসুরদের হারিয়ে দিচ্ছেন অসুররা তাই যজ্ঞ করছেন। যিনি আহুতি দিলেন তিনি বললেন, ইন্দ্রশত্রু উৎপন্ন হোক অর্থাৎ ইন্দ্রকে যে বিনাশ করবে সেই বৃত্রাসুর উৎপন্ন হোক। কিন্তু উচ্চারণের সময় একটু দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল বলে ইন্দ্রের শত্রু না হয়ে, হয়ে গেল ইন্দ্র শত্রু যার, মানে যাকে ইন্দ্র বিনাশ করবে। ফল বিপরীত হয়ে গেল। তাই সাবধান করছেন যেন বাক বজ্রপাত না হয়। উপনিষদে আর একজায়গায় আছে—যে দেবতাকে আহুতি দিচ্ছ তাঁকে না জেনে যদি আহুতি দাও তোমার মাথা পড়ে যাবে। এই ভয়ংকর কথা শুনে হোতা আহুতি দেওয়া বন্ধ করলেন।

পুরোহিতেরা দলে দলে যজ্ঞ থেকে বিরত হলেন, যজ্ঞ বন্ধ হয়ে গেল। এত গোলমাল মিটিয়ে নিখুঁত ভাবে কর্ম করা সহজ নয়। গীতাও বলছেন—

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।

যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ (৩।৩৮)

—মানুষের সমস্ত কর্ম দোষের দ্বারা আচ্ছন্ন যেমন আগুন ধোঁয়ার দ্বারা আচ্ছন্ন। নির্ধূম অগ্নি হয় না।

ঠাকুর তাই কর্মযোগের পথ পরিত্যাগ করে ভক্তিপথ আশ্রয় করতে বলেছেন। ভক্তিপথে কাম্য হল ভক্তি। ভগবানের প্রীতি সম্পাদন করা ভক্তের লক্ষ্য। 'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ'॥ (১৮।৪৬ গীতা) নিজ কর্মের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। এখানে কর্মফলে বদ্ধ হবার প্রশ্ন নেই, কারণ কর্মের ফল নিজের জন্য রাখছে না। ভগবানের চরণে সমর্পণ করছে। তার কর্ম মাত্রেই ভগবানের প্রীতি সম্পাদনের জন্য। কামনা নিয়ে করলেও ভোগ করতে হয়। দৃষ্টান্ত দিলেন, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এক বাড়ীতে ভোজ হচ্ছিল। একটি কসাই সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। ক্ষিধে পাওয়ায় সে-ও খেতে বসে গেল। পরে যখন সে গোহত্যা করল তার পাপের অংশ ভোগ করতে হল যে শ্রাদ্ধ করছিল তাকে। কারণ ঐ শ্রাদ্ধকার্যের পশ্চাতে তার কামনা ছিল।

এখানে আমাদের এই কর্মকাণ্ডের ব্যাপারটি একটু ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার। বেদে কর্ম করতে বলছেন, কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে করতে বলছেন যাতে ত্রুটি বিচ্যুতি না ঘটে। যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় যিনি সাক্ষাৎ-ভাবে যজ্ঞকার্যে কোন অংশ নেন না তিনি সেখানে ধ্যান করেন। ধ্যান করে যজ্ঞের বিঘ্ন তিনি দূরে করেন। এঁকে ব্রহ্মা বলে। তিনি ঋত্বিকদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ যজ্ঞবিদ্। তিনি এত উচ্চস্তরের হবেন যে তাঁর চিন্তার দ্বারাই যজ্ঞের সব বিঘ্ন দূর হয়ে যাবে। কর্মকাণ্ড এত জটিল।

নিষ্কাম কর্ম ও কর্মযোগ

ঠাকুর এবার ভক্তদের বলছেন, 'ঈশানকে দেখলুম—কৈ কিছুই হয় নাই! বল কি? পুরশ্চরণ পাঁচ মাস করেছে। অন্যলোকে এক কাণ্ড ক'রত।' ঈশানের আচরিত পথের ত্রুটি টুক তার সামনে তুলে ধরছেন। ঈশান এত তপশ্চর্যা করেছে কিন্তু ঠাকুর দেখলেন এত জপতপের দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনে যতটা উন্নতি করার কথা তার কিছুই হয়নি। এত জপতপ কেবল অনুষ্ঠান মাত্র রূপে না করে যদি অনুরাগের সঙ্গে করত তাহলে অনেক ফল হোত। একবার একজন সাধু শ্রীশ্রীমাকে বলছেন, মা, তন্ত্রে বলছে একলক্ষ পুরশ্চরণ করলে সিদ্ধি লাভ হয়। তা আমি তো আরও বেশী করলাম কিন্তু কই কিছু হল না তো! মা হেসে বললেন, বাবা, তুমি সন্ন্যাসী, তোমার আবার এত সংকল্প বিকল্প কি? মা শাস্ত্র পড়েননি। সাধারণভাবে উত্তরটি দিলেন যার ভাব হচ্ছে সন্ন্যাসী সংকল্প বিকল্প রহিত হয়ে কাজ করবে সুতরাং ফল হল না কেন এ প্রশ্ন তার করা উচিত নয়। এ শুধু সন্ন্যাসী নয়, ভক্তের পক্ষেও প্রযোজ্য। ভক্তও হবে সেইরকম সর্বসংকল্প পরিত্যাগী। তবে নৈমিত্তক পূজায় বিধি আছে আরম্ভ করবার সময় সংকল্প করতে হয়। সেই সংকল্প দুরকমের। এক, এই পূজার দ্বারা এই ফল হোক। আর তার থেকে সেয়ানা যারা তারা বলে 'শ্রী· ভগবৎ প্রীতিকামঃ'— ভগবানের প্রীতি কামনায় পূজা করছি; লাভের জন্য নয়। তাঁর প্রীতির জন্য কর্ম করলে কর্মের ফলটা আসে না। ফলটাই-তো দোষ। নিষ্কাম কর্ম মানে এইরকম কর্ম। তাহলে তার ভিতরে কি প্রেরক কারণ থাকে? ভগবানের প্রীতি সম্পাদন এটাই কারণ। ভক্তের যদি এতে রুচি না হয় তাহলে কিসে হবে? এটা নিশ্চয় কর্মের পিছনে প্রেরণা জোগাবে। যদিও মীমাংসকেরা এখানেও হিসাব করে বলেন, সেখানেও এই উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত থাকে যে ভগবান এই কর্মের ফল

সহস্রগুণে ফিরিয়ে দেবেন। ঠাকুরের মতে এইরকম হীনবুদ্ধির দ্বারা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলে তা নিতান্তই দোষের। ভগবানের প্রীতির জন্য কিংবা কর্তৃত্ববুদ্ধি রহিত হয়ে যদি কর্ম করা হয় তাহলে সে কর্ম দোষের হয় না। কর্মফল এড়াবার এই দুটি উপায়।

অধর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, হিসেবী মানুষ, অপরের ভালমন্দ বিচার করেন, ঠাকুরেরও একটু বিচার করছেন, বলছেন, 'আমাদের সম্মুখে ওঁকে [ঈশানকে] অত কথা বলা ভাল হয় নাই।' ঠাকুর বলছেন, 'সে কি! ও জাপক লোক, ওর ওতে কি?' ঠাকুর ঈশানকে খুব ছোট করে দেখাচ্ছেন না বা তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করছেন না। ঈশান যাতে এই কমজনিত দোষ থেকে মুক্ত হতে পারেন সেইজন্যই তাঁর ত্রুটিগুলি ধরিয়ে দিচ্ছেন, যাতে তিনি আরও উন্নত হতে পারেন। আবার ঈশানের গুণগুলিকেও তিনি সর্বসমক্ষে উল্লেখ করছেন। বলছেন, 'ঈশান খুব দানী, আর দেখ, জপ্‌ তপ্‌ খুব করে।'

যোগ ও ভোগের সমন্বয়

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ অধরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'আপনাদের যোগ ও ভোগ দুই-ই আছে।' যাঁরা অধরের মতো ভক্ত তাঁরা সর্বত্যাগী নন। ঠাকুর তাঁদের সর্বত্যাগের উপদেশও দিচ্ছেন না। বলছেন, সংযত হয়ে ভোগ করতে, তাহলে ভোগ তাঁদের উচ্ছৃঙ্খল করবে না। ভোগ করবে কিন্তু যোগে থেকে ভোগ করবে। অর্থাৎ ভোগে মগ্ন থেকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হারিয়ে না যায়। সাধারণ মানুষ বেশীর ভাগই এই পর্যায়ের। সম্পূর্ণরূপে ভোগ পরিত্যাগ করবে এরকম লোক কটি আছে? দেহধারী মাত্রেই অল্পবিস্তর ত্যাগ এবং ভোগের সমন্বয় করে চলে তবে কম বেশী এই মাত্র। তাদের সকলকেই সর্ব-ত্যাগের ঢালাও উপদেশ দিলে পরিণামে কি হবে? হয় তারা আদর্শ

সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হারাবে, না হয় নিজেদের অনধিকারী মনে করে আত্মবিশ্বাস হারাবে। যে যেখানে আছে তাকে উৎসাহ দিয়ে সেখান থেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাকে বলতে হবে, তোমার যা আছে তা ভাল কিন্তু আরও এগিয়ে যেতে হবে। সেই কাঠুরের হীরের খনি পাওয়ার মত মানুষও যদি একটু একটু করে আরও এগিয়ে যেতে পারে তাহলে সে-ও একদিন হীরের খনির সন্ধান পাবে। একেবারে সর্বত্যাগ এক কথায় হয় না। তাকে এক পা এক পা করে লক্ষ্যপথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আমাদের শাস্ত্রে আছে অরুন্ধতী ন্যায়। অরুন্ধতী নক্ষত্রটি এত ছোট যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই অরুন্ধতীকে দেখাবার সময় প্রথমে সপ্তর্ষিকে দেখান হয়। তারপরে লেজের দিকে তৃতীয় নক্ষত্র বশিষ্ঠকে দেখতে বলা হয়। সেটি দেখতে পেলে বলা হয়, খুব ভাল করে দেখ, ওর পাশে ছোট্ট একটি নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। তখন ঐদিকে দৃষ্টি দিতে দিতে অরুন্ধতীকে দেখতে পায়। এক কথায় অরুন্ধতী নক্ষত্রকে দেখালে খুঁজে পেত না। তাই ধাপে ধাপে নিয়ে যাচ্ছে। সেইরকম যার ভিতরে কামনা বাসনা গজগজ করছে, তাকে যদি বলা হয় সব ত্যাগ কর তাহলে তার উন্নতি হবে না। সেইজন্য বলছেন, ভোগ করছ কর কিন্তু একটু রাশ টেনে ভোগ কর। সেইজন্য মানুষকে ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই হল শাস্ত্রের নির্দেশ এবং ঠাকুরও এখানে প্রথমে ঈশানকে ও পরে অধরকে লক্ষ্য করে সেই কথাই বলছেন।

পনের

২. ২০. ১-৩

৺কালীপূজার রাত্রিতে ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ

কালীপূজার রাত্রি। শ্রীরামকৃষ্ণ যুবক ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে বসে আছেন, যাদের তিনি খুব ভালবাসতেন। তাদের সঙ্গে ফস্টিনষ্টিও করতেন আবার তাদের ধ্যান ধারণা, সাধনপথে কে কতদূর এগোচ্ছে, কার কোথায় বাধা এগুলির দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতেন। তাদেব ঐহিক ছোটখাট প্রয়োজনের দিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল, বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁর সেই বৈশিষ্ট্যটুকু চোখে পড়ছে। অন্ধকার রাত, যেতে লণ্ঠন লাগবে কি না জিজ্ঞাসা করছেন। কারো সর্দি হয়েছে, বলছেন, 'মাথায় কাপড় দিয়ে যেও'।

মন্দিরে মায়ের পূজোর আয়োজন হচ্ছে। ঠাকুর ভাবে বিভোর হয়ে একটির পর একটি গান করে চলেছেন। নিজেই বলছেন, 'এসব মাতালের ভাবের গান।' গানগুলি প্রাচীন শ্যামাসঙ্গীত কিন্তু গভীর ভাবোদ্দীপক। যিনি যে ভাবে জগজ্জননীকে অনুভব করেছেন তারই বর্ণনা এসব গানে প্রকাশিত হয়েছে।

এরপর মাস্টারমশাই মায়ের পূজার বর্ণনা দিয়েছেন। একদিকে পূজো চলছে অন্যদিকে ঠাকুর গান করতে করতে ভাবে মাতোয়ারা, ধর্মের যেন জমাটবাঁধা অবস্থা। ভক্তেরা স্বভাবতই সেই ভাবে মগ্ন হয়ে আছেন। ঠাকুরের সান্নিধ্যই পরিবেশকে এমন ভক্তিপূর্ণ ভাবময় করে তুলেছে যে সাধারণ মানুষের উপরেও তার বিশেষ প্রভাব পড়েছে। মাস্টারমশায় খুঁটিয়ে সব দেখতেন বর্ণনাও করতেন নিখুঁত ভাবে। এসব বর্ণনা ধ্যানের বিষয়, তিনি যেভাবে দিগদর্শন করিয়েছেন সে ভাবে চিন্তা করতে হয়। অমাবস্যার মহানিশা, অন্তর্মুখ ঠাকুরের ভাবদ্যোতক

কথা, তাঁর সঙ্গীত, নৃত্য বর্ণনার নৈপুণ্যে সমগ্র পরিবেশটি সাধকের মনে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। মাস্টারমশায়ের লেখার ধারা এইরকমই ছিল। তিনি নিজে ধ্যান করে প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা দৃশ্য মনে আনতেন সজীব বর্ণনায় রেখায় রেখায় সেগুলি তুলে ধরতেন। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন এগুলি ভক্তদের ধ্যানের সহায়ক হবে। স্মরণ মনন একেই বলে।

অবতারের প্রভাব সুদূর প্রসারী

এযুগে আমরা অনেক সময় ভাবি, সেই দিনগুলি কি অপূর্ব ছিল ভক্তেরা অনায়াসে ভগবানের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবতার পুরুষ আসেন, তাঁর সান্নিধ্যলাভ করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু সে যুগে সকলেই কি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন? মাস্টারমশায়ের বর্ণনার ভিতর সেরকম আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। দেখা গিয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাঁর সান্নিধ্য অনুভব আস্বাদন করতে পেরেছেন, আধ্যাত্মিক জীবনে পূর্ণতা লাভও করেছেন। আমরা মনে করি, আহা, আমরা যদি সে সময়ে থাকতাম! কিন্তু থাকলেই কি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হোতাম? এমনও হতে পারে আমরা কেউ কেউ তখন জন্মেছি কিন্তু তাতে কি আমাদের কল্যাণ হয়েছে?

কাজেই আফশোষ করার কিছু নেই। অবতার পুরুষদের স্থূলদেহ অবসানের পর ধীরে ধীরে তাঁদের ভাব প্রসারিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাব রেখে গিয়েছেন তা ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হচ্ছে। আমাদের যদি ইচ্ছা হয় সেই ভাব মন্দাকিনীতে অবগাহন করে পবিত্র হতে পারি। সুযোগ হারিয়েছি না ভেবে, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারছি কিনা সেটাই বিবেচ্য। এখন যদি না পারি, তখনই বা পারতাম কি করে? অতএব কি করে আমরা সেই মহৎ ভাবকে গ্রহণ করে জীবন সার্থক করতে পারি এইটাই ভাববার বিষয়।

ষোল

২. ২১. ১-৩

ভাব ভক্তি ও প্রেম

বড়বাজারে জনৈক মাড়োয়ারী ভক্তের বাড়ীতে উৎসব উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমনের কথা এখানে বলা হয়েছে। ভক্তটি ঠাকুরের পদসেবা করছেন। অবতার বিষয়ে কথা হচ্ছিল। ঠাকুর বললেন, 'ভক্তের জন্য অবতার, জ্ঞানীর জন্য নয়।' ভক্তটি অবতার মানেন, তিনি ভাবেন, ভগবান দেহধারণ করে আসেন জগতে ধর্মভাব উদ্দীপিত করবার জন্য। মাড়োয়ারী ভক্তদের মধ্যে একজন পণ্ডিত বলছেন, 'জ্ঞানী কিন্তু কামনাশূন্য'—এ কথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে অবতারের কাছেও জ্ঞানীর কোন কামনা নেই। ঠাকুর হেসে বলছেন, 'আমার কিন্তু কামনা যায় নাই, আমার কিন্তু ভক্তি কামনা আছে।' ঠাকুর বার বার বলেছেন, কামনা মাত্রেই দোষাবহ মনে হয় বটে কিন্তু ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়।

তারপরে পণ্ডিতের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন, ভাব ভক্তি প্রেম কাহাকে বলে? মনে হয় পণ্ডিতের প্রেম শব্দের ব্যাখ্যা ঠাকুরের পছন্দ হল না। তাই বলছেন, 'প্রেম মানে ঈশ্বরেতে এমন ভালবাসা যে জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে, আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয় তা পর্যন্ত ভুল হয়ে যাবে। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।'

ঠাকুর বেছে বেছে প্রশ্ন করছেন আর পণ্ডিত উত্তর দিচ্ছেন। মনে হয় ঠাকুর এই উত্তরগুলিই চাইছিলেন। এখানে তাঁর উদ্দেশ্য হল উপস্থিত ভক্তেরা, যাঁরা সর্বদা ঠাকুরের কাছে যান না তাঁদের যাতে ঐসব বিষয়গুলি সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা হয়। এখানে একটি জিনিস

দেখবার, শ্রোতারা অধিকাংশ হিন্দী ভাষাভাষী, ঠাকুরও আলাপ আলোচনা হিন্দীতেই করছেন। সাধুরা পুরী যাবার পথে কামার-পুকুরে ধর্মশালায় থাকতেন। ঠাকুর তাঁদের কাছে সর্বদা যেতেন, তাঁদের হিন্দীতে কথাবার্তা শুনে বোধ হয় কিছু শিখেছিলেন।

তারপর গৃহস্বামী বলছেন, 'মহারাজ, উপায় কি?' ঠাকুর বললেন, 'তাঁর নাম গুণকীর্তন। সাধুসঙ্গ। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা।' ঠাকুরের নির্দেশিত উপায়গুলি সবকটিই সকলের পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব। গৃহস্বামী বলছেন, 'আশীর্বাদ করুন, যাতে সংসারে মন কমে যায়।' ঠাকুর হেসে বলছেন, কত আছে, আট আনা?' মনে রাখতে হবে কথা হচ্ছে মাড়োয়ারীদের সঙ্গে। তাঁরা হিসাবী লোক, ঠাকুরও তাই তাদের ভাষা ব্যবহার করছেন। ঠাকুর ভক্তটিকে বলছেন, কিছু সাধন করতে হবে। মাটির নীচে কলসীতে ধনরত্ন পোতা আছে। অনেক পরিশ্রম করে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে যখন কলসীর গায়ে কোদালের আঘাত লেগে শব্দ হয় তখনই আনন্দ হয়।

অবতার—যোগমায়া সমাবৃত

কথাপ্রসঙ্গে গৃহস্বামী বললেন, 'এখন অবতার নাই।' ঠাকুর হেসে বলছেন, 'কেমন করে জানলে, অবতার নাই?' ভাব হচ্ছে, অবতার আছেন কি না কে পরখ করে দেখবে? 'অবতারকে সকলে চিনতে পারে না। নারদ যখন রামচন্দ্রকে দর্শন করতে গেলেন, রাম দাঁড়িয়ে উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কল্লেন আর বললেন, আমরা সংসারী জীব; আপনাদের মতো সাধুরা না এলে কি করে পবিত্র হবো?' আমরা সাধারণ লোকেরা যেমন বলে থাকি, আমরা সংসারী জীব, রামও তাই বলছেন। ভাগবতে আছে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সাধুরা যখন পথ দিয়ে চলে যান আমি তাঁদের পিছনে পিছনে যাই যাতে তাঁদের পায়ের ধুলো

গায়ে লেগে পবিত্র হতে পারি। তারপর ঠাকুর বলছেন যে, রাম যে সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তা ঋষিরা অনেকেই জানতে পারেননি। তখন গৃহস্বামী বলছেন, 'আপনিও সেই রাম।' ঠাকুর বললেন, 'রাম! রাম! ও কথা বলতে নাই। আমি তোমাদের দাস। সেই রামই এইসব মানুষ জীবজন্তু হয়েছেন।' ভাব হচ্ছে, রামই জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন। গৃহস্বামী বলছেন, 'মহারাজ, আমরা তো তা জানি না। ঠাকুর বলছেন, 'তুমি জান আর না জান, তুমি রাম।' এই কথাটি খুব প্রয়োজনীয় কথা। আমরা জানি বা না-ই জানি যা প্রকৃত ঘটনা তার ব্যতিক্রম হবে না, আমরা সেই ঈশ্বরের সত্তায় সত্তাবান।

অবতার তত্ত্ব নিয়ে আগে বহু আলোচনা হয়েছে। ঠাকুর এখানে সংক্ষেপে কটি কথা বললেন। 'অবতারকে সকলে চিনতে পারে না।' শাস্ত্র বহু জায়গায় বহুবার একথা বলেছেন, গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন,

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥' (৯।১১)

অবতার এমন করে মায়ার দ্বারা নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখেন যে, সে আবরণ ভেদ করে তাঁকে চেনা কারো সাধ্য হয় না। দু চারজন তাঁকে চিনতে পারেন বাকীরা তাঁকে সাধারণ মানুষ বলেই ভাবে, অবজ্ঞা করে। এ অবজ্ঞা কোন বিশেষ কারণে করে না, তাঁরা তাকে বুঝতে পারে না। রোগ শোক জরা মৃত্যুর অধীন তিনি, কখনও ভ্রমপ্রমাদগ্রস্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মতোই ব্যবহার করছেন, সর্বদা যে তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে ব্যবহার করেন তা নয়। ভাগবতে আছে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের বাছুর হরণ করলে তিনিও অন্যান্য রাখাল বালকদের মতো চিন্তিত হলেন বাছুরগুলো কোথায় গেল? তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে নয় সাধারণ মানুষের মতো মায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন। রামচন্দ্রও এমনি মায়াচ্ছন্ন হয়ে সীতাকে

হারিয়ে কেঁদে ভাসিয়েছেন। ভগবানের দৃষ্টিও আমাদের মতো মায়াচ্ছন্ন তবে তফাৎ এই, তিনি স্বয়ং নিজেকে মায়ার আবরণে আবৃত করেছেন। তাই তাঁকে চিনবার জানবার উপায় নেই।

তাহলে তাঁর আসা কেন? দুটি কারণে। এক, পূর্ণ ভগবত্তা তাঁর মধ্যে থাকায় লোকে তাঁকে চিনতে না পারলেও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়। দ্বিতীয় কথা, অবতারদের ভিতর দিয়ে সংসারের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন বলেছেন—

'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥' (গীতা ৩৷২১)

—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন আচরণ করেন সাধারণ মানুষ তারই অনুসরণ করে। রামচন্দ্রকে বলা হয়েছে 'মর্যাদা পুরুষোত্তম'। তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁর আচরণের দ্বারা মানুষের ব্যবহারের যে মর্যাদা, আদর্শ তিনি স্থাপন করে যাচ্ছেন তা অনুধাবন করে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে কি তাদের করণীয়।

কেবল আদর্শ জীবনাচরণ বা উপদেশের দ্বারাই নয় অবতার পুরুষদের সান্নিধ্যের দ্বারাই জগতে একটা প্রবল ধর্মের জোয়ার আসে, পূর্ণিমার রাত্রে যেমন সমুদ্র স্ফীত হয়ে ওঠে। স্বতঃই জগতে একটা পরিবর্তন হয় এবং তা মানুষের অগোচরেই হয়। আর সে প্রভাব তাঁদের দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয় না, পরেও থাকে, আরও বিস্তার লাভ করে।

এই এক একটি অবতার মানেই এক একটি স্থায়ী ছাঁচ, যে আদর্শে মানুষ নিজেকে গড়তে পারে। বিশেষ বিশেষ যুগের প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ ছাঁচের প্রবর্তন হয়। প্রত্যেক যুগের আদর্শকে সর্বসমক্ষে স্থাপন করবার জন্যই অবতারেরা আসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন তার উত্তরে তাঁর অন্তরঙ্গ

পার্ষদেরা বলেন, মানুষের ধর্মজীবনে যা কিছু প্রয়োজন সব আদর্শেরই তিনি প্রতিষ্ঠাতা, এইজন্য তাঁকে 'সর্ব ধর্মস্বরূপিণে' বলা হয়েছে। সব আদর্শের পরাকাষ্ঠা এক জায়গায়। জ্ঞান ভক্তি কর্ম যোগ—সব পথের একত্র সমাবেশ আধ্যাত্মিক জগতের ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি। সর্ব আদর্শের পরিপূর্ণতাই শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের বৈশিষ্ট্য।

অবতারের উপদেশের তাৎপর্য

এবার মারোয়াড়ী গৃহস্বামী ঠাকুরকে, 'আপনার রাগদ্বেষ নাই' বলতেই তিনি বলছেন, 'কেন? যে গাড়োয়ানের কল্‌কাতায় আসবার কথা ছিল, সে তিন আনা পয়সা নিয়ে গেল, আর এলো না, তার উপর ত খুব চটে গিছ্‌লুম!' ভাব হচ্ছে, অবতার হলেও দেহধারণ করলেই রাগদ্বেষ অল্পসল্প থাকবে তবে তা বাইরে থেকে দেখতে রাগদ্বেষের আকার মাত্র তাতে কারো অনিষ্ট অকল্যাণ হয় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পুরাণে যে আছে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অসুর বধ করছেন? পুরাণের মতে অসুরদের প্রতি কৃপাবশতঃ তাদের উদ্ধার করবার জন্য সংহার করছেন। চণ্ডীতে আছে—

'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥' (৪।২২)

—বরদে, হৃদয় মুক্তিপ্রদ কৃপা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা ত্রিভুবনে একমাত্র আপনাতেই দেখা যায়।

'দৃষ্টৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্‌।
লোকান্‌ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতাঃ
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী ॥' (চণ্ডী ৪।১৯)

—আপনার দৃষ্টি মাত্রেই অসুরকুল ভস্মীভূত হয়ে যেত তবু আপনি

তাদের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করলেন কারণ শত্রুরাও আপনার অস্ত্রাঘাতে পবিত্র হয়ে স্বর্গলাভ করবে। তাদের প্রতি আপনার এ অশেষ কৃপা।

তবে এ কৃপা আমরা সহ্য করতে পারব কি না সে স্বতন্ত্র কথা। সে যাই হোক আপাতঃদৃষ্টিতে দেবীকে আমরা নির্মমই দেখছি। শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারেও কত ছলনা কপটতা প্রকাশ পেয়েছে। তাদের এমনি অনেক আচরণে আমরা বিভ্রান্ত হই! সেজন্য বলছেন, 'ঈশ্বরাণাং বচঃ কার্যং তেষামাচরণং ক্বচিৎ'—লোকোত্তর পুরুষদের উপদেশ পালন করা উচিত কিন্তু তাদের আচরণ কখনও কখনও অনুকরণীয়। সব ব্যবহার সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। যাঁরা অসাধারণ ব্যক্তি তারা যদি এমন ব্যবহার করেন যা আমাদের দৃষ্টিতে দোষের তবু তাঁদের পক্ষে তাতে কোন হানি হয় না—

'তেজিয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বোভুজো যথা'—

তেজস্বী ব্যক্তিদের তা দোষাবহ নয়, যেমন সর্বভুক হওয়া অগ্নির পক্ষে দোষাবহ নয়। কিন্তু আমাদের তা অনুসরণ করলে ক্ষতি হবে! ঠাকুর বলেছেন, যার আইন সে ইচ্ছা করলে আইন ভাঙতে পারে।

ঠাকুরের জীবনেও আমরা দেখি তাঁর উপদেশগুলি পালনের চেষ্টা করা যায় কিন্তু তাঁর সব ব্যবহারগুলি কি আমরা অনুসরণ করতে পারি? করা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে না।

এমন কি সব উপদেশও সবার পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলছেন, এটা কর, এটা যদি না পার ওটা কর, তা-ও না পারলে অন্যটা কর—এমনি নানা বিকল্প পথ দেখাচ্ছেন। ঠাকুরও এক জায়গায় উপদেশ দিতে দিতে বলছেন, আমার যা বলবার বললাম, এখন তোমরা ন্যেজামুড়ো বাদ দিয়ে নিও। অর্থাৎ যতটুকু নিতে পার নাও, বাকিটুকু বাদ দাও। শাস্ত্রের কথা ঠাকুর বলেছেন,

বালিতে চিনিতে মেশান। এর ভিতরে বালিকে পরিহার করে চিনিটুকু নিতে হবে।

স্বামীজীকে একজন শিষ্য বলছেন, আপনি একবার একরকম বলেন আর একবার অন্যরকম বলেন আমরা বিভ্রান্ত হই কোনটা করব। স্বামীজী বললেন, সন্দেহ হলে আমাকে জিজ্ঞাসা করবি। তাৎপর্য হচ্ছে—তিনি যা বলেন তা সকলের পক্ষে ধারণাযোগ্য নয় তাই সন্দেহ আসে। কার পক্ষে কোনটি কল্যাণকর তা সাক্ষাৎভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে।

এইজন্য শাস্ত্রে অধিকারবাদের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। যে যেপথের অধিকারী সে সেই পথ গ্রহণ করবে। সব উপদেশ সকলের পক্ষে কল্যাণকর হয় না। যা তার নাগালের বাইরে তা ধরতে গেলে পতন হবে, আদর্শভ্রষ্ট হতে হবে। অধিকারী বিশেষে উপদেশের তারতম্য হবেই। ভিন্ন ভিন্ন পথের মধ্যে কোনটি কার পক্ষে উপযোগী তা নির্দেশ করবেন উপযুক্ত অভিজ্ঞ গুরু। এগুলি পুঁথিতে লেখা থাকে না, অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্ণয় করতে হয়। যেমন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এক একটি রোগের জন্য অনেক ওষুধের ব্যবস্থা আছে। একটাতে যদি রোগ সারে তাহলে এতগুলো কেন বলা হয়েছে? তার কারণ রোগের লক্ষণ বুঝে ভিন্ন ভিন্ন ওষুধ নির্বাচন করে নিতে হয়। আর এ কাজ অভিজ্ঞ ভিষকের। আমরা যে কেউ বই পড়ে চিকিৎসা করতে পারব না।

শাস্ত্রে দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত অনেক বাদ, অসংখ্য বিভাগ আছে। আমাকে বিচার করতে হবে এর মধ্যে কোনটি আমার পক্ষে অনুকূল হবে, কিংবা বিচার করে দেখলাম অদ্বৈতবাদ সবচেয়ে যুক্তিসহ কিন্তু ভেবে দেখতে হবে আমার জীবনে আমি কি সেটাকে কাজে লাগাতে পারব? এইজন্য ঠাকুর বারবার বলেছেন, 'আমি রাম'

একথা বলা ভাল নয়। এতে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল হতে পারে। 'রাজার নন্দিনী প্যারী যা করে তাই শোভা পায়'—এ ভাবলে হবে না। যার যেরকম অধিকার তদনুসারে সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে হবে। ঠাকুর বলতেন, নিজের সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাক অপরের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কটাক্ষ কোর না। অপরের সিদ্ধান্ত নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই তাতে আরও বিভ্রান্ত হতে হবে। উপনিষদ এইজন্য বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে নিষেধ করেছেন তা চিন্তাকে মলিন করে দেয়—'নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ।' (বৃ. ৪।৪।২১)—এই মলিন চিন্তা নিয়ে যতই চেষ্টা করা যাক তত্ত্বে পৌছন যায় না। 'তর্কপ্রতিষ্ঠানাৎ'—শঙ্করের মতো সূক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন তর্কশীল মানুষ বলছেন, (তর্কের দ্বারা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না। কেন হয় না? তার উত্তর শঙ্কর নিজেই দিয়েছেন, তুমি যা তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করলে অপরে তা তর্কের দ্বারাই খণ্ডন করবে। পূর্বপক্ষ বলতে পারেন, আমি তাকেও বিচারে পরাস্ত করব এবং এমনি করে যেখানে যত পণ্ডিত আছেন সকলকে পরাভূত করে স্বীয়তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করব, যা অপ্রতিহত! তার উত্তরে অন্য পক্ষ বলবেন, কিন্তু যারা অনাগত, তারা যদি তোমার সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে তুমি তাদের তো পরাস্ত করতে পারবে না। কত জ্ঞানী ব্যক্তি কত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন পরে সে সব তত্ত্ব যুক্তি বিচারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। শঙ্কর নিজেই তর্কের দ্বারা অপরের মত খণ্ডন করে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আবার রামানুজ বলেছেন, সূত্রগুলি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো কিন্তু ভাষ্যমেঘ তাদের আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। অর্থাৎ শঙ্করের ভাষ্য তত্ত্বকে প্রকাশিত না করে আবৃত করেছে। সুতরাং তত্ত্বকে তর্কের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। কোনো সিদ্ধান্তই অপরিবর্তনীয় নয়)

অতএব আমাদের মন যতক্ষণ না শুদ্ধ হচ্ছে, মনের উপর থেকে সব আবরণ দূর হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ সত্য আমাদের কাছে প্রকাশিত হবে

না। শঙ্কর বলছেন, 'তত্ত্বপক্ষপাতো হি স্বভাবো ধীয়াম্'—বুদ্ধির স্বভাবই হচ্ছে তা তত্ত্বের, সত্যের পক্ষপাতী। কিন্তু যে বুদ্ধি নিয়ে সত্যকে জানব তাই-ই আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সর্ষের ভিতরেই ভূত। তবে একটা আদর্শকে ধরে ইংরেজীতে যাকে বলে একটা Working hypothesis তাকে ধরে বিচার করে আমরা এগোতে পারি এবং যদি আন্তরিকতা থাকে তবে চলতে চলতে আমাদের বুদ্ধি ক্রমে শুদ্ধ হতে থাকবে, লক্ষ্যের স্বরূপও আমাদের কাছে ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত হতে থাকবে এবং পরিশেষে বুদ্ধি আবরণমুক্ত হলে সত্য সেখানে প্রতিভাত হবে।

এই শুদ্ধ বুদ্ধি না থাকার জন্যই অবতারের অবতারত্ব মানুষ বুঝতে পারে না, মোহগ্রস্ত হয়ে তাঁকে মানুষ বলে অবজ্ঞা করে। যখন খণ্ড ব্যক্তি আর অখণ্ড সত্তা এক হয়ে যাবে, দ্রষ্টা আর দৃশ্যের ভেদ থাকবে না তখন বিচার শুদ্ধ হয়ে যাবে।

সতের

২. ২২. ১-৪

'দেবী চৌধুরাণী'র সম্পর্কে ঠাকুরের মতামত

ধর্মবিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কি মত জানার জন্য ঠাকুরের অসীম আগ্রহ ছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী-তে নিষ্কাম কর্মের কথা আছে শুনে তিনি তা শুনতে চাইলেন, শুনে বুঝতে পারবেন লেখকের মানসিকতা ও চিন্তাধারা কোন স্তরের।

পাঠ শুরু হল। ঠাকুর মাঝে মাঝে মন্তব্য প্রকাশ করছেন। যখন শুনলেন ভবানী পাঠক দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন তখন ঠাকুর বললেন, 'ও ত রাজার কর্তব্য'। মন্তব্যটি ছোট, কিন্তু বিচার করে দেখবার জিনিস রয়েছে। অর্থাৎ সকলেই যদি রাজার কাজ করতে যায়, সমাজে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেবে। সকলের প্রতিনিধি হয়ে কোনো এক কেন্দ্রিত শক্তি এই কাজের ভার নিলে তবে তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এরপর প্রফুল্লের সাধনপ্রসঙ্গে কথা হল। স্তরে স্তরে প্রফুল্লকে ভবানী পাঠক শেখাচ্ছেন। প্রথমে শাস্ত্রীয় আলোচনা, পরে ব্যাকরণ, রঘু কুমার শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্য নাটক, তারপর একটু সাংখ্য বেদান্ত, ন্যায় পড়ানো হল। এই পর্যন্ত শুনেই ঠাকুর বলছেন, 'এর মানে একটু না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না।' লেখকের মত এই যে, আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর; ঈশ্বরকে জানতে হ'লে লেখাপড়া চাই। ঠাকুরের মতে কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। ভগবানকে যদি জানা যায় তারপর যা জানাবার তিনিই জানিয়ে দেবেন। তাঁর কাছে এইটাই হল সোজা পথ।

এরপর নিষ্কাম কর্মের কথা হল। গীতার উদ্ধৃতি রয়েছে শুনে

ঠাকুর বলছেন, 'এ বেশ। গীতার কথা। কাটবার যো নেই। তবে আর একটি কথা আছে, শ্রীকৃষ্ণে ফল সমর্পণ বলেছে ; শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি বলে নাই।' ঠাকুরের মতে এটি অপূর্ণতা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যদি অন্তরের পূর্ণ ভক্তি থাকে, সমর্পণ আপনিই হয়।

এরপর ধনের ব্যবহার কিভাবে করতে হবে সে কথা হল। যখন শুনলেন প্রফুল্ল কিছু ধন শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করবেন, কিছু ধন নিজের জীবন ধারণের জন্য রাখবেন, ঠাকুর তখন হেসে বলছেন, 'হাঁ, ঐটুকু পাটোয়ারী। যে ভগবানকে চায় সে একেবারে ঝাঁপ দেয়, দেহরক্ষার জন্য এইটুকু থাকলো এ সব হিসাব আসে না'। এরপর ভক্তের লক্ষণগুলি ও গীতার শ্লোক থেকে পড়া হলে ঠাকুর মন্তব্য করলেন, 'এগুলি উত্তম ভক্তের লক্ষণ'।

এরপর ঠাকুর যখন শুনলেন, লেখক লিখছেন, ভোগবিলাসের ঠাটের জন্য 'কখন কখন কিছু দোকানদারী চাই' শুনেই বিরক্ত হলেন, বলছেন, যেমন আকর তেমনি কথাও বেরোয়? দোকানদারী কথাটিকে সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করা যেত, নিজেই বলে দিচ্ছেন, 'আপনাকে অকর্তা জেনে কর্তার ন্যায় কাজ করা'—কথাটি ব্যবহার করা যেত। যে ভগবানের ভক্ত, যে সর্বজীবে তাঁরই সেবা করছে, তাকে দোকানদারী করতে হবে কেন? তাছাড়া ঠাট-বাটেরই বা কি প্রয়োজন? ঠাকুরের দৃষ্টিতে এসবের কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই।

এই প্রসঙ্গেই বলছেন, 'একজনের গানের ভিতর 'লাভ' 'লোকসান' এইসব কথাগুলো অনেক ছিল। গান গাচ্ছিল, আমি গাইতে বারণ কল্লুম। যা ভাবে রাত্তদিন, সেই বুলিই উঠে!'

আসল কথা ভাব শুদ্ধ হওয়া চাই। ভাব শুদ্ধ হলে ভাষাতেও শুদ্ধি আসে, না হলে ভিতরের অশুদ্ধি বেরিয়ে পড়ে, ভাবের অসঙ্গতি ধরা পড়ে। ঠাকুর যেখানে যেটুকু অসঙ্গতি লক্ষ্য

করেছেন অল্প কথায় তা প্রকাশ করেছেন বহুকথা বলছেন না। কথা-শিল্পে তাঁর অদ্ভুত নৈপুণ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অতবড় লেখক, চিন্তাবিদেরও ভুল ত্রুটিটুকু তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন। আবার যেখানে যতটুকু ভাল দেখেছেন তারও অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। সর্বত্রই তিনি সোজাসুজি সকলকে বলতেন, ভাষাকে একটু সুন্দর, রুচিকর করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা তাঁর অভ্যাস ছিল না, সে মানীব্যক্তিই হোন আর সাধারণ ব্যক্তিই হোন। এখানে যে সব মন্তব্য করলেন, বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত থাকলেও অসংকোচে তা বলতেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেও-ছিলেন। তিরস্কৃত হয়ে, তিনি সামাল দিচ্ছেন, আমাদের ওখানেও সব ধর্মালোচনা হয়, কীর্তন হয়। ঠাকুরের সরল স্বভাব যা সত্য বলে জানতেন স্পষ্টভাবে বলতেন যেমন কৃষ্ণকিশোরকে বলেছিলেন, যে নিরাকারে মন স্থির করবার চেষ্টা করছে সে আবার ট্যাক্সের দায়ে ঘটি-বাটি বিক্রী হয়ে যাবার চিন্তা করছে! কাজের সঙ্গে চিন্তার মিল নেই। মন মুখ এককরার দিক দিয়ে ঠাকুর ছিলেন অপূর্ব নিদর্শন।

মানুষকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে পূজা কি সম্ভব?

উপন্যাসের একজায়গায় আছে, 'ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের বিষয়।' ঠাকুর শুনেই বলছেন, মনের প্রত্যক্ষ বটে তবে এ মনের নয়। সে শুদ্ধ মনের। অর্থাৎ বিষয়াসক্তি একটুও থাকলে হয় না। মানুষকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে পূজা কি সম্ভব?

এরপর যোগের কথা হল। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে হলে জ্ঞান, ভক্তি অথবা কর্মরূপ যোগের দূরবীন দিয়ে দেখতে হয় শুনে ঠাকুর বললেন, 'এ খুব ভাল কথা।' তারপর স্বামীর সঙ্গে দেখা হলে দেবী বলছেন, যে, তিনি অন্য দেবতার অর্চনা করতে পারেননি, স্বামী সব দেবতার স্থান দখল করেছেন। ঠাকুর বলছেন, 'এর নাম পতিব্রতার

ধর্ম। এও আছে। প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না?' কিন্তু কোথায় যেন দ্বিধা আছে, খুব উৎসাহের সঙ্গে কথাটি বলছেন না। কেন না মানুষের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন খুব সহজ নয়। প্রতিমায় যখন ঈশ্বর দর্শন করি তখন আমরা সমস্ত ঈশ্বরীয় ভাব প্রতিমায় আরোপ করি। অন্য অপূর্ণতার দিকে ততটা দৃষ্টি দিই না। প্রতিমাকে আমরা জড় বলে ভাবি না, ঈশ্বর বলেই দেখি। কিন্তু মানুষের ভিতর দোষগুণ আছে। সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে তার ভিতরের শুধু দেবত্বকে দেখা বড় সহজ কথা নয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই কঠিন। তবে বলেছেন, ভক্তির জোর থাকলে, সাধন করতে করতে মন শুদ্ধ হলে তবে এরূপ দর্শন হতে পারে। শুধু শুদ্ধ সত্তা নয়, ভাল-মন্দ সব মানুষের ভিতরই ভগবান আছেন এইটি যিনি অনুভব করতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। সর্বভূতে, সর্বপ্রকারে তিনিই রয়েছেন, সব তাঁরই লীলা, এই দৃষ্টিতে যখন মানুষ দেখে তখন তার কাছে ভালমন্দের আর পার্থক্য থাকে না। এই অবস্থাটি সাধারণের হবার কথা নয়।

শাস্ত্রে আছে, প্রবর্তক অবস্থায় ভক্ত প্রতিমাতে পূজা করে। পূজা করতে করতে মনের ভিতরে ভগবানের ভাব যখন ঘনীভূত হয় তখন আর প্রতিমার ভিতরে সেই ভাবটি সীমিত রাখতে পারে না। ভাগবত যে তিনরকম ভক্তের কথা বলেছেন তার ভিতরে প্রাকৃত ভক্ত অর্থাৎ অমার্জিত মন—যাঁর বুদ্ধি বেশী শুদ্ধ হয়নি তিনি শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিমায় তাঁর পূজা করেন। তিনিও ভক্ত তবে তাঁর মনের শুদ্ধির সীমা সংকীর্ণ। তিনি প্রতিমাতে ভগবানকে সীমিত করে দেখছেন। তারপরে যখন তিনি মধ্যম শ্রেণীর ভক্তে উন্নীত হলেন তখন দেখছেন ভগবান শুধু এই প্রতিমার ভিতরেই নয়, জীবের ভিতরেও আছেন, ভক্তের ভিতরে আছেন। তাঁর দৃষ্টি তখন পরিবর্তিত হয়েছে তাই আর কেবল প্রতিমায়

নয়, যেখানে যেখানে ভক্ত হৃদয় সেখানে তাঁর অবস্থান, এইটুকু দেখছেন। কিন্তু দৃষ্টি প্রসারিত হলেও এখনও সর্বগ্রাহী হয়নি। পরে যখন তিনি শ্রেষ্ঠ ভক্তের পর্যায়ে উন্নীত হলেন তখন তিনি সর্বভূতে তাঁকে দেখছেন। সর্বভূত বলতে চেতন জড় সব জায়গায়।—

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

ভাগবত ১১. ২. ৪৫

—নিজের ভিতর যে আত্মা সর্বভূতের ভিতরেও যিনি সেই আত্মাকেই দেখেন এবং ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে সর্বভূতকে দেখেন তিনি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে উত্তম। সেই ভক্তের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলছেন—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

ভাগবত ১১. ২. ৪১.

সব জায়গায় তিনি ভগবানের সত্তাকে উপলব্ধি করেন, সবই ভগবানের শরীর দেখেন। জগৎ এবং ভগবানের এই অভিন্নতার উপলব্ধি ভাগবতের মতে শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ।

ঠাকুর এখানে বলছেন, 'তিনি মানুষ হয়েও লীলা ক'রছেন। আমি দেখি, সাক্ষাৎ নারায়ণ! কাঠ ঘস্‌তে ঘস্‌তে যেমন আগুন বেরোয়, ভক্তির জোর থাকলে মানুষেতেই ঈশ্বরদর্শন হয়।' মানুষের নানাবিধ অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তার মধ্যে ঈশ্বর দর্শন, কেবল সৎ নয় অসতের মধ্যেও ভগবানকে দেখা এটি সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। বিরল উচ্চকোটির সাধক যাঁরা তাঁরাই দেখেন, তিনি সর্বপ্রকারে সর্বভূতে আছেন। ভালতে তিনি, মন্দতেও তিনি। সব তাঁর লীলা এই দৃষ্টিতে দেখেন বলে ভালমন্দের পার্থক্য তাঁদের কাছে দূর হয়ে যায়। এই অবস্থাটি সাধারণের হবার কথা নয়।

ঠাকুর যে বলছেন, 'জীয়ন্ত মানুষে তাঁর পূজা হয় না ?' হয়। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে শুদ্ধ বিভূতির প্রকাশ যেখানে সেখানে যেমন হয় অশুদ্ধ আধারে তেমন হয় না। ঠাকুর বলছেন, 'প্রতিমাটি সুন্দর হওয়া চাই।' প্রতিমা সুন্দর হলে তাতে যত সহজে ঈশ্বরদর্শন করা যায় কদাকার হলে তা পারা যায় না। তেমনি যে মানুষটিতে ঈশ্বরবুদ্ধি করব সে মানুষটি যদি সাত্ত্বিক হয় তাহলে তাতে ঈশ্বরবুদ্ধি করা সহজ হয়। তবে সেও সাধন সাপেক্ষ। সাধনা করতে করতে মন শুদ্ধ হলে ভাল মন্দের পার্থক্য দূর হয়ে যায় তখনই সর্বত্র ভগবানকে দেখা যায়।

ঠাকুর আরও বলছেন, 'তবে একটি কথা আছে—তাঁকে সাক্ষাৎকার না করলে এরূপ লীলা দর্শন হয় না।' ঈশ্বর দর্শন না হলে মানুষকে ঈশ্বররূপে দেখা যাবে না। তাঁর সাক্ষাৎ করা চাই। 'সাক্ষাৎকারের লক্ষণ কি জান? বালক স্বভাব হয়। কেন বালক স্বভাব হয়? ঈশ্বর নিজে বালক স্বভাব কি না! তাই যে তাঁকে দর্শন করে, তাঁরও বালক স্বভাব হয়ে যায়।'

ঈশ্বরের বালক স্বভাব কেন? তা না হলে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় করবার কি প্রয়োজন আছে তাঁর? ছোট ছেলে মনের খেয়ালে বালি দিয়ে ঘর তৈরী করে, আবার নিজেই তা ভেঙে দেয়, ঠিক সেইরকম ভগবান বিনা প্রয়োজনে এই জগৎ সৃষ্টি করছেন, একে পালন করছেন আবার ভেঙে ফেলছেন। যদি বলা যায় তাঁর এই লীলার উদ্দেশ্য আনন্দলাভ। যেমন উপনিষদ বলছেন, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।' তৈ. ৩. ৬.

আনন্দ থেকেই এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হয়ে আনন্দের দ্বারা বর্ধিত হয় এবং অবশেষে আনন্দ অভিমুখে প্রতিগমন করে। এই আনন্দকে ব্রহ্ম বলছেন—'আনন্দরূপম্‌ব্রহ্ম যদ্বিভাতি।' তবে এ আনন্দ

সাধারণ বিষয়ের আনন্দ নয়। যিনি আনন্দস্বরূপ তাঁর আনন্দ থেকে জগৎটার উৎপত্তি হয় এর মানে কি? জগৎ না হলে তাঁর আনন্দের কমতি হচ্ছিল? এজন্যই তাঁকে জগৎরূপ খেলনাটা তৈরী করে খেলতে হচ্ছে? তা যদি হয় তাহলে তিনি আত্মারাম হবেন কি করে? যাঁর আত্মাতেই আনন্দ, আত্মাতেই সন্তুষ্ট যিনি তাঁর আবার বাহ্য উপকরণ রচনার কি দরকার আছে? কোনো দরকার নেই। দরকার নেই তবু করছেন, এইজন্য বলছেন, 'বালকের স্বভাব'। শাস্ত্রে একে বলছেন, লীলা। এই লীলা কথাটি বোঝাবার জন্য লোকবৎ বলা হয়েছে। লোকজগতে শিশু যেমন খেলাঘর করে, সে ঘরে সে থাকবে না, কোনো দরকার নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই, তবু করে, তাতে তার আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। ভগবানের আনন্দের অভিব্যক্তির জন্য কি এরকম সংসার রচনার প্রয়োজন হয়েছিল? এর কোনো উত্তর নেই। একজন বোধকরি পদ্মলোচনকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভগবান কে সৃষ্টি করলেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, যে কমিটিতে তিনি এটা স্থির করেছিলেন তাতে আমি উপস্থিত ছিলাম না অর্থাৎ আমার বুদ্ধির অগম্য। ভগবানের উদ্দেশ্য কি তা বুঝে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যখন বুঝতে পারি না কেন করেন তখন বলি, এ তাঁর লীলা। যাঁরা ভক্ত প্রেমের দৃষ্টিতে দেখেন তাঁদের জানবার চেষ্টা নেই, তাঁরা এর ভিতর তাঁকে নিয়েই আনন্দ করতে চান। আর যাঁরা জানতে চেষ্টা করেন, জ্ঞানী যাঁরা, তাঁরা বলেন, তুমি দেখছ সৃষ্টি করেছেন, কোথায় সৃষ্টি করেছেন? এর কোন বাস্তব সত্তা নেই। বলছেন 'আপ্তকামস্য কা স্পৃহা?' যিনি পরিপূর্ণ তাঁর আবার ইচ্ছা কি করে হবে, ইচ্ছা হবে অপূর্ণের। সুতরাং 'ভগবানের ইচ্ছাতে জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে'—একথা বুদ্ধি দিয়ে যখন বুঝতে চাই তখন বুদ্ধি তাকে প্রমাণ করতে পারে না। তবে জগৎটাকে যদি বিশ্লেষণ করি, বিচার করি, করতে করতে সেই জগৎকর্তা পর্যন্ত

পৌঁছাতে পারি যার অভিব্যক্তি এই জগৎটা। এইজন্য জগৎকে প্রয়োজন। মাণ্ডুক্যকারিকা বলছেন—

'মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টি র্যা চোদিতান্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥' (৩।১৫)

—জগৎটা কোনো প্রকারেই নেই স্থূলরূপে সূক্ষ্মরূপে নেই, কার্যরূপে কারণরূপে নেই—কোনো রূপেই নেই—'নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন'। জগৎ-রূপে যা দেখছ তা এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয় এই তত্ত্বটি বোঝাবার জন্য এগুলি উপায়—'উপায়ঃ সোঽবতারায়'। এটা বোঝাবার জন্য নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়ে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে—'যথা সোম্যৈকেন মৃৎ-পিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্' (ছা. উঃ ৬।১।৪) যেমন একটি মৃৎপিণ্ডকে জানার দ্বারা মৃত্তিকার পরিণামভূত সমস্তই জানা যেতে পারে। যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্' (ছা. উঃ ৬।১।৫) একটি লৌহপিণ্ডকে জানার দ্বারা লৌহের পরিণামভূত সমস্তই জানা যেতে পারে। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥ (মু. উঃ ২।১।১)

—সেই অক্ষরই পারমার্থিক সত্য। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে সজাতীয় সহস্র সহস্র অগ্নিকণা নির্গত হয় সেইরকম এই অক্ষর থেকে নানাবিধ বস্তু উদ্ভূত হয় এবং তাঁতেই বিলীন হয়।

মৃত্তিকা, লৌহ, স্ফুলিঙ্গ ইত্যাদির দৃষ্টান্তের দ্বারা কি সিদ্ধ হল যে জগৎটা সত্য সত্য রচিত হয়েছে ? সিদ্ধ হল না। কারণ যুক্তির ভিতর বিরোধ আছে,—সেগুলিকে খণ্ডন করা যায় না। সুতরাং শেষকালে

বলছেন এগুলি সত্য নয়, এ দৃষ্টান্তগুলি কেবল তত্ত্বকে জানবার জন্য তাছাড়া এর আর কোন তাৎপর্য নেই।

এখন কথাটি এই, এই যে বলা হল কোনো রূপেই নেই সেরূপ বস্তুটিকে আমরা জানব কি করে? তিনি এ নয়, ও নয় করে সব তো বাদ দেওয়া হল তাহলে রইল কি? তখন বোঝাবার জন্য বলা হল এই যে জগৎকে দেখছ তার রচনাকৌশল এমন যে আপনি সৃষ্টি হতে পারে না। ভিতরে একজন নিয়ন্তা না থাকলে এরকম রচনা কেমন করে হোত? এর পশ্চাতে কোনো বৃদ্ধি কাজ করছে। সেই বুদ্ধি কার? আমাদের নয়, কারণ আমরা জগতের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং আমাদের বৃদ্ধি দিয়ে জগৎ তৈরী হয়নি। তাহলে এমন এক সত্তার দ্বারা জগৎ রচিত হয়েছে যিনি জগতের অতীত। সেই জগদতীত সত্তায় পৌছবার জন্য এই জগৎটি। আলোচনা এইজন্য করা হয়।

শাস্ত্রে বলছেন,

'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ।
আকাশাদ্ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।'
তৈ. উ. ২.১.৩

—সেই আত্মা থেকে আকাশ উৎপন্ন হন, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে এই পৃথিবী। অর্থাৎ সেই প্রথম সূক্ষ্ম বস্তু থেকে ধীরে ধীরে স্থূল বস্তু উৎপন্ন হল। আবার এক জায়গায় বললেন, তিনটি জিনিস তৈরী করলেন—তেজ (অগ্নি) অপ (জল) অন্ন (ক্ষিতি)। আগে বলা হল পাঁচটি। তাহলে কোনটি ঠিক? এবিষয়ে শঙ্কর বলেছেন, যে তিনটি বস্তু সৃষ্টির কথা একজায়গায় বলা হয়েছে তারই বিশদীকরণরূপে অন্যত্র পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ করা আছে। অথবা এর কোনোটিই ঠিক নয়। এত পার্থক্য কথার ভিতর তার মানে এর কোন তাৎপর্য নেই, দৃষ্টান্ত মাত্র।

যেমন ঠাকুর বলছেন, কালাপানিতে গেলে আর জাহাজ ফেরে না। এটা প্রবাদ মাত্র, সত্য নয়। বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে যে তত্ত্বতে পৌছলে আর জগৎ ভ্রম হবে না। 'তাঁর থেকে জগৎ সৃষ্টি' বলার তাৎপর্য হল তিনি ছাড়া আর জগৎ কিছু নয় এইটুকু বোঝান। কিণ্ডারগার্টেন মেথড যাকে বলেছে সেইরকম পদ্ধতিতে করা।

একজন বোঝাচ্ছেন ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজিত। কিন্তু শ্রোতা বুঝতে পারছেন না। তখন বক্তা বলছেন, এক সরা জল নিয়ে এস। জল আনলে তাতে এক দলা সৈন্ধব লবণ ফেলে দিতে বললেন। ফেলে দেওয়ার পর বললেন, রেখে দাও কাল কথা হবে। পরদিন সেই সরাশুদ্ধ জল নিয়ে আসতে বললেন। আনার পর বললেন, সৈন্ধব কোথায় খুঁজে দেখ। চারিদিকে হাতড়ে সৈন্ধব পাওয়া যাচ্ছে না। বললে, পাচ্ছি না কোথাও। বললেন, উপর থেকে জল তুলে স্বাদ নিয়ে দেখ। কিরকম স্বাদ ? 'নোনতা'। 'পাশ থেকে দেখ কেমন লাগে' ; 'নোনতা লাগে'। 'একেবারে তলা থেকে নিয়ে দেখ কেমন লাগে' ; 'নোনতা লাগে'। এই যেমন লবণ বস্তু যাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না অথচ তার স্বাদ পাচ্ছ, সেইরকম এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে তিনি কোথাও প্রত্যক্ষ হচ্ছেন না কিন্তু তার স্বাদ সর্বত্র রয়েছে। যে আস্বাদন করতে পারে সে পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারে।

এখন নরলীলাতে যখন আমরা আসি তখন বলি, দুষ্টলোকের ভিতরে কি করে ভগবানকে কল্পনা করব ? তার দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের জীবনে দেখেছি, ঠাকুর মাতালদের দেখে সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন। আরো নানা দৃষ্টান্ত আছে। এটা কি করে সম্ভব ? আমরা মাতালকে মাতাল দেখছি তিনি দেখছেন, মাতালের যে আনন্দ তা আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তি মাত্র। তিনি বিকৃতি দেখছেন না যাঁর অভিব্যক্তি তাঁকে দেখছেন। দেখে সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন। মানুষের যখন এই

দৃষ্টি হয় তখন আর ভাল মন্দের পার্থক্য থাকে না। তার কাছে ভালও তিনি মন্দও তিনি, সবই তিনি। এ দৃষ্টি হচ্ছে একেবারে শেষের কথা।

প্রতিমাতে দেবতার আরোপ করবার সময় আমরা তার অসম্পূর্ণতা না দেখে তাতে সেই শুদ্ধ সত্তা, শুদ্ধ চৈতন্যের আরোপ করি। আরোপ করার সময় জানি এটি জড় প্রতিমা কিন্তু আমার দৃষ্টি সেই জড়ে নয়, অন্তর্নিহিত যে চিৎ-সত্তা তাতে। এইভাবে প্রতিমায় ঈশ্বর দর্শন করতে হয়। তেমনি মানুষের ভিতর যখন ভগবানকে দেখবার চেষ্টা হচ্ছে তখন মানবীয় অপূর্ণতাগুলির দিকে দৃষ্টি না করে এই মানবরূপ খোলের ভিতর যে পরমেশ্বর বিরাজিত আছেন তাতে দৃষ্টি করব। এই হল সাধনা। ঠাকুর যেমন দেখেছেন, দেখে বলেছেন, বালিশ নানা আকারের আছে কিন্তু তার ভিতরে একই তুলো।

এখন বঙ্কিমচন্দ্র উপমা দিলেন, 'পতিব্রতার ধর্ম ; স্বামী দেবতা।' কেবল এইটুকু জানলেই ভগবদ্দর্শন হয় না। তাহলে যারই আসক্তি প্রবল তারই হোত। স্বামীতে ঈশ্বর দৃষ্টি করলেই হবে না, দৃষ্টিটি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া চাই। সে দৃষ্টি সাধকের দৃষ্টি। সাধকের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারলে পাতিব্রত্যের ভিতর দিয়েও হতে পারে। পার্থক্যটুকু বুঝে নেওয়া দরকার।

ঠাকুর বলছেন, সব সময় ছেলের কথা মনে হলে তাকেই গোপাল ভাববে। কথাটা শুনলে বেশ মনে লাগে। যাকে খাওয়াচ্ছি-দাওয়াচ্ছি নাওয়াচ্ছি তাকে গোপাল ভাবছি। কিন্তু সত্যি সত্যি ভাবছি কি না সেটা তো বিচার করে দেখতে হবে। গোপালের ভিতর তাঁর সত্তা প্রকাশিত দেখলে তার দোষগুণ চোখে পড়বে না। হবে তো সে দৃষ্টি ? তা না হলে ঠিক গোপাল দৃষ্টি করা হল না। এইটুকু খুব বিচার করে মনে রেখে সাধনা করতে হয়, সাধনার ভিতরে যেন কপটতা না থাকে।

অনেক সময় আমরা এই সাধনার দোহাই দিয়ে কপটভাবে নিজের ব্যবহারকে সমর্থন করি। বিচার না করে বলি, সবই তো ভগবানের সেবা করছি। অত্যন্ত স্বার্থপর দেহাত্মসর্বস্ব ব্যক্তিও যুক্তি দিতে পারে, এই যে আমি নিজেকে সাজাচ্ছি গোজাচ্ছি এ আমার ভিতর যে নারায়ণ আছেন তাঁকেই করছি। গল্প আছে একজন বলছে, ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে তো আমার মতো ব্রাহ্মণ কোথায় পাবে? কথাটি পরিহাস করে বলা হয়েছে কিন্তু এর তাৎপর্য কোথায় বুঝতে হবে। মনের সঙ্গে জুয়াচুরি না করে সবই যেন সাধনা হয়।

ঠাকুর যে বললেন, 'তাঁকে সাক্ষাৎকার না করলে এরূপ লীলাদর্শন হয় না'। কথাটা খুব ভাল করে মনে রাখতে হবে। সাক্ষাৎকারের লক্ষণ হচ্ছে বালকস্বভাব, আঁট নেই কিছুর। তারপর বলছেন, 'এই দর্শন হওয়া চাই। এখন তাঁর সাক্ষাৎ কেমন ক'রে হয়? তীব্র বৈরাগ্য। এমন হওয়া চাই যে, বল্‌বে, কি! জগৎ পিতা? আমি কি জগৎ ছাড়া? আমায় তুমি দয়া করবে না? শালা!' ঠাকুরের ভাষায় ঠাকুর বলছেন।

তারপর বলছেন, 'যে যাকে চিন্তা করে সে তার সত্তা পায়। শিবপূজা করে শিবের সত্তা পায়। একজন রামের ভক্ত, রাতদিন হনুমানের চিন্তা ক'রতো! মনে ক'রতো, আমি হনুমান হয়েছি। শেষে তার ধ্রুব বিশ্বাস হলো যে, তার একটু ল্যাজও হয়েছে'।

যারা সর্বদা এইরকমভাবে ভগবানকে সর্বত্র দেখবার চেষ্টা করছে, আরোপ করছে তাদের অন্তরের পরিবর্তন হয়ে যাবে, যাঁর উপাসনা করছে তাঁর স্বরূপ প্রাপ্ত হবে। 'উপাসনা' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর বলছেন তাঁর সমীপে থেকে তাঁর চিন্তা করতে করতে পরিণামে সে উপাস্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হবে। ঠাকুর যেমন বলেছেন, কুমুরে পোকার চিন্তা করতে করতে আরশোলা কুমুরে পোকা হয়ে যায়।

মানুষ স্বরূপত ঈশ্বর কিন্তু তার উপর বিপরীত একটা ভাব এসে পড়েছিল, আবরণ সেটা, সে আবরণ ভগবৎসত্তাকে ঢেকে দিয়েছিল। আরোপ করতে করতে সেই আবরণ উন্মোচিত হল তখন তার ভিতর যে ঈশ্বরের সত্তা ছিল বা বাস্তবিক আছে চিরকাল, তারই প্রকাশ হয়। তেমনি মানুষকে ঈশ্বর ভাববার সময় তার উপর ঈশ্বর ভাবের যে আরোপ করা হয় তার পরিণামে তার মানবরূপ-খোলসটা একসময় খসে যায় এবং অন্তরের যে ঈশ্বরীয় সত্তা তা প্রকাশিত হয়। মানুষের মধ্যে তাঁকে চিন্তা করবার পরিণাম এই হবে, এটুকু এখানে পরিষ্কার করে বললেন।

এরপর ঠাকুর বলছেন, 'বাপ যার হাত ধরে থাকে, তার ভয় কি!' সে যদি চোখ বুঁজেও দৌড়য় তাহলেও পদস্খলন হয় না। পড়বার ভয় তার নেই কারণ ভগবান তাকে ধরে আছেন। আমরা যখন তাঁকে ধরি তখন আমাদের হয় তো কোন সময় হাত শিথিল হতে পারে, কিন্তু যখন তিনি ধরেন, পড়ার ভয় নেই। তিনি কখন ধরেন? যখন তাঁর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিই। মনে হয় তিনি সবাইকে কেন ধরেন না, ধরলেই তো পারেন। কিন্তু আমরা কি তাঁর হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছি? যে ছেলে বাপের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে, বাপই তাকে শক্ত করে ধরে। ছেলে যদি অন্যমনস্ক হয়ে হাত ছেড়ে দেয় তাহলে পড়ে যেতে পারে। যে নিজে বাপের হাত ধরে আছে, তার দিকে বাপের অত দৃষ্টি থাকে না, সে তো নিজেই ধরে আছে। ভাব হচ্ছে, পরিপূর্ণ নির্ভরতা এলে ভগবান তার সব ভার নেন তার আর পতন হয় না। যেমন বলেছেন, 'ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্নপতেদিহ'। (ভাগবত ১১।২।৩৫)—চোখ বুঁজে দৌড়লেও তার পদস্খলন হয় না। এইভাবে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত সেই হতে পারে যে ভগবানের হাতে একেবারে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। পূর্ণ নির্ভরতা না থাকলে একটু কর্তৃত্ববুদ্ধি থাকে।

অর্থাৎ আমি করছি, আমি তাঁর ভক্ত, আমি তাঁকে আশ্রয় করে রয়েছি, এভাব থাকে কিন্তু নিজেকে পুরোপুরি তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে হবে এই বুদ্ধি হলে ভগবান সব ভার নেন।

কেদার (চাটুজ্যে) এখন ঢাকায় সরকারী কর্ম করেন। তিনি ঠাকুরের পরম ভক্ত। ঢাকায় অনেক ভক্ত তাঁর কাছে আসেন ও উপদেশ গ্রহণ করেন। তাঁদের প্রসঙ্গে কেদার বলছেন, 'আমি তাদের বলেছি আমি নিশ্চিন্ত। যিনি আমায় কৃপা করেছেন, তিনি সব জানেন।' অর্থাৎ যারা আসে তাদের কল্যাণের পথে আমি পরিচালিত করতে পারছি কি না, তারা যে আশা নিয়ে আসছে সেই আশা আমি পূরণ করতে পারছি কি না এ সব আমি জানি না, তিনি অর্থাৎ ঠাকুর জানেন। আমি তাঁর উপরে সব ভার ছেড়ে দিয়েছি। ঠাকুর বলছেন, 'তা ত সত্য। এখানে সব রকম লোক আসে, তাই সব রকম ভাব দেখতে পায়।' এটা ঠাকুরের পক্ষেই সম্ভব। কেদাব একটি ভাব নিয়ে সিদ্ধ কিংবা তিনি উচ্চস্তরের সাধক, কিন্তু তিনি একভাবের সাধক হলেও তার ভিতরে সব ভাবের বিকাশ তো হয়নি। যে যেভাব দেখতে চায়, সে সেইভাব ঠাকুরের ভিতর পরিপূর্ণরূপে দেখতে পায়।

তারপর কেদার যখন বললেন, আমার নানা বিষয় জানার দরকার নেই তখন ঠাকুর বলছেন, 'না গো, সব একটু একটু চাই।' যিনি আচার্য, অনেকের অভাব পূরণ করবার জন্য, অনেককে দিগ্‌দর্শন করাবার জন্য যিনি নিজেকে তৈরী করছেন তাঁর সব ভাব ধরবার সামর্থ্য থাকার দরকার হয়। তা না হলে তিনি ঠিক পথে অপরকে পরিচালিত করবেন কি করে? অবতার পুরুষদের পক্ষে যে রকম সম্ভব অন্যদের পক্ষে তেমন নয়।

অবতার এবং উচ্চস্তরের সাধকের মধ্যে এই হল পার্থক্য। অবতারদের কাছে প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাবের পূর্ণ আদর্শ দেখতে

পায়, অন্যত্র তা পায় না। এমনকি অবতার পুরুষদের ভিতরেও ঠাকুরের মতো এমন বহুবিচিত্র জীবনাদর্শ কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এগুলি কেবল তিনি সিদ্ধান্ত হিসাবে বলেছেন বা ভাবস্থ হয়ে বলেছেন তা নয়, এ সবই পরীক্ষিত সত্য। ঠাকুর অনেক সময় তাঁর পূর্বের সাধন জীবনের কথা উল্লেখ করতেন। কেউ নিজের সমস্যার কথা বললে বল'তেন, হ্যাঁ গো, আমারও এইরকম হ'ত, তখন আমি এইরকম করেছিলাম। সেকথা শুনলে লোকের মনে সাহস হয়, সে নিশ্চিন্ত হয় যে, ঠাকুর যখন এমনি অনুভব করেছেন তখন তিনি যে উপদেশ দিচ্ছেন তা আমার পক্ষে উপযোগী হবে। আর তা না হলে শাস্ত্রে তো বহু কথাই বলেছে আমার জীবনের পক্ষে সেটি নিশ্চয় উপযোগী হবে কি না সংশয় আসে। কিন্তু ঠাকুর যখন নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন, তখন তার ফল আলাদা। মনের ভিতরে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবে, ভ্রান্তির আর আশঙ্কা থাকবে না।

এই সম্বন্ধে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হল যে শ্রুতি, যুক্তি, অনুভব এই তিনটি মিলিয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হতে হয়। শ্রুতিতে যে সিদ্ধান্ত আছে, যুক্তির দ্বারা তা সমর্থিত এবং প্রত্যক্ষের দ্বারা পরীক্ষিত হয়। এখন প্রত্যক্ষের পরেও সন্দেহ থাকে কি না তার উত্তরে বলছেন, একটু থাকে। সমস্ত খাদ যতক্ষণ না দূর হচ্ছে ততক্ষণ সংশয় থাকে। তবে দিব্য অনুভূতির পর আর সংশয় থাকে না। কিন্তু সেখানে কজন পৌঁছাতে পারে? কাজেই সাধারণ সাধকদের অনুভূতিকে পরীক্ষা করে নিতে হয়, এইজন্য শ্রুতি এবং যুক্তির প্রয়োজন আছে। না হলে নিজের অনুভূতিটাই যে ঠিক এটা প্রমাণিত হবে কি করে? তাই সব অনুভূতির চরম আকর যে শাস্ত্র, যেখানে বহু সাধকের পরীক্ষিত সত্যের record আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়। লীলাপ্রসঙ্গকার বিশদভাবে এই জিনিসটি আলোচনা করেছেন। ঠাকুর নিজেও মাঝে মাঝে এইভাবে পরীক্ষা করে দেখে নিতেন।

এই পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিঃসংশয়িত করবার জন্য। না হলে অনেক সময় মনের খেয়ালে অসম্ভব বস্তুকেও একেবারে দৃঢ় সত্য বলে মনে হয়। যেমন পাগল বা বিকারগ্রস্তের হয়। এইরকম একজনকে বলতে শোনা গিয়েছে, দেখ আকাশের উপর সুন্দর একটি বাগান। আকাশের ভিতরে যে বাগান হয় না, এরূপ অনুভবের ভিতরে যে অসঙ্গতি থাকে তা তার মনে উঠছে না। আমাদের অনুভূতি সেইরকম বিকারের রোগীর অনুভূতি কি না সে কথা ভাবতে হবে। কাজেই নিঃসন্দিগ্ধ হবার দুটি উপায় বলেছেন, যুক্তি-বিচার ও শ্রুতি। নিজের অনুভবগুলির মধ্যে পরস্পর সঙ্গতি আছে কিনা দেখা, এর নাম বিচার আর দ্বিতীয় উপায় শ্রুতির সমর্থন আছে কি না দেখা। আবার শাস্ত্রকেও মিলিয়ে নিতে হয় অনুভবের সঙ্গে। এইজন্য তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করছে—শ্রুতি, যুক্তি এবং অনুভব। শুকদেব জন্ম থেকেই সিদ্ধ। তবু তিনি জনকের কাছে গিয়েছেন শিক্ষা নেবার জন্য। উদ্দেশ্য অনুভূতির সঙ্গে সিদ্ধান্ত মেলে কি না দেখা। আগে নিজে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে তবে অপরের সন্দেহ নিরসন করতে হবে। তবেই আচার্য হওয়া যায়।

ঠাকুর বলছেন, কোন বিষয়ীর বাড়ীতে খেয়ে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়েছে। আমাদের এ সম্বন্ধে মনে রাখতে হবে আমরা সাধারণ মানুষ খাদ্যাখাদ্য বিচার করতে পারব না। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ঐ স্পর্শদোষ অনুভব করতে পারেন। ঠাকুর একবার একজনের দেওয়া খাবার জল হাতে নিলেন কিন্তু খেতে পারলেন না। তিনি ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে কিছু জানতেন না, তাকে সন্দেহ করে খেলেন না তাও নয়, খেতে পারলেন না। স্বামীজী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখলেন লোকটি ধার্মিক বলে পরিচিত হলেও খুব শুদ্ধ চরিত্র নয়। ঠাকুর এত শুদ্ধ যন্ত্র যে তাঁর অশুদ্ধ কিছু গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

সাধারণ মানুষ এসব স্পর্শদোষ বুঝতে পারে না অথচ এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে অনর্থক ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। তাই এটার উপর বেশী দৃষ্টি দেবার দরকার নেই, স্বামীজীরও এই মত ছিল।

ভাব আশ্রয় করে সাধনা করা

জনৈক ভক্তের প্রশ্ন—'জ্ঞানে কি ঈশ্বরের attributes—গুণ—জানা যায়?' ঠাকুরের উত্তর—'সে এ জ্ঞানে নয়।' যে জ্ঞানের দ্বারা আমরা জাগতিক বস্তুকে জানি তার সাহায্যে ঈশ্বরের গুণ জানা যায় না। 'অমনি কি তাঁকে জানা যায়? সাধন কর্তে হয়। আর, একটা কোন ভাব আশ্রয় কর্তে হয়। দাসভাব। ঋষিদের শান্তভাব ছিল।'

এখানে লক্ষণীয় ঠাকুর সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবের কথা না বলে শুধু দাস্য ও শান্তভাবের কথা বললেন, কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে এই দুটি ভাবই অবলম্বন করা সহজ। ঋষিদের শান্তভাব ছিল, তাঁরা বিশেষ কোন সম্পর্ককে আশ্রয় না করে, তিনি সর্বঐশ্বর্যশালী ভগবান, আমি তাঁর ভক্ত, এইভাবে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের আরাধনা করতেন। দাস্যভাব আর একটু উচ্চস্তরের। সেখানে ভগবান প্রভু, ভক্ত তাঁর দাসানুদাস। ভগবানের প্রতি মমত্ববুদ্ধি থাকে। হনুমানের দাস্যভাব। এসব ভাবে ভক্তের পৃথক্ সত্তা থাকে তাই রসাস্বাদন সম্ভব হয়। ভক্তির 'আমি' বিদ্যার 'আমি'-তে কোন দোষ নেই। ঠাকুরের ভাষায়, 'আমি ত যাবার নয় তবে থাক শালা 'ভক্তের আমি', 'দাস আমি' হয়ে।' শঙ্করাচার্য বিদ্যার আমি রেখেছিলেন লোকশিক্ষা দেবার জন্য।

সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবেও ভক্ত নিবিড়ভাবে ভগবানের রসাস্বাদন করেন কিন্তু সাধারণের পক্ষে অনুসরণ করা কঠিন। ভগবানকে বন্ধু জেনে নিজেকে তাঁর সমপর্যায়ের ভাবা অথবা নিজেকে প্রতিপালক আর

ভগবানকে প্রতিপাল্য ভাবা কিংবা তাঁকে দয়িতভাবে উপাসনা করা উচ্চস্তরের সাধকের পক্ষেই সম্ভব। তাই ঠাকুর এগুলি এখানে উল্লেখ করলেন না।

তারপর ঠাকুর ঐ ভক্তটিকে বলছেন, 'তোমার দুই ভাব—স্বস্বরূপকে চিন্তা করাও বটে, আবার সেব্য সেবকেরও ভাব বটে। কেমন ঠিক কি না?' খুব সম্ভব ভক্তটি স্বয়ং মাস্টারমশায়। নিজের নাম না করে তিনি কোথাও শুধু ভক্ত কোথাও মণি বলে উল্লেখ করেছেন। ঠাকুর আবার তাঁকে হেসে বললেন, 'তাই হাজরা বলে তুমি মনের কথা সব বুঝতে পার। ও ভাব খুব এগিয়ে গেলে হয়। প্রহ্লাদের হয়েছিল।' সকলের মনের ভাব বুঝে তাদের সাহায্য করা আর যাকে আমরা আধুনিক কালে **thought reading** বলি তা এক নয়। এ হচ্ছে এক উচ্চ অবস্থায় থাকা; ঠাকুর যার উল্লেখ করে বলেছেন, তোমাদের ভিতরটা আমি সব দেখতে পাই, যেমন কাঁচের আলমারির ভিতর জিনিস থাকলে দেখা যায় সেইরকম। ভক্তেরা শুনে শঙ্কিত এবং লজ্জিত। মনের ভিতর এমন সব ভাব পোষা আছে যা বাইরে প্রকাশ পাওয়া লজ্জার। বাইরে আমরা নিজেদের ভক্ত বলে পরিচয় দিই কিন্তু মনের ভিতরে কি ফুট উঠছে বিচার করে দেখেছি কি?

এরপর ঠাকুর যে বলছেন, 'কিন্তু ও ভাব সাধন কর্তে গেলে কম চাই,—তার অর্থ এই নয় যে অপরের মনোভাব বোঝবার জন্য সাধনা করতে হবে। ও তো সিদ্ধাই-এর কথা। প্রকৃত সাধক ভক্ত তা চান না। অনেক সাধনার ফলে তাঁদের মধ্যে কতকগুলি শক্তি স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে, সে শক্তিগুলি হানিকর হয় না, জগৎ-কল্যাণের কাজে নিয়োজিত হয়, ঠাকুর এটাই বলতে চেয়েছেন।

সহ্য করা ও স্থিতধী হওয়া এক কথা নয়

এবার বলছেন, একজনের হাতে কুলের কাঁটা ফুটে দরদর করে রক্ত পড়ছে কিন্তু মুখে বলছে আমার কিছু হয়নি। 'জিজ্ঞাসা করলে বলে,—বেশ বেশ। এ কথা শুধু মুখে বললে কি হবে? ভাব সাধন করতে হয়।' সুখদুঃখ তুচ্ছ, এরকম কথা অনেকেই বলে কিন্তু দুঃখে-সুখে নিস্পৃহতা 'কজনের থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে কষ্ট সহ্য করে যাওয়া—এ সুখদুঃখে 'সমভাব'-এর অবস্থা নয়। উপনিষদ বলছেন, যে দেহধারীর দেহতে আমি বুদ্ধি আছে তার এই সুখদুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই—

'ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি
অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ॥'

—দেহাভিমানশূন্য যে তার কাছে প্রিয় নেই, অপ্রিয়ও নেই।

গীতায় ভগবান বলছেন, 'ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।' (৯/২৯)—আমার কেউ অপ্রিয়ও নেই প্রিয়ও নেই। তাঁর ইষ্ট অনিষ্ট কিছু নেই! তিনি এ সম্পর্কে নির্লিপ্ত কারণ তিনি 'অশরীর', দেহাভিমানশূন্য। অতএব দেহাভিমানরহিত ব্যক্তিই বলতে পারেন, সুখদুঃখ কিছুই না। অন্যেরা যে বলে তা কেবল মুখের কথা। অভ্যাসবশে বলে, সংসার সবই মায়া কিন্তু কাঁটা ফুটলে উঃ করে ওঠে। বেদনাকে মায়া বলে তুচ্ছ করতে পারে না।

ভগবান তাই অর্জুনকে এসব নির্বিকার চিত্তে সহ্য কবতে বলেছেন—'মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ-সুখদুঃখদাঃ। আগমাপয়িনোঽনিত্যাস্তাং-স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥' (২।১৪)

—ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়াদির সংযোগেই সুখদুঃখের অনুভব হয়। আর বিচার করলে বোঝা যাবে এগুলি 'আগম-অপায়ি' অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল অতএব অনিত্য। সুখদুঃখ কোনটাই স্থায়ী নয়।

ভগবান সহ্য করা বলতে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক যেমন যন্ত্রণা সহ্য করে সেরকম সহ্য করা বলছেন না। বলছেন, এর দ্বারা বিচলিত হয়ো না। ভারসাম্য না হারিয়ে নিজেকে এসবের অতীত শুদ্ধ আত্মা বলে জান।— এইটাই সাধনার লক্ষ্য।

গীতায় আরও বলছেন—

'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥' (২।৫৬)

—যিনি যাবতীয় দুঃখে উদ্বেগশূন্য, সর্ববিধ সুখে স্পৃহাশূন্য, যাঁর আসক্তি ভয় ক্রোধ নিবৃত্ত হয়েছে তাঁকেই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলে। স্থিতধী মানে যাঁর বুদ্ধি তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। যখন মানুষ বুঝতে পারবে দেহেন্দ্রিয়াদি 'আমি' নয় তখন সে দুঃখে বিচলিত হবে না, সুখেরও আকাঙ্ক্ষা রাখবে না। সে কেবল জানবে এসবে আমার কিছু লাভক্ষতি হচ্ছে না।

'মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে কিঞ্চৎ প্রদহ্যতে ॥'
(মহাভারত, শান্তিপর্ব,১৯)

জনক বলছেন, সমগ্র মিথিলা পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও আমার কিছু পোড়ে না কারণ আমি জানি আমি আত্মা, আমি বিদেহ। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হবে তাহলে তিনি পাষাণ, নির্মম, প্রকৃতপক্ষে তিনি তা নন। জ্ঞানীব্যক্তিও জগতের সঙ্গে ব্যবহার করবার সময় অন্যতর কোন প্রকার সত্তাকে আশ্রয় করে ব্যবহার করছেন। এই ব্যবহারের সময় তিনি নির্মম নন, পরমকরুণাসম্পন্ন। তিনি নির্লিপ্ত তবু কর্ম করে যাচ্ছেন, 'বর্ত এব চ কর্মাণি'। কিন্তু 'কিছুই করেন না' এই বুদ্ধি তাঁর আছে। যেমন গীতাতেই বলছেন,

'যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥' (১৮।১৭)

—যাঁর বুদ্ধি এই দেহেন্দ্রিয়াদিতেও লিপ্ত নয় সমগ্র জগৎকে বিনাশ করেও তিনি হন্তা হন না। কারণ তিনি নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন না। ভাবটি অতি উচ্চস্তরের, সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তার জন্য সাধন করতে হবে। ঠাকুর বলছেন, একটা ভাবকে আশ্রয় করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হয় এবং যখন সেই পরমতত্ত্বে পৌঁছব তখনই বলতে পারব যে, এসব থেকে আমি নির্লিপ্ত। তার আগে নয়।